কবে । কখন । কোথায় । কীভাবে

কল্কি অবতার বিষয়ক সকল বিভ্রান্তির সমাধান

যে বিভ্রান্তিকর বিষয়গুলোর সমাধান আপনি এই গ্রন্থে পাবেন ——

- কল্কি অবতার কি ইতোমধ্যেই আবির্ভূত হয়েছেন?
- তিনি কবে, কখন, কোথায়, কীভাবে আবির্ভূত হবেন?
- তথাকথিত কল্কি অবতার বলে প্রচারিত ব্যক্তিদের সাথে কল্কির বৈসাদৃশ্য।
- ভবিষ্যপুরাণোক্ত ত্রিপুরাসুরই কি কল্কি অবতার?
- কল্কি অবতার কি মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ করবেন?
- শ্রীমদ্ভাগবতে কল্কি অবতার সম্বন্ধে কী বলা হয়েছে?
- বেদোক্ত নরাশংস কি কল্কি অবতার?
- কল্কির নাম, পিতা-মাতার নাম ও আবির্ভাব স্থান নিয়ে বিভ্রান্তির সমাধান ও কল্কিপুরাণ অবলম্বনে কল্কির জীবনবৃত্তান্ত।

— এছাড়াও কল্কি অবতার সম্পর্কিত প্রায় সকল প্রশ্নের উত্তর।

৭৯, স্বামীবাগ আশ্রম, স্বামীবাগ রোড, ঢাকা-১১০০
e-mail: arsandhane@gmail.com

অভ্রান্ত বৈদিক শাস্ত্রের আলোকে

কল্কি অবতার

অভ্রান্ত বৈদিক শাস্ত্রের আলোকে

কল্কি অবতার

(Kalki Avatar According to Infalliable Vedic Sriptures)

প্রকাশক

শ্রী চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী

রচনা, সংকলন ও সম্পাদনা

প্রণয় কুমার পাল
বিবিএ, এমবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শুভাশীষ দত্ত
বিএফএ, এমএফএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রুফ সংশোধন

শ্রী সুভাষ চন্দ্র রায়

প্রথম প্রকাশ

জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশনা

অমৃতের সন্ধানে প্রকাশন

৭৯, স্বামীবাগ আশ্রম, ঢাকা, বাংলাদেশ।
ইমেইল : arsandhane@gmail.com

উৎসর্গ

নানা অপসিদ্ধান্তের দ্বারা বিভ্রান্ত ও
পরম সত্য সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু
আধুনিক সমাজের যুবক-যুবতীদের প্রতি

সূচিপত্র

অবতরণিকা

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের শেষে কলিযুগের আগমন। এভাবে ঘড়ির কাঁটার মতো এ চার যুগ অনাদিকাল ধরে পালাক্রমে আবর্তিত হয়ে আসছে। বর্তমানে আমরা বৈবস্বত মনুর আয়ুষ্কালে অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের শেষে যে দ্বাপরযুগ তার পরবর্তী কলিযুগে অবস্থান করছি। এ চার যুগে ভগবান তাঁর বিভিন্নরূপে আবির্ভূত হয়ে লীলাবিলাস করছেন, যাদের বলা হয় অবতার।

এ অবতারগণের মধ্যে কল্কি অবতার অন্যতম। চার যুগ অন্তর অন্তর কল্কি অবতার কলিযুগের শেষে এবং পুনরায় সত্যযুগের প্রারম্ভে আবির্ভূত হন। এরই ধারাবাহিকতায় এই কলিযুগেও কল্কি অবতার যথাসময়ে আবির্ভূত হবেন, তা-ই শাস্ত্রে কথিত আছে।

কিন্তু সম্প্রতি ভগবানের অবতার হওয়ার প্রতিযোগিতা চলছে। ভগবানের অবতরণের সুযোগ নিয়ে অনেকেই অবতার হতে চাচ্ছেন বা তার অনুগামীরা তাদের অবতার বলে প্রতিপন্ন করছেন। শাস্ত্রে ভগবৎ অবতারের যেসব বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা আছে, তা না থাকা সত্ত্বেও জনগণের অজ্ঞতার দরুন তারা সমাজে এক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছে। এখানে-সেখানে যত্রতত্র শোনা যাচ্ছে– অমুক নাকি ভগবানের অবতার।

শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে কলিযুগের শেষে ভগবান কল্কি অবতাররূপে আবির্ভূত হয়ে আবার পৃথিবীতে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু যেহেতু কল্কি অবতার এখনো আবির্ভূত হননি, তাই এই অবতার নিয়ে চলছে নানারকম কল্পনাবিলাস। ভুরি ভুরি ভুঁইফোড় ব্যক্তি কল্কি অবতার নামে আত্মপ্রকাশ করছে। আবার, কেউ কেউ তাদের দল ভারি করার জন্য শাস্ত্রে উদ্ধৃত কল্কি সম্পর্কিত শব্দাবলির বিভিন্ন রূপক ও কাল্পনিক যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে শাস্ত্রীয় প্রমাণের অপব্যাখ্যা করছে এবং কল্কি অবতারের সাথে কাল্পনিক কিছু মিল উপস্থাপন করে সম্পূর্ণ ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিকে কল্কিরূপে প্রচারণা চালিয়ে কোমল শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে প্রতারণা করছে। নামে-বেনামে বিভিন্ন বই ছাপিয়ে কল্কি অবতার সম্বন্ধে মানুষকে ভুল তথ্য প্রদান করছে। আর তা নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়ছে শাস্ত্রজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ সাধারণ মানুষ। যখনই কেউ বলছেন, "তিনি ভগবানের অবতার"– সাধারণ মানুষ এর সত্যতা বিচার না করেই তার পেছনেই ছুটছে।

বর্তমান যুগ তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। ভারচুয়াল কমিউনিকেশন এবং দ্রুত কোনো সংবাদ ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তথ্যপ্রযুক্তির জুড়ি নেই। ব্লগিং চ্যাটিং-এ নানা বিষয় নিয়ে চলে তুমুল তর্ক-বিতর্ক। ব্লগ এবং গণমাধ্যমগুলোতে সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে যেমন চর্চা হয়, ঠিক তেমনি চর্চা হয় ধর্মীয় বিষয় নিয়েও। ধর্মীয় যেসব বিষয় নিয়ে গণমাধ্যমগুলোতে চর্চা হয়, তার মধ্যে কল্কি অবতার অন্যতম।

তাই, জনসাধারণকে সঠিক পথপ্রদর্শন তথা প্রকৃত সত্য সম্বন্ধে অবগত করানো এখন অনিবার্য হয়ে গেছে। জনপ্রিয় ত্রৈমাসিক "অমৃতের সন্ধানে" ম্যাগাজিনের ২০১৬ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি-মার্চ সংখ্যায় এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পরপরই তা পাঠকসমাজে ব্যাপক সাড়া ফেলে। তখন থেকেই পাঠকগণ পুনঃপুনঃ এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার জন্য অনুরোধ করতে থাকে। প্রবন্ধ রচনায় কলেবরের সীমাবদ্ধতা থাকায় তখন কল্কি অবতার সম্বন্ধে সকল ধরনের তথ্য উপস্থাপন সম্ভব হয়নি। পাঠকদের অনুরোধে অনুপ্রাণিত হয়ে তখন থেকেই এই গ্রন্থটির কাজ আরম্ভ হয়। বহু শাস্ত্র মন্থন করে পাঠকগণকে তথ্যবহুল ও প্রাঞ্জল একটি গ্রন্থ উপস্থাপনার জন্য চলতে থাকে বিস্তর গবেষণা। ধীরে ধীরে পুষ্ট হতে থাকে গ্রন্থটির বর্তমান কলেবর।

পাঠকগণের অনুসন্ধিৎসা মাথায় রেখে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ, প্রাঞ্জলভাবে গ্রন্থটির বিষয়বস্তু পরিবেশনের চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করি, গ্রন্থটির বস্তুনিষ্ঠ উপস্থাপনা পাঠকদের বিভ্রান্তি দূর করবে।

অত্যন্ত ব্যতিক্রমী ও তথ্যবহুল এই গ্রন্থে বিভিন্ন শাস্ত্রের উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। বহু তথ্যের সন্নিবেশ হওয়ায় ও বিষয়ের গাম্ভীর্য বিবেচনায় গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশে ভুল থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। গ্রন্থটি নির্ভুলভাবে উপস্থাপনের জন্য শতভাগ চেষ্টা করা হয়েছে। তথাপি, অপূর্ণ ইন্দ্রিয়জাত কারণে আমরা ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে নই। তাই পাঠকদের কাছে কোনো ভুল পরিলক্ষিত হলে, তা অবগত করানোর জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ রইল। আশা করি, সুধী পাঠকগণ অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দর্শন করে গ্রন্থটির সারবস্তু অনুধাবনের প্রয়াসী হবেন। গ্রন্থটির বর্তমান কলেবর সকলের সামনে উপস্থাপনের পেছনে যারা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের মধ্যে শ্রীপাদ নন্দনন্দন দাস, পঙ্কজ কানাই দাস, অমিত দাস, রসিক কানাই দাস, সুদীপ দাস, ঠাকুর নরোত্তম দাস ও তপ্তকাঞ্চন নিত্যানন্দ দাসসহ সকলের প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে, এই গ্রন্থ দ্বারা যদি একজনও পরম সত্যের দিগ্‌দর্শন লাভ করেন, তবে আমাদের প্রয়াস সার্থক বলে মনে করব।

বিনীত
প্রকাশক

প্রসঙ্গকথা

অমর একুশে বইমেলার এটাই শেষ সপ্তাহ। ইনকোর্স আর অ্যাসাইনমেন্টের চাপে এবার বইমেলায় যাওয়ার সুযোগই পাচ্ছে না আবির। আজ প্রথম মিডটার্ম শেষ হলো, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে কাছের বন্ধু সৌরভকে নিয়ে বিকেলে বইমেলায় যাওয়ার প্ল্যান আবিরের। দুজন ভিন্ন অনুষদে পড়লেও ক্লাসের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগ সময়ই কাটে তার সাথে। আবির পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগে, আর সৌরভ বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগে। আবির ও সৌরভ দুজনেরই পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে জানার প্রবল আগ্রহ।

হল থেকে বেরিয়ে টিএসসি ক্যাফেটেরিয়ায় বন্ধু সৌরভের অপেক্ষায় আছে আবির। ইতোমধ্যে সৌরভও এসে উপস্থিত। দুজন মিলে বেরিয়ে গেল বইমেলার উদ্দেশ্যে। এবারের বইমেলার আয়োজন আরো মনোমুগ্ধকর। বিভিন্ন প্রকাশনার স্টলগুলোতে বাহারি রকমের বই। সৌরভ কিছুটা থ্রিলিং (গোয়েন্দা কাহিনী) টাইপের বই পছন্দ করে, সেই সাথে তার বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে গবেষণার বই তো আছেই। আবির যেহেতু পূর্ব থেকেই বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে জানতে আগ্রহী, তাই এধরনের বইয়ে তার রুচিটা একটু বেশি। আবির মনে মনে সনাতন ধর্ম সম্বন্ধেও কিছু বই অনুসন্ধান করছিল, যাতে সে তার মৌলিক কিছু প্রশ্নের উত্তর পেতে পারে।

বইমেলায় ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ আবিরের চোখ পড়ল কল্কি অবতার বিষয়ক একটি বইয়ের দিকে। বইটি হাতে নিয়ে আবির কিছুক্ষণ বইটির পাতা উল্টিয়ে দেখতে লাগল। বইটিতে সে দেখলো, কল্কি অবতার ইতোমধ্যেই আবির্ভূত হয়ে

গেছেন। দেখার সাথে সাথেই আবির আশ্চর্যান্বিত হলো। এটা কী করে সম্ভব? কারণ, সে জানে কল্কি অবতার আসবেন কলিযুগের শেষে। পাশের স্টলেই দাঁড়িয়ে ছিল সৌরভ। তাকে ডেকে সে বইটি দেখালো। সৌরভ কিন্তু বইটি দেখে মোটেও অবাক হলো না। সৌরভ আবিরকে বলল, আরে এটা কি তুমি আজই প্রথম দেখলে? এ বিষয়ে ইন্টারনেটে বহু লেখালেখি আছে। আর এখানে তো শুধু একজনকে কল্কি বলে প্রমাণ করার চেষ্টা চালানো হয়েছে; এছাড়াও আরো বহুলোককে কল্কি বলে প্রচার করা হচ্ছে। আবিরের কাছে বইটি যথেষ্ট তথ্যবহুল বলে মনে হলো। সে এই বইটি কিনে নিয়ে গেল। বই কেনা আজকের মতো প্রায় শেষ পর্যায়ে। হলে ফিরে গিয়ে আবির বইটি তিনদিনের মধ্যে পড়ে সমাপ্ত করল। যতই সে বইটি পড়ছিল, ততই সে কল্কি অবতারের আবির্ভাব নিয়ে বিভ্রান্ত হচ্ছিল। আবির ভাবছিল, সত্যিই কি কল্কি অবতার ইতোমধ্যেই আবির্ভূত হয়েছেন? যদি তা-ই হয়, তবে তো এখন আর ভিন্ন ভিন্ন মত পরিগ্রহ না করে, আমাদের সকলেরই তার প্রদর্শিত পন্থা ও আদর্শ অনুসরণ করা উচিত। কিন্তু সে মন থেকে কোনোভাবে সবগুলো বিষয় মেনে নিতে পারছিল না। কারণ, বইটিতে তথাকথিত কল্কি অবতারের নানা বৈশিষ্ট্য বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত কল্কি অবতারের সাথে অনেকটা জল্পনার আশ্রয় করে জোর করে মেলানো হচ্ছে বলে তার মনে হচ্ছিল। কিন্তু, তবুও শাস্ত্রের যে প্রমাণগুলো সে বইটিতে পেলো তা তাকে এক চরম বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিলো।

বইটি পড়ার পর সৌরভকে তার মানসিক অবস্থা সম্পর্কে জানালো। তথাকথিত কল্কি অবতার সম্পর্কে যদিও সৌরভের কিছুটা ধারণা ছিল, কিন্তু আবিরের মতো এতো গভীরভাবে সে বিষয়টি নিয়ে ভাবেনি। আবিরের আগ্রহ দেখে সৌরভ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নিল। সে তখন আবিরকে তারই এক পরিচিত ভদ্রলোকের সাথে এ বিষয়ে কথা বলতে বলেন। তাঁর নাম দেবব্রত দাসগুপ্ত। মুম্বাই ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনার পর তিনি এখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। গবেষণার কাজে সপ্তাহখানেক আগে বাংলাদেশে এসেছেন। গত দু'দিন আগেই তাঁর সাথে সৌরভের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। গবেষণা ও ব্যক্তিগত উৎসাহ উভয়কারণেই তিনি সনাতন ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী। শুধু তাই নয়, তিনি ব্যক্তিজীবনেও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান অনুসরণ করেন। সৌরভ আবিরকে তাঁর সাথে এবিষয়ে কথা বলার পরামর্শ দেয়।

পরদিনই আবির সৌরভের সঙ্গে পণ্ডিত দেবব্রত দাসগুপ্ত মহোদয়ের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেল।

প্রথম ভাগ

অভ্রান্ত বৈদিক শাস্ত্রে কল্কি অবতার

ভগবানের অবতার

দেবব্রত বাবুর বাসায় আবির ও সৌরভ এসে উপস্থিত হলো। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তাদের বসতে দিলেন। প্রথম দর্শনের কুশল বিনিময়ের পর মূল আলোচনা শুরু হলো–

দেবব্রত: বলুন, আমি আপনাদের কীভাবে সাহায্য করতে পারি?

আবির: ক'দিন আগে বইমেলায় আমি কল্কি অবতার সম্পর্কিত একটি বই সংগ্রহ করি। সেখান থেকেই আমার কল্কি অবতার সম্বন্ধে জানার আগ্রহ জন্মায়। সৌরভের কাছ থেকে জানতে পেলাম, আপনি সনাতন ধর্মশাস্ত্রসহ পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ সম্পর্কে অনেক গবেষণা করেছেন। তাই আপনার কাছ থেকে জানার এই সুযোগটি হাতছাড়া না করে চলে এলাম।

দেবব্রত: পৃথিবীতে বহু ধর্মশাস্ত্র রয়েছে, তার মধ্যে সনাতন ধর্মশাস্ত্রের কথা তো বলাই বাহুল্য। বর্তমান সময়ে আমাদের পক্ষে এত শাস্ত্রগ্রন্থ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা প্রায় অসম্ভব বলা চলে। তবুও আমি আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় যতটুকু জানতে পেরেছি তা আপনাদের কাছে বলতে পারলে ভালো লাগবে।

আবির: অবতার বলতে কী বোঝায়– ঈশ্বর, নাকি ঈশ্বরের প্রেরিত জন?

দেবব্রত: অবতার শব্দটি এসেছে অবতরণ থেকে। অবতরণ মানে নামা বা অবরোহণ। এ অর্থে, যিনি অবতরণ করেন, তিনি অবতার। আরেক দিক থেকে, ঊর্ধ্বলোক থেকে যিনি মর্ত্যলোকে বা নিম্নলোকে অবতরণ করেন, তিনি অবতার। তিনি হতে পারেন পরমেশ্বর ভগবান, ভগবানের শুদ্ধভক্ত বা দেবতা। আবার, অবতার শব্দের আরেকটি আভিধানিক অর্থ মূর্তিমান রূপ। যেমন, কলির অবতার, করুণার অবতার। আরো ব্যাপক অর্থে, এ জড়জগতের ঊর্ধ্বে অবস্থিত চিন্ময় ধামে

নিত্য বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং, তাঁর নিত্য পার্ষদ শুদ্ধভক্ত বা এজগতের অন্তর্গত স্বর্গাদি উচ্চতর লোকে অধিষ্ঠিত দেবতা যখন স্বরূপে অথবা ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হন, তাদের অবতার বলা হয়। যেমন: শঙ্করাচার্য শিবের অবতার, হরিদাস ঠাকুর ব্রহ্মার অবতার। অর্থাৎ, বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং ও তাঁর প্রেরিত–এ উভয়ই অবতার। ভগবানের অনন্ত অবতারের মধ্যে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি–তাঁরা হলেন ভগবান বিষ্ণুর বিশেষ দশ অবতার এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন বিষ্ণুসহ এই সমস্ত অবতারের উৎস এবং তিনি স্বয়ংও কখনো কখনো চিন্ময় জগৎ থেকে এজগতে অবতরণ করেন। তাই তিনি একইসঙ্গে অবতার ও অবতারী (সমস্ত অবতারের উৎস)। সেই পরমেশ্বর বিভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে এজগতে অবতীর্ণ হন। কিন্তু বিভিন্ন রূপে অবতীর্ণ হলেও তিনি এক ও অদ্বিতীয়।

আবির: কিন্তু স্যার, কেউ কেউ যে বলেন, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ–তাঁরা ঈশ্বর নন, ঈশ্বরপ্রেরিত বার্তাবাহক ও মহাপুরুষ। এ অর্থে তারা তাদের তথাকথিত মানব কল্কিকে শ্রীকৃষ্ণের সমতুল্য মনে করে।

দেবব্রত: মিথ্যাকে সত্য আর সত্যকে মিথ্যায় পরিণত করতে অথবা অজ্ঞতার দরুন অনেকে অনেক কিছু বলতে পারেন। কিন্তু আমাদের জানা কর্তব্য, বৈদিক শাস্ত্র কী বলে? সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে রাম ও কৃষ্ণ অভিন্ন পরমেশ্বর ভগবান বলে কীর্তিত। পরমপুরুষরূপে তাঁরা অবশ্যই মহান পুরুষ এবং জীবকে কল্যাণবার্তাও প্রদান করেন; কিন্তু তাঁরা ঈশ্বরের প্রেরিত নন, তাঁরা এক ও অভিন্ন ঈশ্বর, আর তথাকথিত কল্কিগণ হলেন ঈশ্বরসৃষ্ট জীবমাত্র। তাই তথাকথিত কল্কিদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমতুল্য মনে করা নিতান্তই মূর্খতা। সুতরাং, কিছু লোকের কথায় কী আসে যায়?

যাহোক, যেহেতু আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় কল্কি অবতার, তাই এ একেশ্বরের বহু অবতার প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনায় আমরা যাব না। শুধু এটুকু বলতে চাই যে, শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধেই (১.৩.২৮) বিভিন্ন অবতারের নামোল্লেখ করে অন্তে বলা হয়েছে যে,

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত-১.৩.২৮)

"পূর্বোল্লিখিত এই সমস্ত অবতার হচ্ছেন ভগবানের অংশ বা কলা (অংশের অংশ) অবতার, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। যখন নাস্তিকদের অত্যাচার

বেড়ে যায়, তখন আস্তিকদের রক্ষা করার জন্য ভগবান এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন।"

আবির: তার মানে ভগবানের অবতার সম্বন্ধে জানার জন্য শাস্ত্রই সবচেয়ে প্রামাণিক উৎস।

দেবব্রত: হ্যাঁ, বৈদিক শাস্ত্র অভ্রান্ত। শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে ভগবান বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপে এ ধরাধামে তাঁর দিব্য লীলাবিলাস বিস্তার করার জন্য আবির্ভূত হন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৪/৭-৮) পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

"হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই। সাধুদের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য আর ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।"

উক্ত শ্লোকে ভগবানের আবির্ভাবের তিনটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে–

১. সাধুদের পরিত্রাণ,
২. ভগবদ্বিমুখ আসুরিক ব্যক্তিদের বিনাশ এবং
৩. ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

বাংলাদেশ পৃথিবীর কোন মহাদেশে অবস্থিত তা জানতে হলে ভূগোল বই পড়তে হয়; রোগ নিবারণ করতে হলে মেডিক্যাল সায়েন্স-এর বই পড়তে হয়; তেমনি ভগবান কে? তা জানতে হলে আমাদের অবশ্যই বৈদিক শাস্ত্রের মাধ্যমে জানতে হবে।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১.২.১০১, ব্রহ্মযামল থেকে) গ্রন্থে বলা হয়েছে–

শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতৈব কল্পতে ॥

অর্থাৎ, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণসমূহ ও নারদপঞ্চরাত্র আদি বৈদিক শাস্ত্রকে অবহেলা করে যে হরিভক্তি, তা সমাজে শুধু উৎপাতই সৃষ্টি করে।

ষোড়শ শতাব্দীর এক বৈদিক দার্শনিক এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদবর্গের অন্যতম শ্রীল সনাতন গোস্বামী এই কলিযুগে ভগবানের অবতার সম্বন্ধে কীভাবে জানা যাবে, দিগ্বিজয়ীবিজিত পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন। তার উত্তরে মহাপ্রভু বলেছিলেন–

প্রভু কহে, "অন্যাবতার শাস্ত্র দ্বারে জানি।
কলিতে অবতার তৈছে শাস্ত্র বাক্যে মানি ॥"
সর্বজ্ঞ মুনির বাক্য শাস্ত্র পরমাণ।
আমা-সবা জীবের হয় শাস্ত্র দ্বারা জ্ঞান ॥
(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ২০.৩৫২-৩৫৩)

অর্থাৎ, পূর্বে আবির্ভূত অবতারদের যেমন আমরা শাস্ত্র দ্বারাই জানি, তেমনি কলিতেও অবতার কেবল শাস্ত্রবাক্যে হলেই মেনে নেব। সর্বজ্ঞ মহামুনি ব্যাসদেব রচিত শাস্ত্রই হচ্ছে একমাত্র প্রমাণ। আমাদের মতো বদ্ধজীবের কেবল শাস্ত্রের মাধ্যমেই যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন- তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ। অতএব, কর্তব্য অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ।

সেজন্য আমাদের বৈদিক শাস্ত্র হতে জানতে হবে, ভগবান কে? ভগবানের অবতার কবে, কখন, কোথায়, কীভাবে আবির্ভূত হবেন? তাই যাকে-তাকে ভগবান বলার আগে আমাদের জানতে হবে শাস্ত্রে ভগবান সম্বন্ধে কী বলা হয়েছে?

কল্কি অবতারের আবির্ভাবকাল

আবিরঃ এসকল অবতারগণের মধ্যে কল্কি অবতার কখন আবির্ভূত হবেন?

দেবব্রতঃ বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে, কল্কি অবতার অবতীর্ণ হবেন কলিযুগের অন্তে।

বৃহন্নারদীয় পুরাণঃ বৃহন্নারদীয় পুরাণে (২.৪০) তা স্পষ্ট বলা হয়েছে-

যুগান্তে পাপিনোহশুদ্ধাংশ্ছিত্ত্বা তীক্ষ্ণাসিধারয়া।
স্থাপয়ামাস যো ধর্মং কৃতাদৌ তং নমাম্যহম ॥

"যিনি কলিযুগের অন্তে অশুদ্ধ পাপীদের তীক্ষ্ণ খড়গ দ্বারা ছেদন করে সত্যযুগের ধর্ম সংস্থাপন করেন, সেই কল্কি অবতারকে নমস্কার করি।"

বিষ্ণুপুরাণঃ বিষ্ণুপুরাণে (৪.২৪.২৬) বলা হয়েছে-

শ্রৌতস্মার্তধর্মে বিপ্লবমত্যন্তমুপগতে ক্ষীণপ্রায়ে
চ কলাবশেষ জগৎস্রষ্টাশ্চরাচর গুরোরাদিময়স্যান্তময়স্য
সর্বময়স্য ব্রহ্মময়স্যাত্মস্বরূপিণো ভগবতো বাসুদেব-
স্যাংশঃ সম্ভলগ্রামপ্রধানব্রাহ্মণবিষ্ণুযশসো গৃহে
অষ্টগুণৈদ্ধিসমন্বিতঃ কল্কিরূপী জগত্যত্রাবতীর্য
সকলম্লেচ্ছদস্যুদুষ্টাচরণচেতসামশেষানামপরিচ্ছিন্নম-
মাহাত্ম্যশক্তিঃ ক্ষয়ং করিষ্যতি ॥

"শ্রৌত ও স্মার্ত ধর্ম অত্যন্ত বিপ্লবপ্রাপ্ত ও কলি ক্ষীণপ্রায় হলে, যিনি চরাচরের গুরু ও আদিভূত, যিনি অন্তময়, সর্বময়, ব্রহ্মময় ও পরমাত্মস্বরূপ, সেই ভগবান বাসুদেব অংশরূপে শম্ভল গ্রামের প্রধান ব্রাহ্মণ বিষ্ণুযশার গৃহে অষ্টৈশ্বর্যসম্পন্ন, অসীমশক্তি ও মাহাত্ম্যশালী কল্কিরূপে অবতীর্ণ হয়ে ম্লেচ্ছ, দস্যু ও দুরাত্মাদিগের ক্ষয় করবেন।"

পদ্মপুরাণ: আবার, পদ্মপুরাণে (উত্তরখণ্ড, ২৪২ অধ্যায় শ্লোক ৮-১০) বর্ণনা করা হয়েছে—

কলের্দিব্য সহস্রাব্দপ্রমাণস্যান্তপাদয়োঃ।
শম্ভলগ্রামকং প্রাপ্য ব্রাহ্মণঃ সঞ্জনিষ্যতি ॥

এই শ্লোকে উক্ত *'কলেঃ'* ও *'অস্য অন্তপাদয়ো'* শব্দগুলো থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কলিযুগের অন্তে বা শেষ দিকে ভগবান শম্ভলগ্রামে ব্রাহ্মণ গৃহে জন্মগ্রহণ করবেন।

ভবিষ্যপুরাণ: ভবিষ্যপুরাণে (২য় খণ্ড, ১৬.২৮) ভগবৎ-অবতারাদি বৃত্তান্ত বর্ণন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— *কলিযুগান্তকে...কল্কি চ ভবিতাসমহ্যম্ ॥* অর্থাৎ, "কলিযুগের অন্তে আমি কল্কি অবতার রূপে অবতীর্ণ হব।"

শ্রীমদ্ভাগবত: শ্রীমদ্ভাগবতে (১.৩.২৮) বর্ণনা করা হয়েছে, "পূর্বোল্লিখিত এ সমস্ত অবতারেরা হচ্ছেন ভগবানের অংশ বা কলা অবতার। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। যখন নাস্তিকদের অত্যাচার বেড়ে যায়, তখন আস্তিকদের রক্ষা করার জন্য ভগবান এ ধরাধামে অবতীর্ণ হন।"

অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যু প্রায়সু রাজেষু।
জনিতা বিষ্ণুযশসো নাম্না কল্কির্জগৎপতিঃ।
– শ্রীমদ্ভাগবত (১.৩.২৫)

"তারপর যুগসন্ধিকালে, অর্থাৎ কলিযুগের অন্তে নৃপতিরা যখন দস্যুপ্রায় হয়ে যাবে, তখন ভগবান কল্কি অবতার নামে বিষ্ণুযশ নামক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে অবতরণ করবেন।"

আধুনিককালের এক মহান ব্যক্তিত্ব ইস্‌কন প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এ প্রসঙ্গে বলেন– "এখানে ভগবান কল্কি অবতারের আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। তিনি যুগসন্ধ্যায়, অর্থাৎ কলিযুগের শেষ এবং সত্যযুগের শুরু– এই দুটি যুগের সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হবেন। দেয়ালপঞ্জির (ক্যালেন্ডারের) মাসের মতো সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি– এ চারটি যুগ আবর্তিত হয়। এই কলিযুগের স্থায়িত্ব হচ্ছে ৪,৩২,০০০ বছর। তার মধ্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর পরীক্ষিৎ মহারাজের রাজত্বকাল শুরুর থেকে পাঁচ হাজার বছর গত হয়েছে। সুতরাং, কলিযুগের আরো ৪,২৭,০০০ বছর বাকি রয়েছে। সেই সময়ের পর কল্কি অবতারের আবির্ভাব হবে, যেকথা শ্রীমদ্ভাগবতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। তাঁর পিতা হবেন বিষ্ণুযশ নামক এক তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণ এবং তিনি শম্ভল গ্রামে আবির্ভূত হবেন। এ সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী যথাসময়ে সত্যে পরিণত হবে।"

○ এখনো সেই যুগসন্ধিক্ষণ আসেনি

আবির: কল্কি অবতারের আবির্ভাবের সময়ের কী সুনির্দিষ্ট কোনো গাণিতিক হিসাব শাস্ত্রে রয়েছে?

দেবব্রত: হ্যা, বৈদিক শাস্ত্রে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট হিসাব রয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ৩য় স্কন্ধ একাদশ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। আমি সেখান থেকে বিভিন্ন যুগের আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে বিস্তারিত বলছি –

গণণা					পৃথিবীতে বৎসর
১	দেব অহোরাত্র	=	১	সৌর বৎসর	১
১	দেব বৎসর	=	৩৬০	দেব অহোরাত্র	৩৬০
	সত্যযুগ		৪৮০০	দেব বৎসর	১৭,২৮,০০০
	ত্রেতাযুগ		৩৬০০	দেব বৎসর	১২,৯৬,০০০
	দ্বাপরযুগ		২৪০০	দেব বৎসর	৮,৬৪,০০০
	কলিযুগ		১২০০	দেব বৎসর	৪,৩২,০০০
১	চতুর্যুগ	=	১২০০০	দেব বৎসর	৪৩,২০,০০০
১	মন্বন্তর	=	৭১	চতুর্যুগ	৩০,৬৭,২০,০০০
			১৪	মন্বন্তর	৪২৯,৪০,৮০,০০০
		+	১৫	সন্ধিকাল	২,৫৯,২০,০০০
১	কল্প	=			৪৩২,০০,০০,০০০
	কল্প	=	১০০০	চতুর্যুগ	
১	ব্রহ্মারাত্র	=	২	কল্প	৮৬৪,০০,০০,০০০
১	ব্রহ্মার বর্ষ	=	৩৬০	ব্রহ্মারাত্র	৩১১০৪০,০০,০০,০০০

সৌর সিদ্ধান্ত অনুসারে জুলিয়ান ক্যালেন্ডারে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩১০২ সালে ১৮ ফেব্রুয়ারি বা গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে ১৪ জানুয়ারিতে মধ্যরাতে কলিযুগের সূচনা হয়। কলিযুগের আয়ুষ্কাল ৪,৩২,০০০ বছর। কলিযুগের প্রায় ৫১২১ বছর ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে। তাই বর্তমান ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে বৈবস্বত মন্বন্তরে ২৮তম কলিযুগ সমাপ্ত হতে এখনো প্রায় ৪,২৬,৮৭৯ বছর বাকি আছে। তারপর যুগসন্ধ্যায় ভগবান কল্কি আবির্ভূত হবেন। অর্থাৎ, শাস্ত্রে বর্ণিত কল্কি অবতারের আবির্ভাবের সময় এখনো উপস্থিত হয়নি। তাই তাঁর আগমনের প্রশ্নই ওঠে না।

কল্কি আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট

আবির: কোন প্রেক্ষাপটে কল্কি অবতার আবির্ভূত হবেন?

দেবব্রত: ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে, কলিযুগের অন্তর্গত ১০,০০০ বছর সমন্বিত স্বর্ণযুগ সমাপ্ত হওয়ার প্রাক্কালে জড়া প্রকৃতির নিকৃষ্ট গুণগুলো এত শক্তিশালী হয়ে উঠবে যে, এর ফলে মানুষ পারমার্থিক কার্য সম্পাদনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। তখন সকলেই ভগবদ্বিমুখ হয়ে পড়বে। তখন যেসকল সাধু মহাত্মাগণ পৃথিবীতে অবস্থান করবেন, তারা বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তথা গুণাবলিতে সাধারণ লোকদের চেয়ে ভিন্ন হবেন। তখন তাদের নিয়ে ঠাট্টা বা বিদ্রুপ করা হবে এবং শহরে যেভাবে খেলার জন্য পশু শিকার হয়, ঠিক সেভাবে তাদের শিকার করা হবে। তখন তারা অস্তিত্ব রক্ষার জন্য গুহা বা পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নিবে অথবা তাদের পার্থিব অস্তিত্ব থেকে নিবৃত্ত হবে। এমনকি তারা একসময় পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ত্যাগ করবে। কল্কিপুরাণেও একথা বলা হয়েছে।

কল্কিপুরাণে বিষ্ণুযশ বলছেন, "সাধুদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ এবং ধর্মীয় নীতিসমূহের বিনাশসাধনকারী কলির দ্বারা তাড়িত হয়ে বর্তমানে ধার্মিক ব্রাহ্মণগণ ভারতবর্ষের এই পুণ্যভূমি পরিত্যাগ করেছেন।" (কল্কিপুরাণ ২.৪৫) তবে ব্রাহ্মণগণ যে, একেবারে থাকবে না তা নয়, কল্কি যেখানে অবতীর্ণ হবেন সে অঞ্চলে কিছু ব্রাহ্মণের নিবাস থাকবে।

কালক্রমে পৃথিবী যৌক্তিক জ্ঞানে অসমর্থ ব্যক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। তারা হবে অনুন্নত মেধা ও বুদ্ধিসম্পন্ন, পারমার্থিক জ্ঞান ও জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ। তাদের কী করা উচিত এবং কীভাবে জীবনযাপন করা উচিত, সে সম্বন্ধে তারা অজ্ঞ থাকবে। তারা জীবনকে পরিবর্তন করতে পারবে না।

এভাবে ভগবদ্ভক্তিতে উন্নত প্রকৃত সাধুগণ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে। ঠিক তখনি কলিযুগের তমসাচ্ছন্ন প্রভাব বিস্তার লাভ করবে। কালক্রমে পরিস্থিতি এতই ভয়ানক হবে যে, এ পৃথিবী তখন একটা নরকে পরিণত হবে, যেখানে মানুষ কেবল দুঃখ পাওয়ার জন্যই জন্মগ্রহণ করবে। সরকার এবং পুলিশ উভয়ই দুর্নীতিগ্রস্ত হবে, তাদের কোনো ভালো-মন্দ বিচারবোধ থাকবে না। রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকদের কোনো সুরক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে না। তারা বিভিন্ন অরাজকতার শিকার হবে, কিন্তু তাদের করণীয় কিছু থাকবে না। একে অন্যের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। পৃথিবীটা তখন একটা যুদ্ধ এবং সংঘাতের ক্ষেত্র হয়ে উঠবে।

এছাড়াও (ভা.১২/২/১২-১৬) কল্কি আবির্ভাবের ঠিক পূর্ববর্তী সময়ে অর্থাৎ কলিযুগ যখন শেষের পথে, তখন সমস্ত জীবের দৈহিক আকৃতি বিপুলভাবে কমে যাবে এবং বর্ণাশ্রম ধর্মের ধর্মীয় বিধিনিষেধ সব ধ্বংস হবে। মানবসমাজে বৈদিক পন্থা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যাবে এবং তথাকথিত ধর্মগুলো হবে প্রধানত নাস্তিক্যবাদী। রাজারা হবে দস্যু-তস্কর প্রায়, চৌর্যবৃত্তি, মিথ্যাভাষণ এবং অনাবশ্যক হিংসা হবে মানুষের পেশা। সমস্ত বর্ণের মানুষ নিম্নতম শূদ্রস্তরে অধঃপতিত হবে। গাভীগুলো হবে প্রায় ছাগলের মতো, আশ্রম তপোবনগুলোর সঙ্গে সাধারণ বাড়িঘরের কোনো পার্থক্য থাকবে না, তাৎক্ষণিক বিবাহ বন্ধনই হবে পারিবারিক বন্ধন। অধিকাংশ বৃক্ষলতা হবে ক্ষুদ্র, সমস্ত গাছ হবে খর্বাকৃতির শমী গাছের মতো। মেঘে শুধু বিদ্যুৎ চমকানি দেখা যাবে, বাড়িঘর হবে ধর্মহীন এবং সমস্ত মানুষ হবে গাধার মতো। পরিশেষে, কলিযুগ প্রারম্ভের ৪,৩২,০০০ বছর পর ভগবান কল্কি অবতাররূপে আবির্ভূত হবেন। শুদ্ধ সত্ত্বগুণের শক্তিতে কার্য করে তিনি সনাতন ধর্মকে রক্ষা করবেন।

কল্কিপুরাণে (১ম অধ্যায়) কলিযুগকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি ভাগে কতগুলো বিশেষ লক্ষণ পরিলক্ষিত হবে–

- কলির প্রথম ভাগে সকলেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করতে থাকবে।
- কলির দ্বিতীয় ভাগে লোকে কৃষ্ণ-নাম-বিবর্জিত হবে।
- আর কলির তৃতীয় ভাগে বর্ণসঙ্কর হতে থাকবে।
- চতুর্থ ভাগে সকলে একবর্ণ হবে অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম থাকবে না এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা এক কালে বিস্মৃত হয়ে যাবে।

"তারপর যখন কলিযুগের শেষে তথাকথিত সাধু এবং উচ্চতর তিন বর্ণের সম্ভ্রান্ত বর্ণের গৃহেও ভগবানের কথা আলোচনা হবে না এবং যখন রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত শূদ্র অথবা তার থেকেও নিকৃষ্ট স্তরের মানুষের হাতে ন্যাস্ত হবে এবং যখন স্বাহা, স্বাধা, ষবট্ ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র আর শোনা যাবে না, তখন ভগবান পরম দণ্ডদাতারূপে আবির্ভূত হবেন।" – শ্রীমদ্ভাগবত (২.৭.৩৮)

কিন্তু এসমস্ত লক্ষণ এখনো পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়নি। এখনো ভারতবর্ষ থেকে সাধুরা বিতাড়িত হননি। যদিও ক্রমে ক্রমে কলিযুগের লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হচ্ছে, তবুও এখনো সমাজ থেকে ধর্ম সম্পূর্ণরূপে চলে যায়নি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত সংকীর্তন আন্দোলন আজ তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, ষড়গোস্বামী, পূর্বতন আচার্যবর্গের কৃপায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মনোভিলাষ পূর্ণ করার জন্য ইস্কন প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বিশ্বব্যাপী এই সংকীর্তন আন্দোলন ব্যাপকভাবে বিস্তার করছেন। দিকে দিকে কৃষ্ণনাম সংকীর্তনের প্রতিধ্বনি ধ্বনিত হচ্ছে। কীর্তিত হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের গুণমহিমা। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ নির্বিশেষে সকলে একত্রে চৈতন্য মহাপ্রভুর এ সংকীর্তন আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে। শ্রীল প্রভুপাদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আগামী ১০,০০০ বছর ধরে মহাপ্রভুর এ সংকীর্তন আন্দোলনের বিজয়পতাকা উড্ডীয়মান থাকবে।

এসকল লক্ষণের সাথে কল্কি অবতারের আবির্ভাবকালীন প্রেক্ষাপটের কোনো সামঞ্জস্য নেই। তাই এটা সুস্পষ্ট যে, কল্কি অবতার আবির্ভূত হওয়ার সময় এখনো আসেনি।

কল্কির আবির্ভাব প্রসঙ্গ

আবিরঃ তিনি কি সাধারণ শিশুর মতোই জন্মগ্রহণ করবেন? নাকি তাঁর ক্ষেত্রে কোনো বিশেষত্ব থাকবে?

দেবব্রতঃ কল্কি অবতার সাধারণ কোনো শিশুর মতো আবির্ভূত হবেন না। পদ্মপুরাণে (উত্তরখণ্ড, ২৪২ অধ্যায়, শ্লোক ৮-১০) বর্ণনা করা হয়েছে– "কলিযুগ শেষ হবার প্রাক্কালে ভগবান কল্কি শম্ভল গ্রামে এক ব্রাহ্মণের গৃহে আবির্ভূত হবেন।"

কল্কিপুরাণে (১ম অংশ, ২য় অধ্যায়) বর্ণিত আছে, ব্রহ্মার বচনানুসারে দেবগণ তাঁর সম্মুখে উপবেশনপূর্বক কলির দোষে ধর্মহানির কথা নিবেদন করলেন। ব্রহ্মা কলির প্রভাবে দুঃখিত দেবগণের বাক্য শ্রবণ করে বললেন, "চল্, আমরা বিষ্ণু সমীপে গমনপূর্বক অভীষ্ট সাধনের জন্য তাঁকে প্রসন্ন করি।" অতঃপর দেবগণসহ ব্রহ্মা বিষ্ণুসমীপে উপস্থিত হলেন ও শ্রীহরির স্তব-স্তুতিপূর্বক ব্রহ্মা দেবগণের অভিপ্রায় এবং প্রার্থনার কথা নিবেদন করলেন। পদ্মপলাশলোচন হরি তৎসমুদয় শ্রবণান্তে ব্রহ্মাকে বললেন, "হে ব্রাহ্মণ। আমি অনুরোধ নিমিত্ত ধরাতলে শম্ভল নামক স্থানে বিষ্ণুযশা নামক বিপ্রের গৃহে তার পত্নী সুমতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করব। চার ভ্রাতা মিলে আমি কলিকে বিনাশ করব। হে দেববৃন্দ, স্বর্গবাসীদের কল্যাণার্থে তোমরা নিজ নিজ অংশে জন্মগ্রহণপূর্বক আমার সাথে সৌহার্দ্য স্থাপন করবে। আমার প্রিয়া লক্ষ্মীদেবীও সিংহলরাজ বৃহদ্রথের পত্নী কৌমুদীর গর্ভে পদ্মা নাম ধারণপূর্বক জন্মগ্রহণ করবে।

হে দেবগণ, তোমরা শীঘ্র নিজ নিজ অংশে মর্ত্যধামে গমন কর। আমি পুনর্বার মরু ও দেবাপি নামক নৃপদ্বয়কে পৃথিবীর শাসনভার অর্পণ করব। পুনরায় আমি সত্যযুগের সৃষ্টি করতঃ পূর্বের ন্যায় ধর্ম সংস্থাপন করব এবং কলিরূপে দুষ্ট ভুজঙ্গকে

দূর করে বৈকুণ্ঠে প্রত্যাবর্তন করব।"

শ্রীহরির এরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক ব্রহ্মাদি দেবগণ স্ব-স্ব লোকে গমন করলেন। ভগবান পরমাত্মা বিষ্ণু স্বীয় মহিমা দ্বারা মনুষ্যরূপে অবতরণ বিষয়ে কৃতপ্রযত্ন হয়ে শম্ভল গ্রামে প্রবেশ করলেন। পরে বিষ্ণুযশা হতে সুমতির পুণ্যগর্ভে এলেন। গ্রহ, নক্ষত্র, রাশি প্রভৃতি সকলেই ঐ গর্ভস্থ শিশুর পদারবিন্দ সেবা করতে লাগলেন।

জগৎপতি বিষ্ণু যে সময় জন্মপরিগ্রহ করলেন, তখন সরিৎ (নদী), সমুদ্র, পর্বত, দেবগণ, ঋষিগণ ও স্থাবর-জঙ্গম সমুদয় লোক হর্ষযুক্ত হলেন। সকল প্রাণীই নানাপ্রকার আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। পিতৃগণ আহ্লাদে নৃত্য করতে আরম্ভ করলেন, দেবগণ পরিতুষ্ট হৃদয়ে বিষ্ণুর যশোগান করতে লাগলেন। গন্ধর্বগণ বাদ্য বাজাতে প্রবৃত্ত হলেন, অপ্সরাগণ নৃত্য করতে লাগলেন। এরপর মাধব মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশী তিথিতে ভগবান বিষ্ণু ধরাধামে আবির্ভূত হলেন।

ভগবান শ্রীবিষ্ণু কল্কিরূপে অবতীর্ণ হলে মহাষষ্ঠী তাঁর ধাত্রী মাতা ও অম্বিকা নাভিচ্ছেত্রী হলেন। সাবিত্রী এসে গঙ্গাজল দ্বারা গাত্রমার্জনপূর্বক তাঁর ক্লেদ অপনয়ন করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাকালে যেরূপ বারিবর্ষণ হয়েছিল, সেরূপ সে অনন্ত বিষ্ণুর কল্কি অবতাররূপে অবতরণকালেও তাঁর নিমিত্ত বসুধা জলরূপসুধা ধারণ করলেন। মাতৃকাগণ মাঙ্গল্য বাক্যে আশীর্বাদ করতে লাগলেন।

ব্রহ্মা দ্রুতগামী পবনদেবকে বললেন, তুমি সূতিকাগারে গমন করে আমার প্রার্থনানুসারে বিষ্ণুর নিকট নিবেদন কর যে, হে নাথ, আপনি বিবেচনা করে দেখুন, আপনার এ চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করা দেবগণের পক্ষেও দুর্লভ। অতএব, আপনি এই রূপ ত্যাগ করে মনুষ্যের ন্যায় রূপ ধারণ করুন। পবনদেব ব্রহ্মার এ বাক্য শ্রবণ করে দ্রুত বেগে ধাবমান হয়ে তা শিশুরূপী পরমেশ্বর বিষ্ণুর নিকট বললেন। পুণ্ডরীকাক্ষ হরি সেই বাক্য শ্রবণ করে তৎক্ষণাৎ দ্বিভুজ হলেন। তাঁর পিতা-মাতা তা অবলোকন করে বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগলেন। এরপর বিষ্ণুর মায়াক্রমে তাঁর চতুর্ভুজ রূপ দর্শন ভ্রান্তি বলে মনে করলেন। পরে শম্ভল নগরে সকল প্রাণী উৎসব প্রকাশ করতে লাগল। সকলেই পাপ-তাপ বিবর্জিত হয়ে সর্বদা মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হলো।

শাস্ত্রে ভগবান কল্কির আবির্ভাব সম্পর্কিত এ বর্ণনার সঙ্গে আধুনিক কালের তথাকথিত কল্কি অবতারদের জন্মগ্রহণের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

কল্কি অবতারের কার্যাবলি

আবির: কল্কি অবতার আবির্ভূত হবার পর তিনি কী কী কার্য সম্পাদন করবেন?

দেবব্রত: বিভিন্ন শাস্ত্রে কল্কি অবতারের কার্যাবলি সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে।

কল্কি পুরাণ

কল্কি পুরাণে (৩.৯-১০) কল্কিদেবের গুরু পরশুরাম শিক্ষা প্রদানের পর বললেন, "ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে কলির বিনাশ নিমিত্ত সর্বাশ্রয় পূর্ণ হরি শম্ভলে আবির্ভূত হন। তুমিই সেই পূর্ণবিষ্ণু, বর্তমানে তুমি আমার নিকট বিদ্যা, শিবের নিকট অস্ত্র এবং বেদময় শুককে প্রাপ্ত হয়ে সিংহলে আপন প্রিয়া পদ্মার পাণিগ্রহণপূর্বক নিত্যধর্ম স্থাপন করবে। তুমি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হয়ে কলিপ্রিয় নৃপতিগণকে পরাজিত করবে এবং বৌদ্ধগণকে উন্মুলনপূর্বক দেবাপি ও মরু নামক ধর্মপরায়ণদ্বয়কে রাজ্য প্রদান করবে।"

এখানে ভগবান কল্কি বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের নির্মূল করবে। আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, ততদিনে বৌদ্ধধর্ম অনেকাংশে মিলিয়ে যাবে। কালক্রমে সব ধর্মই একটি অস্পষ্ট নির্বিশেষ ধারণায় পর্যবসিত হবে। তাই কল্কি অবতার যখন আসবেন, তখন কেবল নাস্তিকতার নামান্তর ছলধর্মই বর্তমান থাকবে। ভগবান কল্কিদেব সেসকল পাপাচারী শাসকদের নির্মূল করে পুনরায় সত্যযুগ প্রতিস্থাপন করবেন। সেটাই তার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য।

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ

ভগবান কল্কি কলির সকল আশ্রয়স্থলসমূহ ধ্বংস করবেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১২/২/১৯-২০) কল্কি অবতারের কার্যাবলি বর্ণনা করে বলা হয়েছে– "বিশ্বের অধীশ্বর ভগবান কল্কিদেব তাঁর দেবদত্ত নামক শ্বেত অশ্ব চালিয়ে ও এক হাতে তরবারি নিয়ে তাঁর

ভগবত্তার আটটি ঐশ্বরিক শক্তি প্রদর্শনপূর্বক সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করবেন। তাঁর অসীম জ্যোতি প্রদর্শন করে এবং অত্যন্ত দ্রুতবেগে অশ্ব চালিয়ে তিনি রাজার বেশধারী লক্ষ লক্ষ চোরদের নিধন করবেন।"

মহাভারত

মহাভারতের বনপর্বে (১৬১.৯৩-৯৭) কল্কি অবতারের আবির্ভাব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– "মহাবীর্য ও মহানুভব কল্কির মননমাত্রই সমুদয় বাহন, কবচ, বিবিধ আয়ুধ ও ভুরিভুরি যোদ্ধা উপস্থিত হবে। তিনি ধর্ম বিজয়ী সম্রাট হয়ে পর্যায়কুল লোক সকলের প্রতি প্রসন্ন হবেন। ক্ষয়কারী ও যুগপরিবর্তক সেই দীপ্তপুরুষ উত্থিত ও ব্রাহ্মণগণ পরিবৃত হয়ে সর্বত্রগত ম্লেচ্ছগণকে উৎসারিত করবেন।"

অগ্নিপুরাণ

অগ্নিপুরাণ (১৬.৭-৯)-এ বর্ণনা করা হয়েছে, "যখন অনার্যরা রাজ্যপদ অধিকার করে নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের শোষণ করতে শুরু করবে, তখন ভগবান কল্কি বিষ্ণুযশার পুত্র এবং যাজ্ঞবল্কের শিষ্য হিসেবে সেসকল অনার্যদের তাঁর অস্ত্র দ্বারা বিনাশ করবেন। তিনি চার বর্ণ ও আশ্রম সমন্বিত নীতি প্রতিষ্ঠা করবেন। তারপর আবার জনগণ সত্য ও ন্যায়ের পথে ফিরে আসবে।"

পদ্মপুরাণ

পদ্মপুরাণে (৬.৭১.২৭৩-২৮২) বর্ণনা করা হয়েছে– "ভগবান কল্কি ম্লেচ্ছদের বিনাশ করে সকল দুরাবস্থা অপসারণ করে কলিযুগের অবসান ঘটাবেন। তিনি সকল ব্রাহ্মণদের একত্রিত করে পরম সত্য প্রতিস্থাপন করবেন। তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত সকল প্রকার জীবনধারা সম্বন্ধে অবগত থাকবেন এবং ব্রাহ্মণ তথা ধার্মিক ব্যক্তিদের ক্ষুধা অপসারণ করবেন। তিনি হবেন জগতের একমাত্র নিয়ন্ত্রক। তাঁকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না এবং তিনিই হবেন বিশ্বের বিজয়পতাকা।"

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ

এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ব্যাখ্যা করতে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে (প্রকৃতি খণ্ড ৭.৫৮-৫৯) কলিযুগ এবং কল্কি অবতারের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে– "তখন পৃথিবীতে অরাজকতা বিরাজ করবে। সর্বত্র অযাচিত কার্যসকল– যেমন, চৌর্যবৃত্তি ও লুটতরাজ বৃদ্ধি পাবে। সেসময় বিষ্ণুযশা নামে এক ব্রাহ্মণের পরিবারে ভগবান নারায়ণ আবির্ভূত হবেন। তিনি এক সুবৃহৎ অশ্বে সওয়ার হয়ে হাতে তরবারি ধারণপূর্বক পৃথিবীতে ম্লেচ্ছদের বিনাশ করবেন। এভাবে পৃথিবী ম্লেচ্ছদের থেকে মুক্ত হবে।"

এই শ্লোকে আমরা দেখতে পাই ভগবান কল্কি একজন যোদ্ধারূপে আবির্ভূত হবেন। তাই ভগবান কল্কি অবতাররূপে শিক্ষা দেয়ার জন্য নয়, বরং ধ্বংস করার জন্য আবির্ভূত হবেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে কল্কিকে ম্লেচ্ছনিধনকারী বলা হয়েছে।

অন্যান্য পুরাণ

লিঙ্গ পুরাণ, বায়ু পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের বর্ণনায় দেখা যায় যে, কল্কি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে অদৃশ্যরূপে বিচরণ করবেন। তারপর বত্রিশ বছর বয়সে তিনি তার অভিযান আরম্ভ করবেন এবং বিশ বছর সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করবেন। তিনি তাঁর সাথে অশ্ব, রথ, হস্তী এবং শুদ্ধ ব্রাহ্মণদের হাতে অস্ত্র সমন্বিত সৈন্যবহর দ্বারা বেষ্টিত থাকবেন। (ব্রাহ্মণ হবার কারণে তাঁদের হাতে সাধারণ অস্ত্র নয় বরং ব্রহ্মাস্ত্র থাকবে)। ম্লেচ্ছ রাজা ও দুষ্ট অসুরেরা তাঁর সাথে যুদ্ধ করতে এলেও তিনি সব পাষণ্ডদের হত্যা করবেন।

কেউ তাঁকে থামাতে পারবে না। পরিশেষে, তিনি গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী স্থানে তাঁর মন্ত্রী এবং অনুগামীদের নিয়ে বিশ্রাম করবেন। তিনি কেবল কতিপয় ব্যক্তিদের পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে রেখে যাবেন। তারাই হবে পরবর্তী প্রজন্মের বীজস্বরূপ। তারপর যখন ভগবান কল্কি পরবর্তী যুগের মার্গ তৈরি করে যাবেন তা পরবর্তী সত্যযুগের সূচনা করবে এবং কলিযুগের ভয়ানক প্রভাব থেকে সভ্যতাকে রক্ষা করবে। তারপর তিনি তাঁর সৈন্যসামন্তসহ স্বধামে প্রত্যাবর্তন করবেন। (লিঙ্গ পুরাণ ৪০.৫০-৯২, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ (৬৪.৭৭-১০৬) এবং বায়ু পুরাণ ৫৮.৭৫-১১০) কল্কি অবতার যেভাবে সমগ্র পৃথিবীতে অত্যাচারীদের বিনাশ করবেন এবং শ্বেত অশ্ব নিয়ে সৈন্যবহরসহ পৃথিবী পরিভ্রমণ করবেন এবং সমস্ত পৃথিবী থেকে অধর্মীদের বিনাশ করবেন, এমন ব্যক্তি এখনও পৃথিবীতে দৃশ্যমান হয়নি।

সত্যযুগের পুনরাগমন

আবির: সকল অধর্মীদের বিনাশ করার পর কি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে?

দেবব্রত: না, কল্কি অবতার অসুরদের বিনাশ করার পর পুনরায় সত্যযুগের সূচনা হবে। মহাভারতের বনপর্বে (১৬১.৯৮-১০৩) ভগবান কল্কিদেবের কার্যাবলির কথা বর্ণনা করে বলা হয়েছে– মার্কণ্ডেয় ঋষি বলছেন–"মহারাজ, তারপর ভগবান কল্কি দস্যুসংহার করে মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ সমুদয় মেদিনীমণ্ডল ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ ও লোকমধ্যে বিধাতৃবিহিত মর্যাদা সংস্থাপনপূর্বক পরমরমণীয় কাননে প্রবেশ করবেন। ভূলোকবাসী মনুষ্যগণ সেই নিয়মানুসারেই কার্য করবে; সত্যযুগে ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে অনায়াসে চৌরক্ষয় হবে। দ্বিজোত্তম কল্কি পরাজিত দেশসমুদয়ে কৃষ্ণাজিন, শক্তি, ত্রিশূল ও অন্যান্য আয়ুধসমুদয় সংস্থাপনপূর্বক ব্রাহ্মণগণকর্তৃক সংস্তূয়মান হয়ে দস্যুদল দলনপূর্বক পৃথিবীমণ্ডল ভ্রমণ করবেন। তখন দস্যুগণ দারুণ যাতনায় 'হা তাত! হা মাতঃ ! হা পুত্র!' বলে করুণস্বরে ক্রন্দনপূর্বক তার করাল করবালের বলিস্বরূপ হবে।

"হে মহারাজ, এইরূপে সত্যযুগ আরম্ভ হলে অধর্মের নাশ, ধর্মের বৃদ্ধি ও মনুষ্যগণ ক্রিয়াবান হয়ে উঠবে। চতুর্দিকে উপবন, চৈত্য, তড়াগ, আবাসস্থল, পুষ্করিণী ও দেবতাস্থান-সমুদয় নির্মাণ এবং বিবিধ যজ্ঞ ক্রিয়ানুষ্ঠান হবে। সর্বদাই ব্রাহ্মণ, সাধু ও তপস্বীগণ দৃষ্ট হবে। পূর্বে যে সমুদয় আশ্রমে কেবল পাষণ্ডগণকেই দেখা যেত, এখন তার সবই সত্যপরায়ণ জনগণে পরিপূর্ণ হবে। চিরবদ্ধমূল কুসংস্কার সমুদয় প্রজাগণের হৃদয়ক্ষেত্র হতে দূরীভূত হবে। সমুদয় ঋতুতেই সমুদয় শস্য সমুৎপন্ন হবে। মনুষ্যগণ দান, ব্রত ও নিয়মে নিরত হবে। বিপ্রগণ জপযজ্ঞপরায়ণ, ষট্‌কর্মনিরত, ধর্মাভিলাষী ও সতত সন্তুষ্টচিত্ত হবেন, ক্ষত্রিয়গণ বিক্রমে রত হবে, ভূপতিগণ ধর্মসহকারে পৃথিবী পালন করবেন, বৈশ্যগণ ব্যবহারনিরত এবং শূদ্রগণ

উক্ত বর্ণত্রয়ের শুশ্রুষাপরায়ণ হবে। (ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড ৭.৬৩-৬৮, মহাভারত, বনপর্ব, ১৬১.১০৪-১১১)

বিষ্ণু পুরাণে (অধ্যায়-২৪) বর্ণনা করা হয়েছে– "তাঁর দুর্দমনীয় প্রতাপের দ্বারা তিনি সকল ম্লেচ্ছ ও পাপকার্যে প্রবৃত্তদের সংহার করবেন এবং পুনরায় পৃথিবীতে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন। যেসকল মানুষ কলিযুগের শেষেও বর্তমান থাকবে তারা জাগরিত হবে এবং তারা স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ হবে। যারা এ যুগ পরিবর্তনকালে তাদের গুণের প্রভাবে টিকে থাকবে, তারাই হবে ভবিষ্যতের বীজস্বরূপ। তারা এমন এক জাতির জন্ম দেবে যারা পূর্ণরূপে সত্যযুগের বিধিনিষেধসমূহ অনুশীলন করবে।

যদা চন্দ্রশ্চ সূর্যশ্চ তথা তিষ্যবৃহস্পতী।
একরাশৌ সমেষ্যন্তি ভবিষ্যতি তদা কৃতম্ ॥

যখন চন্দ্র, সূর্য, পুষ্যানক্ষত্র এবং বৃহস্পতি একরাশিতে অবস্থান করবে, তখন পুনরায় সত্যযুগের সূচনা হবে (মহাভারত বনপর্ব, অধ্যায় ১৬১.৯০, শ্রীমদ্ভাগবত-১২.২.২৪)। এমন যোগ কলিযুগে অদ্যাবধি দেখা যায়নি।

অগ্নি পুরাণে (১৬/১০) বর্ণনা করা হয়েছে–" ভগবান হরি কল্কিরূপ ত্যাগ করে বৈকুণ্ঠে গমন করবেন। তখন পুনরায় সত্যযুগের সূচনা হবে।"

কল্কিপুরাণে (২৪.৮) রাজা শশিধ্বজের স্ত্রী সুশান্তা ভগবান কল্কিদেবের আবির্ভাবের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বলেছেন– "আপনার আবির্ভাবে সাধুগণের সম্মান বৃদ্ধি, ব্রাহ্মণদিগের অভ্যুত্থান, দেবগণের রক্ষণ, সত্যযুগের পুনঃ অধিকার লাভ, ধর্মের বৃদ্ধি ও কলির নিধন হচ্ছে।"

দুষ্কৃতকারী শাসক, নাস্তিক এবং ম্লেচ্ছদের সংহার করার পর প্রকৃত সনাতন ধর্ম পুনঃস্থাপন করে ভগবান কল্কিদেব আবার শম্ভল গ্রামে ফিরে এলেন। কল্কি পুরাণে (২১.২-৫) বলা হয়েছে– "স্বর্গপুরীর ন্যায় সম্ভলে সভা, আপণশ্রেণি, চত্বর, ধ্বজ, পতাকাদি দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে অতিশয় সুশোভিত হলো। এই স্থান অষ্টষষ্ঠী তীর্থ সদৃশ হলো। এখানে দেহত্যাগ হলে মোক্ষলাভ ও কলির পাদপদ্মে আশ্রয় সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়। বিবিধ পুষ্পরাজি সমন্বিত বন, উপবন বিরাজিত এই শম্ভল ক্ষিতিস্থলে মোক্ষ ফলদাতা হয়ে উঠল।

কল্কি পুরাণে (২৮.২৭-৩০) বর্ণনা করা হয়েছে কীভাবে ভগবান কল্কি শান্তিময় অবস্থা সৃষ্টি করেছিলেন– "প্রতাপান্বিত স্বয়ং কলি তিনি কৃতকর্মাদি পুত্রগণকে দ্বারকান্তগৃত চোল, বর্বর ও কর্বদেশ প্রদান করলেন। তিনি ভক্তি সহকারে পিতাকে অসংখ্য ধনরত্নাদি প্রদানপূর্বক শম্ভলবাসী প্রজাগণকে অভয় দিলেন। পরে

গৃহস্থাশ্রমে থেকে রমা ও পদ্মাসহ পরমানন্দে দিন কাটাতে লাগলেন। ত্রিজগতে সত্যযুগ প্রতিষ্ঠিত হলো।"

তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে বেদ, ধর্ম, সত্যযুগ, দেবগণ, স্থাবর, জঙ্গমাদি বিশ্বের জীবসকল, হৃষ্টপুষ্ট ও প্রীত হলেন। পূর্বযুগে অর্থাৎ কলিযুগে নানাবিধ অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত দেবমূর্তিগণকে ইন্দ্রজালিকের ন্যায় ব্যবহার করে যেসকল পূজক জনসাধারণকে মোহিত করতেন, তারা দূর হবে এবং সাধু না হয়েও সর্বাঙ্গে তিলকচিহ্ন ধারণ করে মায়ামোহ অলঙ্কৃত হয়ে যে পাষণ্ডরা সাধুদের বঞ্চনা করতেন, সেই পাষণ্ডদের আর দেখা যাবে না। এভাবে কল্কি রমা ও পদ্মাসহ সম্ভলে বাস করতে লাগলেন। এবার কল্কির পিতা বিষ্ণুযশা কল্কিকে বললেন– "দেবতাগণ জগতের হিতকারী, তুমি তাঁদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান কর।" কল্কি পুরাণ (৩.১৬.২-৫)।

সত্যযুগ প্রতিষ্ঠিত হলে রাজাগণ দিনরাত কল্কির নাম জপ ও কল্কির মূর্তি চিন্তা করবেন। তখন ভূমণ্ডলমধ্যে কোনো প্রজাই অধার্মিক, অল্পায়ু, দরিদ্র, পাষণ্ড ও কপটাচারী থাকবে না। সকল জীবই ক্লেশরহিত, মাৎসর্যশূন্য, দেবতাসদৃশ সদানন্দময় হবে (ক.পু.৩.১৯.৩১-৩৪)।

উপর্যুক্ত শাস্ত্রীয় শ্লোকসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ভগবান কল্কি সমস্ত পৃথিবীতে অসাধারণ পরাক্রম প্রদর্শন করে অধার্মিকদের নাশ করে ধার্মিকদের সুরক্ষা দেবেন এবং সমগ্র পৃথিবীতে তখন শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। অর্থাৎ, পুনরায় সত্যযুগ সূচনা করবেন। তখন পৃথিবীতে কোনো হানাহানি, হিংসা-দ্বেষ ইত্যাদি থাকবে না। কিন্তু আমরা বর্তমান পৃথিবীতে কেমন দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি? সারাবিশ্বে অশান্তির ডামাডোল। দেশে দেশে অশান্তি আর যুদ্ধ-বিগ্রহ ক্রমে ক্রমে বেড়েই চলেছে। সমাজের যারা রক্ষক, তারাই সমাজে দুর্নীতির চরম শিখরে অবস্থান করছে। শান্তি তো নেই-ই, বরং কলিযুগের লক্ষণসমূহ ক্রমশঃ অধিক স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হচ্ছে। পাঠকদের কাছে প্রশ্ন– এগুলো কি সত্যযুগের লক্ষণ?

কল্কি অবতার পুনরায় এই পৃথিবীতে সত্যযুগ প্রবর্তন করবেন। তাই, উপর্যুক্ত প্রমাণসমূহ থেকে স্বীকৃত হয়, যদি সত্যযুগের লক্ষণই প্রদর্শিত না হয়, তবে কীভাবে কল্কি অবতারের আবির্ভাব হলো?

কল্কির তিরোধান

আবির: কল্কি অবতার কীভাবে এই পৃথিবী থেকে অন্তর্হিত হবেন?

দেবব্রত: কল্কি পুরাণে (৩.১৯.১৩-২৮) কল্কির তিরোভাব সম্পর্কে খুব সুন্দর ও সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে– কল্কি দেবগণের বাক্যে আনন্দিত হলেন ও পাত্রমিত্র পরিবৃত হয়ে বৈকুণ্ঠ গমনে ইচ্ছা করলেন। তারপর তিনি প্রজাগণপ্রিয়, পরম ধার্মিক, মহাবলবীর্যবান, পরাক্রমী চার পুত্রকে তৎক্ষণাৎ রাজ্যে অভিষেক করলেন। প্রজাগণকে ডেকে নিজ বিবরণ শুনিয়ে বললেন – 'দেবতাদের অনুরোধে আমাকে বৈকুণ্ঠে যেতে হবে।' প্রজাগণ তা শুনে বিস্মিত হলো ও অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল। পুত্রগণ যেমন পিতাকে বলেন, সেরূপ তারা ঈশ্বরকে প্রণাম করে তাদের দুঃখের কথা নিবেদন করলেন। প্রজাগণের কথা শুনে কল্কি সৎকথা দ্বারা তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বিষণ্ণ মনে পত্নীদ্বয়সহ অরণ্যে গমন করলেন। তারপর তিনি মুনিগণ পরিবেষ্টিত অবস্থায় গঙ্গাজল দ্বারা দেবগণ কর্তৃক পূজিত হয়ে, অন্তরের আনন্দ প্রদানকারী হিমালয়ে গমন করলেন। সেখানে গিয়ে দেববৃন্দে পরিবৃত হয়ে গঙ্গাতীরে বসলেন ও অপরূপ চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি ধারণপূর্বক আপনাকে স্মরণ করতে আরম্ভ করলেন।

হিমালয়ং মুনিগণৈরাকীর্ণং জাহ্নবীজলৈঃ।
পরিপূর্ণঃ দেবগণৈঃ সেবিতং মনসঃ প্রিয়ম্ ॥
গত্বা বিষ্ণুঃ সুরগণৈর্বৃতশ্চারুচতুর্ভুজঃ।
উষিত্বা জাহ্নবীতীরে সম্মানাত্মনমাত্মনা ॥

(ক.পু.৩.১৯.২০-২১)

তাঁর সহস্র সূর্যের ন্যায় তেজোরাশি প্রকাশ পেতে লাগল। সেই পূর্ণ জ্যোতির্ময় সাক্ষিরূপ সনাতন পরমাত্মা শোভা পেতে লাগলেন। তাঁর আকৃতি বিবিধ ভূষণের বিভূষণ স্বরূপ হলো। তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শার্ঙ্গ ইত্যাদি দ্বারা আরাধিত হতে লাগলেন। তাঁর বক্ষে কৌস্তুভমণি বিরাজ করছে। দেবগণ তাঁর উপর সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। চারদিকে দেবতাগণের দুন্দুভিধ্বনি হতে লাগল। এভাবে কল্কি বৈষ্ণবগণের পরমপদরূপ ভগবৎস্বরূপে এজগৎ থেকে অন্তর্হিত হন। তখন তাঁর অপরূপ রূপে স্থাবর জঙ্গম সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লোকই মুগ্ধ হলো ও তাঁর স্তুতি করতে লাগল। রমা ও পদ্মা উভয়ে তাঁদের পতি মহাত্মন কল্কির সেরূপ মহা অদ্ভুত রূপ দর্শন করে, অগ্নিতে প্রবেশ করে তাঁকে লাভ করলেন। ধর্ম ও সত্যযুগ কল্কির আজ্ঞায় পৃথিবীতে শত্রুহীন হয়ে পরম সুখে চিরদিন ভ্রমণ করতে লাগলেন। দেবাপি ও মরু ভূপতিদ্বয় ভগবান কল্কির আজ্ঞায় প্রজাদের রক্ষা ও রাজ্য রক্ষা করতে লাগলেন ।

কল্কি অবতারের তিরোধানের যে বর্ণনা পাওয়া গেল, বিশেষত তাঁর হিমালয়ে গমন এবং শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী চতুর্ভূজ বিষ্ণুরূপ ধারণপূর্বক অন্তর্ধান এবং এর পরপরই তাঁর পত্নীদের অগ্নিতে প্রবেশের ঘটনা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, এই কলিযুগে তেমন কোনো ব্যক্তি পৃথিবীতে অদ্যাবধি আবির্ভূত হননি। তাছাড়া, কল্কির অন্তর্ধানের পর তাঁর আজ্ঞায় দেবাপি ও মরুদ্বয় পৃথিবী শাসন করবেন। কিন্তু আমরা কি তেমন কোনো ব্যক্তির দ্বারা পৃথিবী শাসিত হতে দেখছি? অতএব, কল্কি অবতার যে অবতীর্ণ হননি তাতে আর সন্দেহ কী?

দ্বিতীয় ভাগ

মিল-গোঁজামিল-অমিল-বিভ্রান্তি

অধ্যায়

১

নাম সম্পর্কিত বিভ্রান্তি ও সামাধান

আবির: আপনি কল্কি অবতারের আবির্ভাবের কাল, আবির্ভাব, কর্যাবলি ও আবির্ভাবের প্রেক্ষাপটের যে বর্ণনা দিলেন, তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, কল্কি অবতার এখনো আবির্ভূত হননি। কিন্তু আমি যে বইটির কথা শুরুতে বলেছি, তাতে বৈদিক শাস্ত্র থেকেই বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করা হচ্ছে যে, কল্কি অবতার ইতোমধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন। তারা কল্কির নাম, কল্কির মাতা-পিতার নাম, আবির্ভাব স্থান ও কার্যাবলি ইত্যাদি বিষয়ে যে প্রমাণ প্রদান করছে তা কি সত্য নয়?

দেবব্রত: কলিযুগের অন্তে ভগবান কল্কির আবির্ভাব প্রসঙ্গে কল্কি অবতারের নাম, তাঁর আবির্ভাব-স্থানের নাম, তাঁর পিতা, মাতা, গুরু, ভ্রাতা, স্ত্রী, সন্তানাদি সকলের নাম যদিও সমস্ত শাস্ত্রে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, তথাপি বর্তমানে যারা প্রচার করছে যে, কল্কি অবতার এসে গেছেন, তারা নামের বিভিন্ন কাল্পনিক অর্থ করে কল্কি'র পরিবর্তে অন্য নামের কোনো ব্যক্তিকে কল্কি অবতার বলে প্রতিপন্ন করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।

আবির: কিন্তু তাদের বর্ণনানুসারে যে ব্যক্তিকে তারা কল্কি বলছে, তার নামের অর্থ এবং কল্কি'র নামের অর্থ তো একই তাছাড়া, কল্কির পিতা, মাতা, গ্রাম ইত্যাদি বিষয়েও তারা কল্কি অবতারের সাথে সাদৃশ্য বা মিল প্রদর্শন করছে। এর দ্বারা কি এটাই প্রমাণিত হচ্ছে না যে, তিনিই কল্কি?

দেবব্রত: আপনি যেসব সাদৃশ্যের কথা এখানে বললেন, সেসম্বন্ধে আমি পর্যায়ক্রমে আপনাকে বলছি। প্রথমে আসা যাক, নামের সাদৃশ্য প্রসঙ্গে। দুজন ব্যক্তির নামের অর্থ এক হওয়া মানে দুজন একই ব্যক্তি নয়। আবার, দুজন ব্যক্তির নাম এক

হলেও তারা ব্যক্তি হিসেবে ভিন্ন হতে পারে। আমরা প্রায় সকলেই উপপাদ্যে ত্রিভুজের সর্বসমতার প্রমাণ পড়েছি। সর্বসম মানে সকল দিক থেকেই সমান। একজন ব্যক্তির সাথে অন্য কোনো ব্যক্তির অসংখ্য মিল থাকতে পারে।

ধরা যাক, 'তপন' ও 'অরুণ' দুজন ব্যক্তি। দুজনের নামের একই অর্থ– 'সূর্য'। তপনের পিতার নাম 'পরিতোষ' আর অরুণের পিতার নাম 'প্রমোদ'। দুটো নামেরই অর্থ 'আনন্দ'। আবার, মায়ের নামের ক্ষেত্রে তপনের মাতার নাম 'পুষ্প' আর অরুণের মাতার নাম 'কুসুম'। এক্ষেত্রেও নাম দুটির অর্থ একই– 'ফুল'। তাদের দুজনেই একই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন। দুজনেই একই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছেন। এভাবে অসংখ্য মিল আমরা খুঁজে পেতে পারি।

আবার, একইসাথে তাদের মধ্যে অসংখ্য অমিলও দেখানো সম্ভব। যেমন, তারা একই গ্রামে জন্মগ্রহণ করলেও, একই বাড়িতে না-ও হতে পারে। আবার, দুজনের মধ্যে কেউ হয়ত বেঁটে, কেউ লম্বা। আবার, তারা একই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করলেও, তাদের একই ডিগ্রি না-ও হতে পারে। এভাবে দু-জনের মধ্যে অসংখ্য অমিলও দেখানো যেতে পারে।

তাই, দুজন ব্যক্তির মধ্যে রূপক বা কাল্পনিক কিছু মিল উত্থাপন করলেই দুজন একই ব্যক্তি হবেন না। আপনি একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন, তারা যেসব মিল প্রদর্শন করছে, এগুলো কাল্পনিক। আর যদি অর্থগত দিক থেকে মিল থেকেও থাকে, তবুও কি দুজন ব্যক্তি এক হবেন। কখনোই নয়, যা আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি যে, নাম, মাতা-পিতার নামের অর্থ এক হলেই দুজন ব্যক্তি এক হয় না।

দুজন ব্যক্তি তখনি এক বলে স্বীকৃত হবে, যখন দুজনের মধ্যে কোনো অমিল থাকবে না। অর্থাৎ, শতভাগ মিল থাকবে। তাই যারা কল্কি অবতারের সাথে অন্য কোনো ব্যক্তির নামের অর্থ মিলিয়ে তাকে কল্কি অবতাররূপে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস করছে, এটা নিঃসন্দেহে প্রতারণা। তাছাড়া, শাস্ত্রে যেসকল নাম বা স্থান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, ঠিক সেই নামেই সেসকল ব্যক্তি বা স্থানসমূহ প্রকাশিত হয়েছে।

নামের ক্ষেত্রে জোরপূর্বক মিলাতে গিয়ে তারা সমস্ত নামকে কেবল বিশেষণ বা গুণবাচক শব্দরূপে চিন্তা করে, ব্যক্তি বা স্থানের নামরূপে নয়। অথচ, শাস্ত্রে উল্লেখিত ভগবান কল্কির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত প্রতিটি ব্যক্তি, বস্তু বা স্থানের নাম যদি কেবল বিশেষণই হয়, তাহলে এতগুলো শাস্ত্রে বর্ণিত কল্কির জীবনীই অসম্পূর্ণ বলতে হবে। কারণ, তা পাঠ করে কল্কি সম্পর্কিত অনেক মৌলিক প্রশ্ন– যেমন, কল্কি অবতারের লীলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি, বস্তু বা স্থানের নাম অজানাই থেকে যাবে।

পৃথিবীতে এমন কোনো ব্যক্তির জীবনচরিত রচিত হয়নি, যেখানে সে ব্যক্তির নামই নেই। ইতিহাস যাচাই করে যদি ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত স্থান, কাল বা ব্যক্তির কোনো তথ্য না পাওয়া যায়, তবে আদর্শ রচনায় তার উল্লেখ থাকে। যদি তাও উল্লেখ না থাকে, তবে ধরে নেওয়া হয় সেসব তথ্য পাওয়া যায়নি। ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার ও শাস্ত্রকার ব্যাসদেব নিশ্চয়ই এমন অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন নন যে, এতগুলো শাস্ত্রে বিশেষত কল্কিপুরাণ, যেখানে কল্কি অবতারের সমগ্র জীবনের লীলাবিলাসের বর্ণনা রয়েছে, সেখানে তিনি কল্কি অবতারের সঙ্গে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ নামগুলোই উল্লেখ করবেন না। এ থেকে প্রমাণিত যে, শাস্ত্রে উল্লেখিত ভগবান কল্কির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত যে যে ব্যক্তি, বস্তু বা স্থানের নাম উল্লেখ রয়েছে, সেই সেই, নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেই ভগবান কল্কি লীলাবিলাস করবেন।

কল্কি অবতারের সঙ্গে আপাত-সাদৃশ্যপূর্ণ কিছু গোঁজামিল দেখিয়ে প্রতারকরা যে বিষয়গুলোর অপব্যাখ্যা করে যাকে-তাকে কল্কি অবতার বলে প্রমাণ করতে চাচ্ছে, সেগুলোর প্রকৃত ব্যাখ্যা আমি ধারবাহিকভাবে বলছি।

আবির: স্যার, সত্যিই, অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা।

কল্কি অবতারের নাম

আবির: কিন্তু আমি যে বইটি পড়েছি, তা থেকে মনে হলো কল্কি অবতারের নাম কল্কি নয়, অন্য কিছু।

দেবব্রত: বৈদিক সংস্কৃতিতে গুণ বিচারপূর্বক নামকরণের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, যুদ্ধেও তার বুদ্ধি স্থির থাকবে বলে জ্যেষ্ঠপাণ্ডবের নাম রাখা হয় যুধিষ্ঠির, অধিক ভোজনে সমর্থ বলে বৃকোদর, যুদ্ধে জয় করা কঠিন বলে ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাখা হয় দুর্যোধন, এভাবে নামকরণ করা হয়। মহাভারতের যুদ্ধস্থলকে কুরুরাজা বহু যজ্ঞ করে ধর্মক্ষেত্রে পরিণত করেছিলেন বলে সে স্থান ধর্মক্ষেত্র ও কুরুক্ষেত্র নামে খ্যাত হয়। সবাইকে আনন্দদান করেন বলে ত্রেতাযুগে ভগবান রাম নাম ধারণ করে লীলাবিলাস করেন, দ্বাপরে অবতীর্ণ হয়ে তাঁর সর্বাকর্ষক গুণের জন্য তিনি কৃষ্ণ নাম ধারণ করে। একইভাবে, কলি-কলুষ নাশকারীরূপে ভগবান কল্কি নামে অবতীর্ণ হবেন।

কিন্তু, অনেকে 'কল্কি' শব্দের বিভিন্ন অর্থ করে ভিন্ন নামধারী ব্যক্তিকে কল্কি অবতার হিসেবে প্রমাণ করতে চাইছে।

কেউ কেউ বলেন– "কল্কি অর্থ 'ডালিম ভক্ষণকারী' অথবা 'কলঙ্ক বিধৌতকারী'। অমুক ডালিম খেয়েছেন এবং বহু অসৎকে সত্যের পথ দেখিয়েছেন, সুতরাং তিনি কল্কি অবতার।" তাছাড়া, কল্কি মানে ডালিম ভক্ষণকারী– একথা পৃথিবীর কোনো প্রামাণিক অভিধানে আছে কি? তাদের এ যুক্তি মেনে নিলে অসংখ্য ব্যক্তিকে কল্কি অবতার বলে মেনে নিতে হয়। কিন্তু কল্কি একজন, যিনি এখনো আবির্ভূত হননি।

❍ কল্কি-অবতার 'কল্কি' নামেই খ্যাত হবেন

বৈদিক শাস্ত্রে যে স্থলে 'রাম-অবতার', বুদ্ধ-অবতার, বামন-অবতার প্রভৃতি শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোর দ্বারা যথাক্রমে রাম, বুদ্ধ, বামন প্রভৃতি নামে খ্যাত ভগবৎ-অবতারদেরই বোঝানো হয়েছে। তবে, যেখানে বলা হয়েছে 'কল্কি-অবতার', তখন এর দ্বারা কল্কি ভিন্ন অন্য নামে খ্যাত ব্যক্তিকে কেন বোঝানো হবে? অন্যান্য অবতারগণের ন্যায় কল্কি-অবতার কল্কি নামেই খ্যাত হবেন। আমি এ বিষয়ে শাস্ত্র থেকেই প্রমাণ দিচ্ছি। কল্কি পুরাণে (১ম অংশ, ২য় অধ্যায়, শ্লোক ২৪) বলা হয়েছে–

হরেঃ কল্যাণকৃদ্বিষ্ণুযশাঃ শুদ্ধেন চেতসা।
সামর্গ্ যজুর্বিদশুিরগ্র্যৈস্তন্নামকরণে রতঃ ॥

"শ্রীহরি কল্কির আবির্ভাবের পর পিতা বিষ্ণুযশা ঋক্, সাম ও যজুর্বেদী প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ দ্বারা তাঁর নামকরণ করেন।"

নাম্নাকুর্বংস্ততস্তস্য কল্কিরিত্যভিবিশ্রুতম্ ॥ (কল্কিপুরাণ– ১.২.২৯)।

অর্থাৎ, "তাঁরা ঐ বালকের নামকরণকালে 'কল্কি'–এই বিখ্যাত নাম রাখেন।"

এই শ্লোকে 'নাম্না' ও 'কল্কি' শব্দ দুটি নিশ্চিত করে যে, ঐ শিশুটির নামই রাখা হয় 'কল্কি'। সুতরাং, কল্কি ভিন্ন অন্য নামে খ্যাত কোনো ব্যক্তি কখনো কল্কি অবতার নন।

আবার, কারো নাম কল্কি হলেও যদি তাঁর জীবনচরিত কল্কি অবতার সম্বন্ধে শাস্ত্রে বর্ণিত সবকিছুর সঙ্গে শতভাগ সাদৃশ্যপূর্ণ না হয়, তবে তিনি কল্কি অবতার নন।

যারা তাদের পছন্দনীয় ব্যক্তিকে বৈদিক শাস্ত্রোক্ত কল্কি হিসেবে মনে করেন এবং প্রচার করেন, তারা কেন তাদের বক্তৃতা, গ্রন্থ ও প্রচারপত্র থেকে সেই ব্যক্তির অন্য নামের পরিবর্তে আসল নাম অর্থাৎ কল্কি নামটি উল্লেখ করেন না? অমুকের জীবনী, অমুকের বাণী, অমুকের মন্দির ইত্যাদির পরিবর্তে কল্কির জীবনী, কল্কির বাণী– এভাবে প্রচার করেন না কেন? এর দ্বারা কি এটাই প্রমাণিত হয় না যে, তারা কেউ কল্কি অবতার নন।

কল্কির পিতা-মাতা: বিষ্ণুযশা-সুমতি

আবির: বুঝলাম, কল্কি অবতারের নাম হবে 'কল্কি'। কিন্তু কল্কি'র পিতা-মাতার ক্ষেত্রে তারা যে অর্থগত মিল উত্থাপন করে, সেক্ষেত্রে আপনি কী বলবেন?

দেবব্রত: পদ্মপুরাণে (উত্তরখণ্ড, ২৪২ অধ্যায়, শ্লোক ১-১০) বর্ণনা করা হয়েছে– "কল্কির পিতা বিষ্ণুযশ স্বায়ম্ভুব মনুর অবতার। স্বায়ম্ভুব মনু গোমতী নদীর তীরে নৈমিষায় ভগবান বিষ্ণুকে তিন জন্মে তাঁর পুত্ররূপে পাবার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ভগবান তাঁকে তিন জন্ম– রাম, কৃষ্ণ এবং কল্কির পিতা হবার বর দান করেন। এভাবে স্বায়ম্ভুব মনু দশরথ, বসুদেব এবং ব্রাহ্মণ বিষ্ণুযশা রূপে অবির্ভূত হন।"

এবং দত্ত্বা বরং তস্মৈতত্রৈবান্তদধে হরিঃ
অস্যাভূত প্রথমং জন্ম মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্য চ ॥ ৮ ॥
রঘুণামন্বয়ে পূর্বং রাজা দশরথ হ্যভূৎ।
দ্বিতীয়ো বসুদেবোহভূদ্বৃষ্ণীনামন্বয়ে বিভুঃ ॥ ৯ ॥
কলের্দিব্য সহস্রাব্দপ্রমাণস্যান্তপাদয়োঃ
শম্ভলগ্রামকং প্রাপ্য ব্রাহ্মণঃ সঞ্জনিষ্যতি ॥ ১০ ॥

❍ উল্লেখ্য যে, পূর্বযুগে 'দশরথ' বা 'বসুদেব' শব্দগুলো কেবল বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়নি, বরং এ নামেই তাঁরা ভগবানের পিতারূপে লীলা করেছেন। অতএব, এ যুগে কল্কির পিতারূপে লীলার ক্ষেত্রে 'বিষ্ণুযশ' শব্দটি শুধু বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

তাই, শাস্ত্রে যেখানেই কল্কির আবির্ভাবের প্রসঙ্গ রয়েছে, সর্বত্র তাঁর পিতা ও মাতার নাম যথাক্রমে বিষ্ণুযশা ও সুমতি বলেই উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু অনেকেই কল্কির নামের ন্যায় তাঁর পিতামাতার নামেরও নানারকম বিকৃত অর্থ দেখিয়ে অন্যনামী বিভিন্ন ব্যক্তিকে কল্কির পিতামাতা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। তারা বলে, "'বিষ্ণুযশ' শব্দ দ্বারা কল্কির পিতা যে বিষ্ণুর বা ভগবানের ভক্ত তা বোঝানো হয়েছে। আসলে, কল্কির পিতার অন্য কোনো নাম আছে।" এবার শুনুন এ অপব্যাখ্যার সমাধান।

❍ 'বিষ্ণুযশ' অর্থ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভক্তরূপে যাঁর যশ আছে অথবা বিষ্ণুর ন্যায় যশ যাঁর এবং 'সুমতি' অর্থ সুবুদ্ধি বা সুন্দর বুদ্ধিবিশিষ্ট। পৃথিবীতে বহু দম্পতি রয়েছে, যারা বিষ্ণুভক্ত এবং সুবুদ্ধিসম্পন্ন, তাই বলে তারা কেউই কল্কির পিতামাতা নন। শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধের ২৫নং শ্লোকে বলা হয়েছে–

জনিতা বিষ্ণুযশসো নাম্না কল্কির্জগৎপতি

আবার, মহাভারতের বনপর্বে ১৬১ অধ্যায়ের ৯২নং শ্লোকে বলা হয়েছে–

কল্কী বিষ্ণুযশা নাম দ্বিজঃ কালপ্রচেদিতঃ

এ শ্লোকদ্বয়ে 'নাম্না' ও 'নাম' শব্দগুলো নিশ্চিত করে যে, কল্কির পিতার নামই হবে বিষ্ণুযশা।

❍ আরেকটি বিবেচ্য বিষয় হলো, এ যাবৎকালে ভগবান কখনো অসুরকূলে আবির্ভূত হননি; কারণ ভগবানকে পুত্ররূপে লাভ করা ভগদ্‌বিদ্বেষী কোনো সাধারণ বদ্ধজীবের পক্ষে সম্ভব নয়; কেবল ভক্তের পক্ষেই তা সম্ভব। পূর্বে পৃশ্নি-সুতপা, কৌশল্যা-দশরথ, দেবকী-বসুদেব, নন্দ-যশোদা আদি যাঁদের ভগবান তাঁর পিতামাতারূপে গ্রহণ করেছিলেন, সকলেই ছিলেন মহান ভগবদ্ভক্ত। সুতরাং, কল্কি পুরাণ, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, পদ্মপুরাণাদি শাস্ত্রে কোথাও কল্কির পিতার নামোল্লেখ না করে, তিনি যে বিষ্ণুযশ বা ভগবদ্ভক্ত হবেন, শুধু তা উল্লেখ করা অযৌক্তিক। কল্কির পিতা যে একজন ভগবদ্ভক্ত থাকবেন তা খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং, শাস্ত্রে বিষ্ণুযশ অর্থে ব্যক্তির নামকেই নির্দেশ করছে এবং মাতা সুমতির ক্ষেত্রেও তা-ই।

❍ আবার, ভাগবতের আরেকটি শ্লোকে (১২.২.১৮) বলা হয়েছে–

শম্ভলগ্রামমুখ্যস্য ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ।
ভবনে বিষ্ণুযশসঃ কল্কিঃ প্রাদুর্ভবিষ্যতি ॥

অর্থাৎ, "ভগবান কল্কি শম্ভল গ্রামের মুখ্য ব্রাহ্মণ মহাত্মা বিষ্ণুযশের গৃহে আবির্ভূত হবেন।" এখানে কল্কির পিতাকে 'মহাত্মনঃ' অর্থাৎ 'মহাত্মা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং একই শ্লোকে 'বিষ্ণুযশ' শব্দটিরও উল্লেখ রয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৭/১৯ নং শ্লোকে 'মহাত্মা'-র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে– "*বাসুদেব সর্বমিতি স মহাত্মা*"। অর্থাৎ, পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণ বা বিষ্ণুকে যিনি সর্বকারণের পরম কারণরূপে জেনে তাঁর শরণাগত হন– এক কথায়, যিনি শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুভক্ত, তিনিই মহাত্মা। সুতরাং, ভাগবতের ঐ শ্লোকে 'মহাত্মন' শব্দ দ্বারা ইতোমধ্যে বুঝানো হয়েছে যে, কল্কির পিতা বিষ্ণুভক্ত; তাই একই অর্থপূর্ণ শব্দ পুনরায় ব্যবহার অনাবশ্যক। যদি 'বিষ্ণুযশ' শব্দটিকে কল্কির পিতার নামরূপে বিচার না করে, তিনি যে বিষ্ণুর ভক্ত, শুধু তা-ই অর্থ করা হয়, তবে শ্লোকের অর্থ হবে– "ভগবান কল্কি শম্ভল গ্রামের মুখ্য ব্রাহ্মণ বিষ্ণুভক্ত (মহাত্মা) বিষ্ণুভক্তের (বিষ্ণুযশের) গৃহে আবির্ভূত হবেন।"

ব্যাকরণে পণ্ডিতের কথা না হয় বাদই দিলাম, এমনকি স্বল্পজ্ঞানী ব্যক্তিও বুঝতে পারবেন যে, এ বাক্যটি অসঙ্গতিপূর্ণ। তাই নিশ্চিতরূপে শাস্ত্রে বিষ্ণুযশ শব্দে কল্কির পিতার নামকেই বুঝানো হয়েছে। অতএব, বিষ্ণুযশ ও সুমতি ব্যতীত অন্য নামধারী কোনো ব্যক্তি কল্কির পিতা বা মাতা নন।

বংশ পরিচয়—ব্রহ্মযশার পুত্র বিষ্ণুযশা

আবির: কল্কির বংশ পরিচয় সম্পর্কে শাস্ত্রে কী বলা হয়েছে?

সৌরভ: আমি অনলাইনে কোনো একটি লেখায় পড়েছি যে, কল্কি এক উন্নত ম্লেচ্ছ বংশে জন্মগ্রহণ করবেন।

দেবব্রত: না, বৈদিকশাস্ত্র তা বলছে না। মহাভারতের বনপর্বে (১৬১.৯২,৯৩) কল্কি অবতারের আবির্ভাব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– "কালক্রমে বিষ্ণুযশা নামে এক ব্রাহ্মণের আবির্ভাব হবে। মহাবীর্য ও মহানুভব কল্কি সেই ব্রাহ্মণগৃহে জন্মগ্রহণ করবেন , ম্লেচ্ছগৃহে নয়।" অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থেও এ কথাই বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণ ও ম্লেচ্ছ সম্পূর্ণ ভিন্নার্থক শব্দ, সে বিষয়ে আমি পরে বলছি। যাহোক, লিঙ্গ পুরাণ, বায়ু পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের বর্ণনায় দেখা যায় যে, "যিনি পূর্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে প্রমীতি রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই ভগবান আবারও কল্কিরূপে অবতীর্ণ হবেন। কলিযুগ সমাপ্ত হওয়ার প্রাক্কালে ভৃগুর দেহত্যাগের পর কল্কি (প্রমীতি) মনুর চন্দ্রবংশে আবির্ভূত হবেন।"

কল্কিপুরাণে এমনকি কল্কির ঠাকুরদাদা অর্থাৎ বিষ্ণুযশার পিতার নামও উল্লেখ রয়েছে যে, বিষ্ণুযশা হলেন ব্রহ্মযশার পুত্র – *ব্রহ্মযশঃসুতম্ ..বিষ্ণুযশসং (ক.পু. ৩/১৬/২৭)*।

[একটি সাদা কাগজ ও কলম হাতে নিয়ে] আমি আপনাদের কল্কির বংশপরম্পরা একটি Flow chart-এর মাধ্যমে দেখাচ্ছি–

কল্কির বংশ পরিচয়
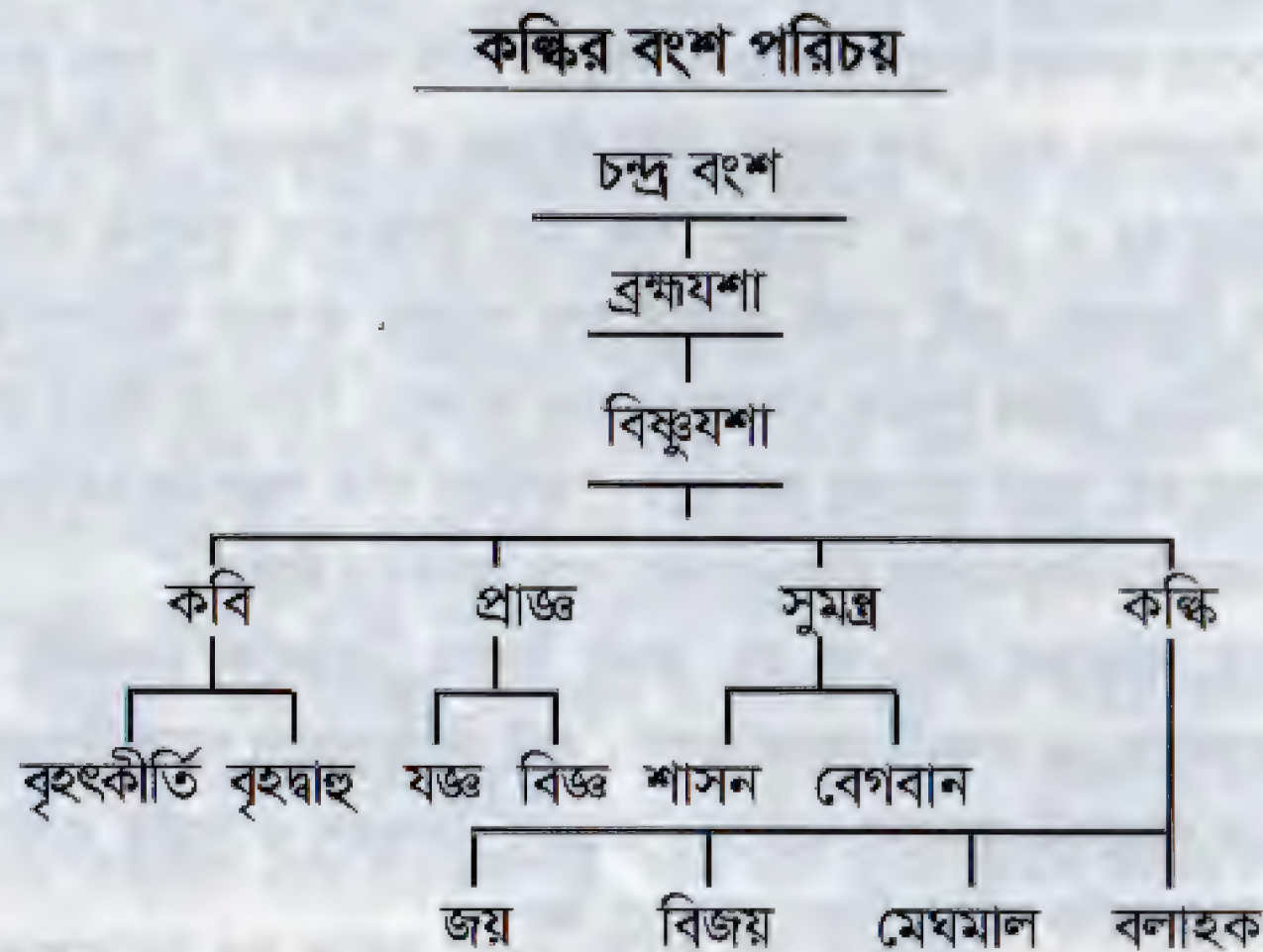
কল্কিপুরাণে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত কল্কির ভ্রাতৃবর্গ, পূর্বপুরুষ ও তাঁর পরবর্তী বংশধরদের নামের তালিকার সঙ্গে তথাকথিত ভূঁইফোর কল্কি অবতারদের বংশধরদের নামের তালিকা মিলিয়ে নিলে, আপনারা খুব সহজেই শতভাগ নিশ্চিত হতে পারবেন যে, ভগবান কল্কিদেব এখনো অবতীর্ণ হননি।

সুতরাং, চন্দ্রবংশ ব্যতীত অন্য কোনো উন্নত বংশে যত বড় মহাত্মাই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তিনি কল্কি অবতার নন। অধিকন্তু, যথাসময়ে মনুর চন্দ্রবংশে ব্রহ্মযশার পৌত্র (নাতি) ও বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে কল্কি আবির্ভূত হবেন। কল্কির পরবর্তী বংশধর তাঁর চার পুত্র– জয়, বিজয়, মেঘমাল ও বলাহক (ক.পু. ২/৬/৩৬ ও ৩/১৭/৪৪)। কল্কিপুরাণে (২/৬/৩৩-৩৬) কল্কির ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ, ভ্রাতুষ্পুত্রদের নামোল্লেখ রয়েছে। কল্কির বিবাহের পর তাঁর ভ্রাতা কবির কামকলা-নাম্নী পত্নীতে বৃহৎকীর্তি ও বৃহদ্বাহু নামে মহাবল পরাক্রান্ত পরম ধার্মিক দুটি পুত্র উৎপন্ন হবে, প্রাজ্ঞের পত্নী সন্নতিও দুটি পুত্র জন্ম দেবে, যাদের নাম হবে যজ্ঞ ও বিজ্ঞ, সুমন্ত্রকের পত্নী মালিনীর গর্ভে শাসন ও বেগবান নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হবে, যারা সাধুগণের উপকারী হবে এবং কল্কি হতে পদ্মার গর্ভে জয় ও বিজয় নামে লোকবিখ্যাত ও মহাবল পরাক্রান্ত দুই পুত্র এবং রমার গর্ভে মেঘমাল ও বলাহক নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করবে।

সৌরভ: আপনি চন্দ্রবংশের কথা বললেন, কিন্তু কিছু লোক যেভাবে শব্দের কদর্থ আর অপব্যাখ্যা করছে, তাতে হয়তো তারা কোনো না কোনোভাবে মিথ্যা প্রমাণ দিয়ে যেকোনো নাম বা শব্দের অর্থকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চন্দ্র বানিয়ে দেবে। [হাসতে হাসতে]

দেবব্রত: শুধু বংশের নামের কদর্থ করলে হবে না, যাদের কল্কি বলা হচ্ছে, উপর্যুক্ত বর্ণনার সাথে, তাদের পুরোপুরি মিল থাকতে হবে। তাই, কেউ যতই মিথ্যাচার করুক, সূর্যকে কখনো মেঘ চিরকাল আবৃত রাখতে পারে না।

আবির্ভাব স্থান– শম্ভল

আবির: স্যার, কল্কির আবির্ভাব স্থানটি কোথায়? এ প্রসঙ্গে শাস্ত্রে কী বলা হয়েছে?

দেবব্রত: শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, ভগবান কল্কি শম্ভল গ্রামে অবতীর্ণ হবেন। আমি আপনাদের শম্ভল সম্বন্ধে বিস্তারিত বলছি–

স্থাপনাসমূহ

এই শম্ভল গ্রাম সম্বন্ধে কল্কিপুরাণে (২.৬.১-৭) বলা হয়েছে– কল্কি যখন তাঁর পত্নী পদ্মার সহিত সিংহলদ্বীপ হতে শম্ভল গ্রামে গমনের অভিলাষী হলেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্রের নির্দেশে বিশ্বকর্মা সুবর্ণ, রত্নস্ফটিক, বৈদুর্যাদি মণি দ্বারা দ্বিতল, ত্রিতলবিশিষ্ট প্রাসাদ, হর্ম্য, অট্টালিকা, গৃহাদি নির্মাণ করেন। কোনো গৃহ হংসমুখ, কোনোটি সিংহমুখ, কোনোটি গরুড়মুখ ইত্যাদি। সূর্যরশ্মিসদৃশ ধবল ও তেজসম্পন্ন সৌধসমূহ চতুর্দিকে শোভা বিস্তার করছে (ক.পু. ২.৬.২০)। নানা প্রকার বনলতা, উদ্যান, সরোবর প্রভৃতি দ্বারা কল্কির শম্ভল গ্রাম ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় শোভা ধারণ করে।

আয়তন

কল্কি পুরাণ (২.৬.২০-২২) অনুযায়ী এই শম্ভল গ্রাম সপ্তযোজন (১ যোজন = ৮ মাইল, অর্থাৎ ৫৬ মাইল) বিস্তীর্ণ – *সপ্তযোজন বিস্তীর্ণং চাতুর্বর্ণ্যজনাকুলম্* এবং এখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র –এ চার বর্ণেরই মানুষ বাস করে। এই নগর এমনভাবে নির্মিত ও সন্নিবেশিত যে, কোনো ঋতুতেই কষ্ট হয় না।

তীর্থস্থান

স্বর্গপুরীর ন্যায় শম্ভলে সভা, আপণশ্রেণি, চত্বর, ধ্বজ, পতাকাদি দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে অতিশয় সুশোভিত এবং সেখানে ৬৮টি তীর্থের অধিষ্ঠান হবে। *যত্রাষ্টষষ্টিতীর্থানাং সম্ভবঃ ভবেৎ (ক.পু. ৩.১৮.৩-৫)*। নানা কুসুমসঙ্কুল বনোপবন শোভিত শম্ভল গ্রাম ভূমণ্ডল মধ্যে মোক্ষপদদায়ক– *বনোপবন সন্তাননানাকুসুমসংকুলৈঃ। শোভিতং শম্ভলং গ্রামং মোক্ষপদং ভুবি ॥ (ক.পু. ৩.১৮.৩-৫)*।

নদী, পর্বত ও কুঞ্জশোভিত

শম্ভল প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি তথ্য কল্কিপুরাণে রয়েছে যে, এ শম্ভল গ্রাম বিভিন্ন নদী, পর্বত ও কুঞ্জশোভিত– *নদীপর্বতকুঞ্জেষু (ক.পু. ৩.১৮.৭)*। সুতরাং,

নদীবিহীন কোনো অঞ্চল শম্ভল হতেই পারে না। তদুপরি, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো যে, সেই নদীসমূহকে সুনির্দিষ্ট করতে কল্কিপুরাণে বিশেষত গঙ্গা ও যমুনা নদীর কথা উল্লেখ রয়েছে (ক.পু ৩/১৬/৮)। এমনকি কল্কিপুরাণে (১.২.১৬) স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, *গঙ্গোদকক্লেদমোক্ষা সাবিত্রী মার্জনোদ্যতা* – কল্কির জন্মের পরপরই সাবিত্রী নাম্নী এক স্ত্রীলোক কর্তৃক গঙ্গাজল দ্বারা কল্কিকে স্নান করানো হয় এবং তা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় সংস্কৃতি। তাই যে অঞ্চলে পবিত্র গঙ্গা ও যমুনা নদীর প্রবাহ নেই, তা শম্ভল গ্রাম হতেই পারে না, যেখানে কল্কি অবতীর্ণ হবেন।

পাখিসমূহ

শম্ভল গ্রামের শোভা বর্ণনা করতে গিয়ে শম্ভলে বিশেষত ময়ূর, কোকিল, হংস ইত্যাদি পাখির অবস্থান উল্লেখ করা হয়েছে (ক.পু.২.৬.৩০,৩১)। ময়ূর ভারতের জাতীয় পাখি। উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, ময়ূর অধিক পাওয়া যায় ভারতীয় উপমহাদেশে; আর কোকিল মরু ও মেরু অঞ্চল ব্যতীত পৃথিবীজুড়ে পাওয়া যায়।

গৌরভ: তাহলে, অন্তত এটা নিশ্চিত যে, কল্কি অবতার পৃথিবীর কোনো মেরু বা মরু অঞ্চলে আবির্ভূত হবেন না।

মাঙ্গলিক দ্রব্যের ব্যবহার

দেবব্রত: সিংহল দ্বীপ হতে শম্ভলে সস্ত্রীক কল্কির আগমন বৃত্তান্ত অবগত হয়ে তাঁকে স্বাগত জানাতে রাজা বিশাখযূপ শম্ভল গ্রামকে যেভাবে সাজিয়েছিলেন, সেই সংস্কৃতি থেকেও প্রতীয়মান হবে যে, শম্ভল পৃথিবীর কোন অঞ্চলে অবস্থিত।

স রাজা কারয়ামাস পুর-গ্রামাদি মণ্ডিতম্।
স্বর্ণকুম্ভৈঃ সদম্ভোভিঃ পূরিতৈশ্চন্দনোক্ষিতৈঃ ॥
কুসুমৈঃ সুকুমারৈশ্চ রম্ভা-পূগফলান্বিতৈঃ।
কালাগুরু-সুগন্ধাঢ্যৈর্দীপলাজাঙ্কুরাক্ষতৈঃ।
শুশুভে শম্ভলগ্রামো বিবুধানাং মনোহরঃ ॥ (ক.পু.২.৬.২৬,২৭)

"রাজা বিশাখযূপ চন্দন মিশ্রিত জলপূর্ণ স্বর্ণকলস দ্বারা নগর-গ্রাম বিভূষিত করলেন। দেবতাদিগেরও মনোহরণকারী শম্ভল গ্রাম অগুরু আদি সুগন্ধ দ্বারা, আলোকমালা ও সুদৃশ্য সুগন্ধী পুষ্পমালা দ্বারা, রম্ভা (কলা), পূগ (সুপারি) প্রভৃতি ফল দ্বারা, লাজ (খৈ), অক্ষত (আতপ চাল), নবপল্লব (আম্রপল্লব) প্রভৃতি দ্বারা অপূর্ব শোভা ধারণ করল।"

এখানে উল্লিখিত সুবর্ণ কলস, চন্দন, অগুরু, সুগন্ধী পুষ্প, কলা, সুপারি, খৈ, আতপ চাল, নবপল্লব ইত্যাদি মাঙ্গলিক দ্রব্যের ব্যবহার নিশ্চিতরূপে সনাতন ধর্মীয় ও ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচায়ক।

সার্বিক পর্যালোচনা

সুতরাং, কল্কিপুরাণোক্ত শম্ভল গ্রামের বৈশিষ্ট্য – গঙ্গা ও যমুনা নদীর প্রবাহ, ময়ূর, কোকিল ইত্যাদি পাখির অবস্থান, সরোবর, ষড়ঋতু সমন্বিত সমৃদ্ধ প্রকৃতি, বন-উপবন, উদ্যান, নানারকম পুষ্পের সমাহার, কল্কির পিতার বৃদ্ধবয়সে উত্তর ভারতের বদরিকাশ্রমে গমন এবং কল্কির মন্দর, মহেন্দ্র ও হিমালয় পর্বতে গমন এবং শম্ভলে কল্কি কর্তৃক রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন, ব্রাহ্মণদের সাত্ত্বিক ভোজন করানো, গো-বধের পরিবর্তে ব্রাহ্মণদের গো দান (ক.পু.১.২.২৩), ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রীমন্ত্র জপ, ললাটে তিলকচিহ্ন ধারণ, বিষ্ণুবিগ্রহ অর্চন, কল্কির বেদ অধ্যয়ন, বর্ণাশ্রম ধর্ম, শম্ভলবাসীদের নাম (মহাষষ্ঠী–কল্কির ধাত্রী, অম্বিকা–নাভিচ্ছেত্রী, সাবিত্রী, যজ্ঞ, সুমন্ত্র, বিষ্ণুযশা, ব্রহ্মযশা প্রভৃতি) ইত্যাদি সনাতন ধর্মীয় ও ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে এটাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শম্ভল ভারতীয় অঞ্চলে অবস্থিত। তবে, শম্ভল গ্রামের সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য এখনো ভূমণ্ডলে প্রকাশিত হয়নি; যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কল্কি এখনো অবতীর্ণ হননি। কল্কিপুরাণে উল্লিখিত শম্ভল গ্রামের স্পষ্ট বর্ণনা জানার পরও কি আপনি সম্পূর্ণ বিপরীত বৈশিষ্ট্যসমন্বিত স্থানকে শম্ভল বলে চিহ্নিত করবেন?

বিশ্বমানচিত্রে শম্ভলের অবস্থান

বিশ্বমানচিত্রে ষড়ঋতু সমন্বিত সমৃদ্ধ প্রকৃতি ও বৈদিক সংস্কৃতিসম্পন্ন ভারতের উত্তর প্রদেশে শম্ভল নামে একটি স্থান দেখা যায়। আবার, ভারতের উড়িষ্যা প্রদেশেও সম্বলপুর নামে একটি স্থান বিশ্বমানচিত্রে দেখা যায়। তবে, সংস্কৃত-বাংলা অভিধানে শম্ভল শব্দে উত্তর ভারতের মোরাদাবাদের অন্তর্গত সেই স্থানেরই উল্লেখ রয়েছে এবং সেখানে একটি প্রাচীন কল্কি-মন্দিরও রয়েছে।

তবে, আমরা নিশ্চিতরূপে বলব না যে, এটাই কল্কির আবির্ভাব স্থান। কেননা, কল্কি অবতীর্ণ হবেন আরো ৪,২৬,৮৮০ বছর পর। আর আমরা জানি যে, ইতিহাসে বহু স্থানের নাম পরিবর্তিত হয়েছে এবং নতুন নতুন নামে স্থান আবিষ্কৃত হয়েছে; এ ধরনের পরিবর্তন এমনকি এখনো হচ্ছে। শুধু তাই নয়, একই নামে একইদেশেও বিভিন্ন স্থান রয়েছে। আমি বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে গবেষণার কাজে ভ্রমণ করতে গিয়ে এমন বহুস্থান দেখেছি। তাই যেখানে গত কয়েক সহস্রাব্দে, শতাব্দীতে বা দশকে বিভিন্ন স্থানের নামের আমুল পরিবর্তন হচ্ছে, সেক্ষেত্রে কয়েক লক্ষ বছর পর শম্ভল কোথায় হবে তা ধারণাতীত। সেজন্য, এ বিষয় নিয়ে জল্পনা না করাই শ্রেয়। সুতরাং, ভবিষ্যতে অন্যকোনো সমৃদ্ধ অঞ্চলও শম্ভল নামে খ্যাত হতে পারে, যেখানে ভগবান কল্কি নামে অবতীর্ণ হবেন।

কল্কির শ্বশুরালয়–সিংহল

আবির: আপনি এরই মধ্যে সিংহল নামে এক দ্বীপের কথা বলছিলেন।

দেবব্রত: হ্যাঁ, সিংহল হলো কল্কিপত্নী পদ্মার পিতৃভূমি অর্থাৎ, কল্কির শ্বশুরালয়। আজকালকার তথাকথিত কল্কিগণের শ্বশুরালয় সিংহলে হওয়া তো দূরের কথা, এমনকি তার অনুসারীদের কেউ কেউ হয়ত সিংহলের নামই শোনেনি; অবশ্য শোনার কথাও নয়, কেননা তাদের সেসকল কল্কিদের কারোরই শ্বশুরালয় সিংহলে নয়।

আবির: অর্থাৎ তারা কেউই কল্কি নয়।

গৌরভ: কেউ কেউ বলে থাকে, পুরাণে নাকি ৬টি দ্বীপের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের মরু অঞ্চল নাকি কল্কিপুরাণোক্ত সিংহল দ্বীপ। অধিকন্তু, তারা সিংহল শব্দের বিকৃত করে একে সালমাল দ্বীপ বলে আখ্যায়িত করে।

দেবব্রত: কিন্তু তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরোধী। প্রকৃতপক্ষে নামটি সালমাল নয়, শাল্মল। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো 'সিংহল' আর 'শাল্মল' দুটো ভিন্ন নাম ও ভিন্ন স্থান। বৈদিক শাস্ত্রে তার স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।

বিভিন্ন পুরাণ শাস্ত্র অনুযায়ী, ভূমণ্ডলে ৭টি দ্বীপ রয়েছে–জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মল, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর দ্বীপ (বিষ্ণুপুরাণ ২.৫)। এই সাতটি দ্বীপ সাতটি সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত। সেগুলো যথাক্রমে–লবণ, ইক্ষুরস, সুরা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ এবং স্বাদুজল সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত। অর্থাৎ শাল্মল দ্বীপ সুরা সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত। কিন্তু ভূমণ্ডলের যতটুকু অংশ পৃথিবীর বর্তমান মানচিত্রে দেখা যায় তা লবণ সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত জম্বুদ্বীপের অংশ। জম্বুদ্বীপ থেকে শাল্মল দ্বীপের দূরত্ব ৪০,০০,০০০ (চল্লিশ লক্ষ মাইল) (ভা. ৫ম স্কন্ধ, ২০ অধ্যায়)। তাই আমাদের চোখে দৃশ্যমান বিশ্বমানচিত্রে শাল্মল দ্বীপের অস্তিত্বই নেই। আর জম্বুদ্বীপের আটটি উপদ্বীপ – স্বর্ণপ্রস্থ, চন্দ্রশুক্ল, আবর্তন, রমণক, মন্দরহরিণ, পাঞ্চজন্য, সিংহল এবং লঙ্কা (ভা.৫.২০.২৯-৩০)। সুতরাং, সিংহল ও শাল্মল দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন স্থান এবং শাস্ত্রে উভয়ের পৃথক বর্ণনাও রয়েছে, যে বর্ণনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, সিংহল কোনোমতেই মরু অঞ্চল নয়।

- **শাল্মল দ্বীপ:** শাল্মল দ্বীপকে শাল্মলী দ্বীপও বলা হয়। এর বিস্তার ৩২,০০,০০০ (বত্রিশ লক্ষ মাইল) এবং তা সমান বিস্তার সমন্বিত সুরাসমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত। শাল্মলী দ্বীপে একটি শাল্মলী বৃক্ষ রয়েছে, যা থেকে সেই দ্বীপের নামকরণ করা হয়েছে। সেই বৃক্ষটি ১০ যোজন (৮০০ মাইল) বিস্তৃত এবং ১১০০ যোজন

(৮৮০০ মাইল) উঁচু। পণ্ডিতগণ বলেন, সেই বিশাল বৃক্ষটিতে পক্ষীরাজ গরুড় বাস করেন। সেখানে তিনি বেদমন্ত্রের দ্বারা ভগবান বিষ্ণুর স্তব করেন। মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র যজ্ঞবাহু শাল্মলী দ্বীপের অধিপতি। তিনি সেই দ্বীপটিকে সাতটি বর্ষে বিভক্ত করে তাঁর সাত পুত্রকে দান করেন। তাঁর সাত পুত্রের নামানুসারে সেই বর্ষগুলোর নাম– সুরোচন, সৌমনস্য, রমণক, দেববর্ষ, পরিভদ্র, অপ্যায়ন এবং অবিজ্ঞাত। সেই বর্ষে স্বরস, শতশৃঙ্গ, বামদেব, কুন্দ, মুকুন্দ, পুষ্পবর্ষ এবং সহস্রশ্রুতি নামক সাতটি পর্বত রয়েছে। সেখানে অনুমতি, সিনীবালী, সরস্বতী, কুহূ, রজনী, নন্দা এবং রাকা নামক সাতটি নদীও রয়েছে। সেই নদীগুলো এখনো বর্তমান। শ্রুতিধর, বীর্যধর, বসুন্ধর এবং উষন্ধর নামে বিখ্যাত এই বর্ষব্যাপী পুরুষেরা কঠোর নিষ্ঠা সহকারে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করে ভগবনের প্রকাশ সোম নামক চন্দ্রদেবকে উপাসনা করেন (ভা. ৫.২০.৭-১১)।

❍ **সিংহল দ্বীপ:** কল্কি পুরাণের বর্ণনানুযায়ী, সিংহল দ্বীপ অতীব চমৎকার স্থান। এখানেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণ চতুষ্টয়ের বাস আছে। এখানে রমণীয় প্রসাদ, হর্ম, গৃহ, নগর শোভা পাচ্ছে। কোথাও রত্নময়, কোথাও স্ফটিকময় কুড্য অপূর্ব শোভা সম্পাদন করছে। প্রত্যেক স্থান রাশি রাশি সুবর্ণ সমূহে বিভূষিত আছে। চতুর্দিকেই উজ্জ্বল বেশা পদ্মিনী কামিনীরা অবস্থান করছে। স্থানে স্থানে সরোবর। সারস ও হংসগণ তীরস্থ জলে ক্রীড়া করছে। পদ্ম, কহ্লার ও কুন্দপুষ্পে ভৃঙ্গগণ ক্রীড়া করছে। চতুর্দিকে পদ্ম, চতুর্দিকে মনোহর লতাসমূহ বন ও উপবনসমূহ শোভা পাচ্ছে। (ক.পু. ১.৪.৩১-৩৪)।

এই সিংহল দ্বীপ সমুদ্রপাড়ে অবস্থিত। নির্মল জল মধ্যস্থিত, অসংখ্য জনগণে সমাবৃত, নানাবিধ আকাশযান যুক্ত, মণিকাঞ্চণসমূহে দেদীপ্যমান রয়েছে। এই দ্বীপ অট্টালিকা ও গৃহসমূহের সম্মুখে পতাকা ও তোরণ থাকাতে অতীব শোভা সম্পাদন করছে। শ্রেণি অনুসারে সংস্থাপিত সভাসমূহ, আপণসমূহ (হাট), সৌধসমূহ, পুরসমূহ (নগরী), গোপুরসমূহ (পুরদ্বার) এই সমুদয় দ্বারা এই নগর সুশোভিত রয়েছে। (ক.পু. ২.১.৪০-৪১)।

কল্কি সিংহল দ্বীপে উপস্থিত হয়ে সম্মুখে কারুমতী নামে পুরী দর্শন করলেন। এই পুরীতে পুরস্ত্রীরূপ পদ্মিনীদের পদ্ম গন্ধে ভ্রমরগণ আমোদিত হচ্ছে। এই পুরীর মধ্যে যে সমস্ত জলাশয় আছে তার জল মরালকুলের (হংসের) সঞ্চালন দ্বারা চঞ্চল। প্রফুল্ল কমলসমূহস্থিত অলিকূল দ্বারা আকুলিকৃত। তার চতুর্দিক হংস, সারস, জলকুক্কুট (গাংচিল) ও দাত্যূহসমূহ (ডাকপাখি) শব্দ করছে। স্বচ্ছসলিলের চঞ্চল তরঙ্গ শীতল বায়ু দ্বারা সমীপস্থ বন উপজীবিত হচ্ছে। ঐসমস্ত বন কদম্ব, কুদ্দাল (আবলুশ– ভারত, শ্রীলংকা, পশ্চিম অফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একজাতীয় বৃক্ষ), শাল, তাল, আম, বকুল, কপিথ, খর্জ্জুর (খেজুর), বীজপুর (লেবু বিশেষ/ কমলালেবু), করঞ্জক

(করমচা), পুন্নাগ (নাগকেশর বৃক্ষ), পনস (কাঁঠাল), নাগরঙ্গ, অর্জুন, শিংশপ, ক্রমুক (ব্রহ্মদারু বা সুপারি), নারিকেল প্রভৃতি নানা বৃক্ষে সুশোভিত। সিংহলে কল্কি ফল, পুষ্প ও পত্রসমূহে বিভূষিত এই বন দর্শন করলেন। সরোবর স্থিত পদ্মসমূহের সৌরভে ভ্রমরগণ গুনগুন করে চতুর্দিকে ভ্রমণ করছে। **কদম্ব** বৃক্ষসমূহের নবপল্লবনিকর দ্বারা সেই স্থানের আতপ নিবারিত হচ্ছে। কল্কি জলাশয়ে স্নান করে সরোবরের সমীপবর্তী জল-আনয়ন-পথে স্বচ্ছ স্ফটিকময় সোপানযুক্ত **প্রবাল অলংকৃত বেদী**র উপর বিচিত্র আসনে উপবেশন করলেন। ততক্ষণে শুকপাখিটি পদ্মার আলয়ে গিয়ে দেখেন, পদ্মা সখী পরিবেষ্টিত হয়ে পদ্মপত্রের শয্যায় শয়ন করে আছেন। তিনি সখীদের প্রদত্ত একটি চন্দনচর্চিত পদ্ম তাঁর হস্ত দ্বারা সঞ্চালন করছিলেন। (ক.পু. ২.১.৪০-৪৬; ২.২.১-৫)।

যাহোক, শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সিংহল দ্বীপের কথা উল্লেখ করেছেন। এ বর্ণনায় যেসমস্ত ফুল, ফল, বৃক্ষ, পাখি, পতঙ্গ এবং স্থানে স্থানে পদ্মশোভিত জলাশয় ও নগরের অপূর্ব বৈশিষ্ট্যের কথা ব্যক্ত হয়েছে, তা থেকে অন্তত এটা স্পষ্ট যে, সিংহল কোনো মরু অঞ্চল নয়। কল্কিপুরাণে (২.৩.১৬-১৮) বর্ণিত আছে যে, প্রিয়তমা পদ্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কল্কি সিংহলে গিয়ে যখন দেখলেন যে, সিংহলদ্বীপ অতি উত্তম স্থান, তিনি কিছুদিন সিংহলে ছিলেন। মরু অঞ্চল যে বসবাসের জন্য উত্তম স্থান নয়, তার ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আপনাদের নিকট ব্যক্ত করার আবশ্যকতা নেই। কল্কিপ্রিয়া পদ্মাকে সকাম দৃষ্টিতে দর্শন করে যেসকল রাজা স্ত্রীদেহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তারা যখন সিংহলে কল্কিকে দর্শন করে তাঁর চরণ স্পর্শ করলেন এবং তাঁর নির্দেশে রেবা নদীতে স্নান করলেন, তৎক্ষণাৎ পুনরায় পুরুষদেহ প্রাপ্ত হলেন। এ রেবা নদী অবশ্যই আপনার পঠিত গ্রন্থে বর্ণিত মধ্যপ্রাচ্যের মেরু অঞ্চলে নয়। অতএব, সিংহল দ্বীপ কোথায়, তা নির্ধারণ করতে হলে, সে স্থান অবশ্যই কল্কিপুরাণোক্ত বর্ণনার সঙ্গে শতভাগ সাদৃশ্যপূর্ণ হতে হবে। অন্যথায় তাকে কখনো সিংহল দ্বীপ বলা যাবে না, যেখানে কল্কিপত্নী পদ্মার আবির্ভাব হবে।

অন্যান্য নাম

এছাড়াও কল্কিপুরাণে উল্লেখিত দেবাদিদেব শিব, ভগবান পরশুরাম, কল্কির অশ্বের নাম ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে নামের কদর্থ করা হচ্ছে। আবার, কিছু কিছু নাম যেমন, কল্কির তিন ভ্রাতা, দুই পত্নী, চার পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, অন্যান্য আত্মীয় ও সহযোগীদের নাম কখনো উল্লেখ করা হয় না– অপব্যাখ্যাকারীরা হয়ত সেগুলোর বিকৃত অর্থ এখনো আবিষ্কার করতে পারেনি। যাহোক, আমি এ সবকিছুরই সঠিক ব্যাখ্যা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব।

অধ্যায়

২

কার্যভিত্তিক বিভ্রান্তি ও সমাধান

শ্বেত অশ্বে আরোহণ ও তরবারি ধারণ

আবিরঃ স্যার, আমি পড়েছি যে, কল্কি অবতার শ্বেত (সাদা) বর্ণের একটি দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করে তরবারি হাতে পৃথিবীর উপর বিচরণ করবেন।

দেবব্রতঃ হ্যাঁ, শ্রীমদ্ভাগবতে সে কথা বলা হয়েছে–*অশ্বমাশুগমারুহ্য দেবদত্তং জগৎপতি। (ভা. ১২.২.১৯)*। এই অশ্ব দেবাদিদেব শিবের প্রদত্ত *(ক.পু. ১.৩.২১-২৭)* বলে এর নাম হবে দেবদত্ত। ইতিহাসে তরবারি-হস্ত বহু অশ্বারোহী আছেন, কিন্তু তারা কল্কি নন। কেননা, তাদের সে অশ্ব তারা দেবাদিদেব শিবের কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়নি। তবু কেউ কেউ এর কদর্থ করে তাদের পছন্দনীয় কোনো খড়গহস্ত অশ্বারোহীকে কল্কি বলে প্রচার করছে। তারা সে অশ্বের নামকে পাল্টে দিয়ে 'দেবদত্ত' শব্দের অপব্যাখ্যা করছে এবং শিবের স্থলে অন্য ব্যক্তির কথা উল্লেখ করছে।

আবিরঃ কিন্তু কেউ বলছে, শ্বেত অশ্ব নাকি ভারতবর্ষে দুর্লভ, সেজন্য কল্কি ভারতের বাইরে কোথাও আবির্ভূত হয়েছেন।

দেবব্রতঃ মহাভারতের যুদ্ধে অর্জুনের শ্বেত অশ্ব থেকে শুরু করে অন্য বহুসংখ্যক শ্বেত অশ্ব নিশ্চয়ই ভারতের বাইরে থেকে আমদানী করা হয়নি। একথা অবশ্যই ভুলে যাওয়া অনুচিত যে, কল্কিকে অশ্বটি প্রদান করেছিলেন মহেশ্বর শিব, যিনি অনন্ত অশ্ব সৃষ্টি করতে সমর্থ। সুতরাং, কেবল শ্বেত অশ্ব গ্রহণের জন্য কল্কিকে ভারতের বাইরে অবতীর্ণ হতে হবে, এ যুক্তি অবান্তর।

সৌরভঃ কেউ কেউ সাদা পোশাকধারী ধর্মপ্রচারকদের অশ্ব এবং তাদের গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রকে তরবারি, আর গুরুকে কল্কি বলে প্রচার করে সরলচেতা মানুষদের বিভ্রান্ত করছে।

দেবব্রতঃ আপনি যাদের উদ্ধৃতি দিয়ে কল্কি, অশ্ব আর তরবারির নানা অর্থ বললেন, তাদের কাছ থেকে কি আপনি কখনো কল্কির শুকপাখির অর্থ শুনেছেন? না। আবার, শিব কল্কিকে যে তরবারিটি প্রদান করবেন, তার হাতল বা মুষ্টি হবে রত্নময়–*রত্নৎসরুং করালঞ্চ করবালং মহাপ্রভম্। (ক.পু. ১.৩.২৭)*। একথা কল্কিপুরাণে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। অথচ, এ তরবারি যে রত্নময় ছিল তা ঐ প্রচারকদের কেউই বলেন না। কারণ, তারা এসব জানেন না অথবা জানাতে চান না; হয়ত সেগুলোর কদর্থ এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। তাই বোদ্ধাগণ তাদের এসব অপপ্রচার দ্বারা প্রভাবিত হন না। কারণ, কল্কি পুরাণে বর্ণিত কল্কির অশ্ব ও তরবারি প্রাপ্তির বিবরণ পড়েই বুদ্ধিমান পাঠকগণ সহজেই বুঝতে পারেন যে, এসব অপব্যাখ্যা। তাছাড়া, কল্কি তাঁর দিব্য তরবারিসহ শ্বেত অশ্বে আরোহন করে কীভাবে যুদ্ধ করবেন, ভূমণ্ডলে বিচরণ করবেন– এসব ঘটনাও কল্কিপুরাণে স্পষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে। তাই সাধারণ লোকদের উচিত এসকল অপব্যাখ্যার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে কল্কিপুরাণে বর্ণিত কল্কি অবতারের জীবনী ভালোভাবে অধ্যয়ন করা অথবা প্রামাণিক উৎস থেকে কল্কি সম্পর্কে শ্রবণ করা। তখন তারা প্রকৃত সত্য অবগত হতে পারবে যে, শ্বেত অশ্বারূঢ় তরবারিহস্ত ভগবান কল্কি এখনো অবতীর্ণ হননি।

শিবের কাছ থেকে অশ্ব, তরবারি ও শুকপাখি প্রাপ্তি

আবিরঃ শিব কল্কিকে কি শুধু অশ্ব আর তরবারিই প্রদান করেছিলেন, নাকি আরো কিছু? ঘটনাটি বিস্তারিত বললে ভালো হয়।

দেবব্রতঃ কল্কিপুরাণে *(১.৩.২১-২৭)* বর্ণিত আছে যে,

ইতি কল্কিস্তবং শ্রুত্বা শিবঃ সর্বাত্মদর্শনঃ।
সাক্ষাৎ প্রাহ হসন্নীশঃ পার্বতীসহিতোঽগ্রতঃ ॥

অর্থাৎ, সর্বজ্ঞশিব কল্কির স্তব শ্রবণ করে পার্বতীর সহিত সম্মুখে আবির্ভূত হন এবং হাস্য করে বলেন–

ত্বং গারুড়মিদং চাশ্বং কামাগং বহুরূপিণম্।
শুকমেনঞ্চ সর্বজ্ঞং ময়া দত্তং গৃহাণ ভোঃ ॥

"এই যে অশ্বটি দেখছ তা গরুড়ের অংশ সম্ভূত এবং তা কামগামী (যা ইচ্ছানুযায়ী সর্বত্র গমনশীল) এবং বহুরূপী (বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে)। এই শুকপাখিটিও সর্বজ্ঞ। আমি এই অশ্ব ও শুকপাখিটি তোমাকে দিচ্ছি, গ্রহণ করো।"

"এই অশ্ব ও শুকের প্রভাবে সকলেই তোমাকে সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, সমুদয় অস্ত্রে বিশারদ, সর্ববেদে পারদর্শী ও সর্ব বিজয়ী বলবে।"

রত্নৎসরুং করালঞ্চ করবালং মহাপ্রভবম্।
গৃহাণ গুরুভারায়াঃ পৃথিব্যা ভারসাধনম্ ॥

"এই করাল করবাল (তরবারি) গ্রহণ করো। এর মুষ্টি রত্নময়। এটা অত্যন্ত প্রভাবশালী। এই তরবারিই গুরুভারা পৃথিবীর ভার সাধনের প্রধান সাধন হবে।"

আবির: আমি যে বইটি পড়েছি, তাতে শিব বলতে আমরা যাকে শিব বলে জানি তার কথা বলা হয়নি। সেখানে শিব শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করে অন্য কাউকে শিব বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

দেবব্রত: এভাবেই মানুষ শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করছে। শিব শব্দের অর্থ মঙ্গলময়; আবার ঈশ্বরও মঙ্গলময়। কিন্তু মঙ্গলময় অনেক বস্তু বা ব্যক্তি এ পৃথিবীতে থাকা সত্ত্বেও সেসবকে আমরা ঈশ্বর বলি না। একেশ্বর বহুরূপে প্রকাশিত হন। তার একটি অংশপ্রকাশ হলেন শিব। অশ্ব প্রাপ্তির পূর্বে কল্কি শিবের স্তব করতে গিয়ে তাঁর রূপের বর্ণনা করেছেন (ক.পু. ১.৩.১৪-১৬)–

"যিনি গৌরীনাথ, বাসুকী (সর্প) যাঁর কণ্ঠভূষণ, যিনি ত্রিনয়ন ও পঞ্চবদন, গঙ্গার স্পর্শে যাঁর মস্তক সর্বদা সিক্ত, যিনি জটাজুট দ্বারা অপূর্ব ভাব ধারণ করেছেন, যাঁর ললাটে চন্দ্রকলা, যিনি শ্মশানচারী এবং যাঁর হস্তে ত্রিশূল শোভমান, সেই ঈশ্বরকে আমি নমস্কার করি।"

তাছাড়া, কল্কিপুরাণে (ক.পু. ১.৩.১২-১৩) সেই অশ্বদাতাকে *শঙ্করম্, বিল্বোদকেশ্বরং, শিবং, মহেশ্বরম্, আশুতোষং* ইত্যাদি শব্দে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যা নিশ্চিতরূপে দেবাদিদেব শিবকেই নির্দেশ করে।

সুতরাং, কল্কির অশ্বদাতা প্রসঙ্গে শাস্ত্রে যেহেতু নির্দিষ্ট করে সর্বজনবিদিত শিবরূপের কথাই বলা হয়েছে, তাই সেই শিব শব্দের নানা অর্থ করে শিব ব্যতীত অন্য কোনো ঐশ্বরিক শক্তিকে শিবরূপে মিথ্যা আখ্যায়িত করা হয়েছে, এমন কারো কাছ থেকে যদি কেউ অশ্ব প্রাপ্ত হন এবং তাকে যদি কল্কি বলা হয়, তবে তা নিশ্চয়ই ছলনা। প্রমাণস্বরূপ, এ ঘটনার ক্ষেত্রে তারা কেবল শিবের স্থলে অন্য ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে এবং শিব যে পার্বতীসহ এসেছিলেন তা তারা এড়িয়ে যায়। তাছাড়া, শিব কল্কিকে শুধু অশ্ব আর তরবারিই দেননি, একটি শুকপাখিও দিয়েছিলেন। কিন্তু এ ঘটনা তাদের কল্পিত কল্কি অবতারের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নয় বলে একেও এড়িয়ে যায়।

তরবারি ও ধনুর্বাণে যুদ্ধ– তখনো সম্ভব

আবির: কিন্তু স্যার, কেউ কেউ বলেন, অশ্ব ও তরবারির যুগ ইতোমধ্যে গত হয়েছে; এখন আধুনিক যুগ, যুদ্ধবিমান, কামান ও পারমাণবিক অস্ত্রের যুগ। তাই, যদি কল্কি অবতারের আবির্ভাবের সময় নির্ধারণ করতে হয়, তবে পূর্বের কোনো যুগে ফিরে যেতে হবে। তাই নয় কি?

দেবব্রত: বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছেন–

"I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones." – Albert Einstein

অর্থাৎ, ***"আমি জানি না কোন অস্ত্রের দ্বারা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হবে, তবে আমি এটা জানি যে, চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধে লাঠি আর পাথর দিয়েই যুদ্ধ হবে।"***

এখানে আইনস্টাইন বর্তমান পৃথিবীতে পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়াবহতা ও এসকল অস্ত্রের ব্যবহার-পরবর্তী বিশ্বের কথা বলেছেন। অর্থাৎ, একটি বিধ্বংসের পর পৃথিবী আবার সেই অবস্থায় ফিরে আসবে।

নিশ্চয়ই আইনস্টাইন আমাদের মতো ক্ষুদে জ্ঞানী নন। তিনি অত্যন্ত দূরদর্শী একজন ব্যক্তিত্ব। আইনস্টাইনের এ উক্তিটি অত্যন্ত দূরদর্শী ও সূক্ষ্ম বিচারসম্পন্ন। বর্তমান বিশ্বে যেভাবে অস্ত্রের বিবর্তন হচ্ছে, তাতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোন অস্ত্র ব্যবহৃত হবে তা বলা দুষ্কর। কেননা, প্রতিনিয়ত নতুন নতুন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্র সৃষ্টি করা হচ্ছে। প্রতিযোগী দেশগুলো তালমিলিয়ে যেসমস্ত অস্ত্র সৃষ্টি ও সংগ্রহ করছে তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়, তবে পৃথিবীতে এক মহাবিধ্বংস ও বিপর্যয় দেখা দেবে, যা মানবসভ্যতার অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। তারপর আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতা বিলুপ্তপ্রায় হবে। বিপুলভাবে হ্রাস পাবে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে বিস্ফোরিত পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়াবহতার কথা বলা যায়। অপরদিকে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্ত্র হবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র অপেক্ষা বহুগুণ শক্তিশালী। সুতরাং, এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সেই মহাবিধ্বংসের বহুকাল পর পৃথিবীতে যান্ত্রিকসভ্যতার বিনাশ হবে। এর ওপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে, আজ

থেকে প্রায় ৪,২৬,৮০০ বছর পর পৃথিবীতে এমন হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। অতএব, আইনস্টাইনের এ উক্তিটি একেবারেই বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিযুক্ত।

তাছাড়া, কল্কিপুরাণে (১.৩.৩৬) বর্ণিত আছে–"ভগবান কল্কি নির্মল-প্রভাশালী খড়গ ও ধনুর্বাণ গ্রহণ করে কবচ ধারণপূর্বক জয়শীল অশ্বে আরূঢ় হয়ে নগর হতে বহির্গত হন।" আবার, শাস্ত্রে এ-ও বলা হয়েছে যে, তিনি কলিযুগের অন্তে অবতীর্ণ হবেন। তাহলে, শাস্ত্র অনুসারে তরবারি ও ধনুর্বাণে যুদ্ধ তখনো সম্ভব।

আরেকটি বিষয় আপনাদের বোঝা উচিত যে, কল্কি যখন অবতীর্ণ হবেন, তাঁকে তরবারি আর তীর-ধনুক ত্যাগ করে বন্দুক নিয়ে যুদ্ধ করতে হবে না। সর্বশক্তিমান কল্কি এমনকি অস্ত্র ছাড়াও আণবিক অস্ত্রধারী অসুরদের নিধন করতে সমর্থ। অধিকন্তু, তরবারি ও তীর-ধনুকস্বরূপ তাঁর দিব্য অস্ত্রের তুলনায় আধুনিক অস্ত্রও অতি তুচ্ছ। ভগবান যে সুদর্শন চক্র ধারণ করেন তা একটি ডিভিডি ডিস্কের মতো। আপাতদৃষ্টিতে একে কোনো অস্ত্র বলেই মনে হয় না। অথচ তা দ্বারা ভগবান এমনকি ব্রহ্মাস্ত্র ও পশুপাত অস্ত্রকেও পরাস্ত করতে পারেন। সুতরাং, অস্ত্রের ভিত্তিতে বিচার করে বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনো বলবেন না যে, কল্কি অবতার আসার যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে।

আবির: কেউ কেউ বলেন, "কল্কির আবির্ভাবকাল সভ্যতা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগে নয়; কল্কি আসবেন অন্ধকার যুগে, যে যুগ ইতোমধ্যে গত হয়েছে। সুতরাং, কল্কিও ইতোমধ্যে গত হয়েছেন।"

দেবব্রত: আপনি যে অন্ধকার যুগের কথা বলছেন, সে অন্ধকার কি পৃথিবী জুড়েই ছিল? ইতিহাসে পৃথিবীর নির্দিষ্ট অঞ্চলে এক অন্ধকার যুগের কথা উল্লেখ আছে। এমনকি এখনো পর্যন্ত পৃথিবীর আমাজান, আন্দামানের মতো কিছুকিছু অঞ্চল অন্ধকারেই আচ্ছন্ন। কিন্তু শাস্ত্রে কল্কির আবির্ভাবকালীন পৃথিবীর যে জঘন্যতম পরিস্থিতির বর্ণনা রয়েছে, যা আমি ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি, সে সমস্ত লক্ষণ এখনো পৃথিবীতে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়নি। বরং, কলিযুগের সে লক্ষণসমূহ ক্রমশ প্রকাশিত হচ্ছে। আর আপনি সেই অন্ধকার যুগের পরবর্তী বর্তমান বা অদূর ভবিষ্যতের যে সভ্যতার কথা বলছেন, তা ভালোভাবে বিচার করে বলছেন তো? বরং আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষ দিন দিন অসভ্য হয়ে উঠছে। খুন, ধর্ষন, বোমাবাজি, লাম্পট্য, অন্যায় রাজনীতি, অবিচার, লুণ্ঠন, জমিদখল, অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক, নারীদের স্বল্পবসন পরিধান, অত্যাচার নিপীড়ন প্রভৃতি অসভ্যতা দিনদিন বেড়েই চলেছে। আর এভাবে ক্রমশ ঘনিয়ে আসছে কল্কি অবতারের আবির্ভাবকাল। তবে আপনি কীভাবে বলতে পারেন যে, শাস্ত্রোক্ত সে যুগ গত হয়েছে?

পরশুরামের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ

আবির: কল্কি অবতার সম্পর্কিত বিভ্রান্তিমূলক সে বইটিতে লেখা ছিল যে, তাদের কথিত কল্কি নাকি কোন এক পর্বতে গিয়ে এক ঈশ্বরদূতের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করেন, যা কল্কিপুরাণে বর্ণিত কল্কির পরশুরামের কাছ থেকে জ্ঞান লাভের ঘটনার সঙ্গে একেবারে সাদৃশ্যপূর্ণ। সেখানে পরশুরাম নামের নানা কাল্পনিক অর্থ করে সেই ঈশ্বরদূতকে পরশুরামরূপে প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

দেবব্রত: একেবারেই সাদৃশ্যপূর্ণ– এই কথাটি একেবারেই অসঙ্গতিপূর্ণ। কল্কিপুরাণে (১/৩/১-৬) স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, কল্কি মহেন্দ্র পর্বতস্থিত ভগবান পরশুরামের নিকট থেকে চৌষট্টিকলাসহ বেদ ও ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা লাভ করবেন। এখানে, পরশুরামের কাছ থেকে কল্কি অবতারের জ্ঞান লাভের সঙ্গে তথাকথিত কল্কির জ্ঞান লাভের অমিলগত কয়েকটি দিক উল্লেখযোগ্য:

❍ **মহেন্দ্র পর্বত:** প্রথমত, কল্কি যাবেন ভারতে অবস্থিত মহেন্দ্র পর্বতে –*মহেন্দ্রাদ্রিস্থিতো (ক.পু. ১/৩/১)*।

❍ **পরশুরামের নিকট অধ্যয়ন:** দ্বিতীয়ত, এখানে পরশুরাম শব্দের অপব্যাখ্যা করে অন্য কাউকে পরশুরামরূপে উপস্থাপন অবশ্যই ভুল ব্যাখ্যা। কারণ, কল্কিপুরাণে (ক.পু. ১/৩/২-৪) সেই পরশুরাম স্বয়ং তাঁর পরিচয় দিচ্ছেন–

"আমি মহাপ্রভাবশালী জামদগ্ন্য। ভৃগুবংশে আমার জন্ম হয়েছে। বেদ বেদাঙ্গের সমুদয় তত্ত্ব আমি জ্ঞাত আছি, বিশেষত ধনুর্বেদ বিষয়ে আমি অদ্বিতীয়। আমি সমুদয় পৃথিবী নিক্ষত্রিয় করে ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দিয়েছিলাম। তারপর আমি তপস্যা করার জন্য মহেন্দ্র পর্বতে আগমন করি। হে ব্রাহ্মণ-কুমার, বেদ বা অন্যান্য শাস্ত্র যা ইচ্ছা হয়, তা তুমি এখানে আমার নিকট অধ্যয়ন কর।"

এখানে স্পষ্ট যে, এই পরশুরাম হলেন ভৃগুবংশজাত জমদগ্নি মুনির পুত্র জামদগ্ন্য পরশুরাম– *ভৃগুবংশসমুৎপন্ন জামদগ্ন্যং মহাপ্রভুম্ (ক.পু. ১/৩/২)*; পূর্বে যিনি তাঁর দিব্য কুঠার দ্বারা একুশবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করেছিলেন।

❍ **চৌষট্টিকলাসহ বেদ ও ধনুর্বিদ্যা লাভ:** চতুর্থত, পরশুরামের কাছ থেকে কল্কি চৌষট্টিকলাসহ বেদ ও বিশেষত ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন *(চতুঃষষ্টিকলাং ধনুর্বেদাদিকঞ্চ... ক.পু. ১/৩/৬)*। এমন নয় যে, তিনি নতুন কোনো

জ্ঞান লাভ করেন এবং অন্যের মাঝে সে জ্ঞান বিতরণ করেন। কিন্তু তথাকথিত কল্কিদের বেলায় তারা কারো নিকট ধনুর্বিদ্যা বা বেদ অধ্যয়ন করেছে বলে শোনা যায় না।

কিন্তু অপব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠিত করার সুবিধার্থে অন্যরা কখনো এ বিষয়গুলো দৃঢ়তার সহিত নির্দিষ্ট করে বলে না। তাই নিঃসন্দেহে কল্কি জামদগ্ন্য পরশুরামের কাছ থেকেই জ্ঞান লাভ করবেন, যা তথাকথিত কল্কিগণের জীবনে ঘটেনি। অর্থাৎ, তারা কল্কি নন।

কল্কির কাননবিহার ও গুহায় প্রবেশ

সৌরভঃ স্যার, কল্কিপুরাণে বর্ণিত ভগবান কল্কির পর্বত-গুহায় প্রবেশ এবং কানন বিহার প্রসঙ্গে আরেকটি সাদৃশ্যের কথা আমি শুনেছি। কিছু লোকের কথিত সেই কল্কি নাকি একসময় এক পর্বতের গুহায় এবং কাননে প্রবেশ করে ঐশী জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

দেবব্রতঃ আমি তা পড়েছি। তবে কল্কিপুরাণে বর্ণিত ভগবান কল্কির পর্বত-গুহায় প্রবেশ এবং কানন বিহারের সঙ্গে তাদের উল্লিখিত ঘটনা সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে কল্কিপুরাণে বলা হয়েছে–

বৈভ্রাজকে চৈত্ররথে সুপুষ্পে, সুনন্দনে মন্দরকন্দনান্তে।
রেমে স রামাভিরুদারতেজা, রথেনভাস্বৎখগমেন কল্কি ॥ (ক.পু-৩/১৮/২০)

❍ কল্কি রমণীগণসহ দেবরাজ ইন্দ্র প্রদত্ত আকাশগামী তেজোদীপ্ত রথে অরোহণ করে দিব্যপুষ্পাদি সজ্জিত বৈভ্রাদ অরণ্যে, কুবেরের উদ্যানে ও পর্বত গুহায় প্রবেশ করবেন।

❍ কল্কি অন্যকোনো পর্বতে নয়, ভারতের বিহার প্রদেশে অবস্থিত মন্দর পর্বতের গুহায় প্রবেশ করবেন।

❍ তিনি সেখানে জ্ঞান লাভ নয়, পত্নীদের সঙ্গে বিহার করবেন।

❍ সেখানে কল্কির পত্নী রমা ও পদ্মা ছাড়াও অন্য সহস্র রমণী উপস্থিত থাকবেন। (*গিরিগহ্বরে তে নারীসহস্রা... –ক.পু.-৩/১৮/১০*)

❍ বনবিহারের পর তিনি ত্বরায় সরোবরে জলকেলি করবেন। (*ততঃ সরোবরং ত্বরা...–ক.পু-৩/১৮/২৩*)

ভগবান কল্কির এ লীলাকে কেন্দ্র করেই কেউ কেউ অপপ্রচার করছে।

আবিরঃ কিন্তু এতগুলো অমিল থাকা সত্ত্বেও কিছু লোকের কথিত সে ব্যক্তি কীভাবে শাস্ত্রোক্ত কল্কি হতে পারে? অবশ্যই তিনি কল্কি নন।

কল্কির ম্লেচ্ছনিধন

আবিরঃ শুনেছি কল্কি ম্লেচ্ছনিধনকারী। এই ম্লেচ্ছ কাদের বলা হয়? যেহেতু কল্কি ম্লেচ্ছনিধনকারী, তাই যদি পৃথিবীতে এখনো ম্লেচ্ছ বিদ্যমান থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে কল্কি এখনো অবতীর্ণ হননি। তাই নয় কি?

দেবব্রতঃ শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, পদ্মপুরাণাদি নানা শাস্ত্রে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, কল্কি হবেন ম্লেচ্ছনিধনকারী। কল্কিপুরাণে (ক.পু.-২/৩/৩০) বলা হয়েছে–

কলিকুলনাশাবতারো বৌদ্ধপাষণ্ডম্লেচ্ছাদীনাঞ্চ
বেদধর্মসেতুপরিপালনায় কৃতাবতারঃ কল্কিরূপে...॥

অর্থাৎ "কলিকুল ধ্বংসের নিমিত্ত, বৌদ্ধ (নাস্তিক), পাষণ্ড ও ম্লেচ্ছদের বিনাশ এবং বৈদিকধর্মরূপ (সনাতন ধর্ম) সেতুরক্ষা করতে ভগবান কল্কিরূপে অবতীর্ণ হবেন।"

কল্কি পৃথিবী থেকে অনার্যদের বিনাশ করে আর্যধর্ম প্রতিষ্ঠা করবেন। এ 'ম্লেচ্ছ' শব্দের অর্থ অবগত হলেই জানা যাবে যে, পৃথিবী থেকে এখনো ম্লেচ্ছ নির্মূল হয়েছে কি না; আর কল্কি এসেছেন কি না।

'সংস্কৃত-বাংলা অভিধান' (শ্রীঅশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত) এবং 'অমরকোষ' (শ্রীমদ্‌গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্যকৃত) অভিধানে 'ম্লেচ্ছ' শব্দের অর্থ– কিরাত, শবর, পুলিন্দ ও যবনাদি অনার্য জাতি এবং পাপিষ্ঠ। 'ম্লেচ্ছদেশ' অর্থ বৈদিক আচারবিহীন দেশ।

দেখুন– 'ম্লেচ্ছ' শব্দের বিশ্লেষণে অমরকোষে আরো বলা হয়েছে–

গোমাংসভক্ষকো যস্তু লোকবাহ্যঞ্চ ভাষতে।
সর্বাচার-বিহীনোহসৌ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে।

একই অভিধানে 'ম্লেচ্ছদেশ' শব্দের অর্থ – '*শিষ্টাচাররহিতো ম্লেচ্ছদেশ*' অর্থাৎ শিষ্টাচারবিহীন দেশই ম্লেচ্ছদেশ। আবার, *শিষ্টাচারস্তু চাতুর্বর্ণব্যবস্থানম্*। শিষ্টাচার বলতে এখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র–এ চারটি বর্ণের যথোচিত আচারকে বোঝানো হয়েছে। এককথায় বর্ণাশ্রমধর্ম বিবর্জিত দেশ ম্লেচ্ছদেশ।

অগ্নিপুরাণে (১৬/৯) উল্লেখ আছে যে, *"স্থাপয়িষ্যতি মর্য্যাদাং চাতুর্বর্ণ্যে যথে াচিতাম্।"* অর্থাৎ কল্কি কর্তৃক ম্লেচ্ছনিধনের পর বর্ণাশ্রমধর্ম পুনরায় সংস্থাপিত হবে।

বাংলা অভিধানে 'ম্লেচ্ছ' শব্দের অর্থ 'অনার্য'। আর 'অনার্য' শব্দের আভিধানিক অর্থ– অভদ্র, নীচ, অসভ্য, দুর্বিনীত, অসাধু ইত্যাদি।

তবে, ব্যাপক অর্থে, ম্লেচ্ছ শব্দের বিশ্লেষণে বিশ্বখ্যাত আচার্য শ্রীল এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর কৃত ভাগবৎ-তাৎপর্যে (৪.২৭.২৪) লিখেছেন, "ম্লেচ্ছ ও যবন সংস্কৃত শব্দ দুটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা বৈদিক নিয়ম পালন করে না। বৈদিক নিয়ম অনুসারে, মানুষের খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে স্নান করে ভগবানের দিব্যনাম জপ-কীর্তন করা, শ্রীবিগ্রহকে মঙ্গল-আরতি নিবেদন করা, বৈদিক শাস্ত্র পাঠ করা, ভগবানের শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার করা এবং ভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণ করা কর্তব্য। মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ সংগ্রহ করাও কর্তব্য এবং যারা গৃহস্থ তাদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্রের বৃত্তি অনুসারে কর্ম করা কর্তব্য। এভাবে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ভিত্তিতে জীবনযাপন করা উচিত এবং সেটিই হচ্ছে বৈদিক সভ্যতা। যারা এসমস্ত বিধি-নিষেধ অনুসরণ করে না, তাদের বলা হয় যবন অথবা ম্লেচ্ছ। ভ্রান্তিবশত কখনো মনে করা উচিত নয় যে, এই শব্দগুলো অন্য দেশের কোনো বিশেষ শ্রেণির মানুষকে সূচিত করে। ভৌগোলিক সীমারেখার ভিত্তিতে কোনোপ্রকার সংকীর্ণতার প্রশ্নই ওঠে না। কেউ ভারতবর্ষে বাস করুক অথবা ভারতের বাইরে বাস করুক, সে যদি বৈদিক বিধি-নিষেধগুলো অনুসরণ না করে, তাহলে তাকে যবন বা ম্লেচ্ছ বলে সম্বোধন করা হবে।"

কল্কিপুরাণে বলা হয়েছে (২.৬.৪২) – ধন-সম্পদ, স্ত্রী পরিগ্রহণ ও ভোজন বিষয়ে যাদের তেমন বাছ-বিচার নেই অর্থাৎ পরের ধন-সম্পদ লুণ্ঠনকারী, পরস্ত্রীগমনকারী ও সর্বভুকদেরই কল্কি বিনাশ করতে উদ্যত হবেন।

সৌরভঃ স্যার, আপনার বর্ণনা অনুসারে, বর্তমান বিশ্বে বৈদিক আচারবিহীন বা বর্ণাশ্রমধর্মরহিত অসংখ্য ম্লেচ্ছ বিদ্যমান, যা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, ম্লেচ্ছনিধনকারী ভগবান কল্কি এখনো অবতীর্ণ হননি।

ব্যক্তিক ও পারিবারিক বিভ্রান্তি ও সমাধান

আবির্ভাব তিথি

আবিরঃ স্যার, আরেকটি বিষয় আমি বলতে চাই। কল্কির আবির্ভাবকাল যে কলিযুগের অন্তে, সে সম্পর্কে যদিও শাস্ত্রে বহু প্রমাণ রয়েছে, তবুও কল্কির আবির্ভাবের মাস, তিথি, দিন ইত্যাদি নিয়েও নানা অপব্যাখ্যার মাধ্যমে বিভিন্ন জনকে কল্কিরূপে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চলছে। তাই, এ বিষয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা আবশ্যক।

দেবব্রতঃ কল্কি পুরাণে (১.২.১৫) স্পষ্ট বলা হয়েছে যে,

দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষস্য মাধবে মাসি মাধবঃ।
জাতে দদৃশতুঃ পুত্রং পিতরৌ হৃষ্টমানসৌ ॥

অর্থাৎ, মাধব মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে ভগবান কল্কি এজগতে আবির্ভূত হবেন।

সৌরভঃ আমি যতদূর জেনেছি, কেউ কেউ এ মাধব মাসকে বৈশাখ মাস এবং বসন্তকালরূপে গণ্য করেন। তারপর এ বসন্তকালে ও চন্দ্রের দ্বাদশ (১২) তারিখে ইতোমধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছে এমন কাউকে কল্কি বলে প্রমাণ করতে চান।

আবিরঃ কিন্তু মাধব মাস মানে কি বৈশাখ মাস?

দেবব্রতঃ বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, মাস গণনা করা হয় দু'ভাবে–

১. সৌর মাস
২. চান্দ্র মাস

১. সৌর মাস গণনায় মাধব মাস:

সৌর মাস গণনায় মাধব মাস বলতে বৈশাখ মাসকে বোঝায়, যার কথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১২.১১.৩৩-৪৪) উল্লেখ রয়েছে। সৌর গণনা অনুসারে বারোটি মাস হলো– মধু (চৈত্র), মাধব (বৈশাখ), শুক্র (জ্যৈষ্ঠ), শুচি (আষাঢ়), নভো (শ্রাবণ), নভস্য (ভাদ্র), ইষ (আশ্বিন), ঊর্জ (কার্তিক), সহো (অগ্রহায়ণ), পুষ্য (পৌষ), তপঃ (মাঘ), তপস্য (ফাল্গুন)।

এগুলো সৌর মাসের নাম। তার মধ্যে বসন্ত ঋতুকে মধু ও মাধব মাস বলা হয় (মার্চ-এপ্রিল-মে-এর মধ্যে) অর্থাৎ বাংলা বসন্ত ঋতু হিসেবে ফাল্গুনের শুরু ও চৈত্রের শেষ (ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল) মাস মাধব মাসের অংশ (সৌর গণনা অনুসারে)।

২. চান্দ্র মাস গণনায় মাধব মাস:

বৈদিক শাস্ত্রের আলোকে জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী ছয়টি ঋতু অনুসারে বছরকে ১২টি মাসে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক মাসের একজন অধিষ্ঠাতা দেবতা আছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে (মধ্য.২০.১৯৮-২০১) তা খুব সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন:

দ্বাদশ-মাসের দেবতা এই বারোজন।
মার্গশীর্ষে (অগ্রহায়ণে)–কেশব, পৌষে–নারায়ণ ॥
***মাঘের দেবতা–মাধব**, গোবিন্দ–ফাল্গুনে।*
*চৈত্রে–বিষ্ণু, **বৈশাখে শ্রীমধুসূদনে** ॥*
জ্যৈষ্ঠে–ত্রিবিক্রম, আষাঢ়ে–বামন দেবেশ।
শ্রাবণে–শ্রীধর, ভাদ্রে–দেব হৃষীকেশ ॥
আশ্বিনে–পদ্মনাভ, কার্তিকে–দামোদর।
রাধা-দামোদর অন্য ব্রজেন্দ্র কোঙর ॥

সুতরাং, শাস্ত্রানুসারে চান্দ্র মাস গণনায় বৈশাখ মাস বলতে মধুসূদন মাসকে বোঝায়, আর মাধব মাস বলতে মাঘ মাসকে বোঝায়, যখন প্রকৃতিতে বসন্ত নয়, শীত ঋতু বিরাজ করে। এমনকি বৈষ্ণবপঞ্জিকা অনুসারে এখনো মাধব মাস হলো মাঘ মাস এবং বৈশাখ মাস হলো মধুসূদন মাস।

চান্দ্র মাস	সৌর মাস
মাধব মাস = মাঘ মাস	মাধব মাস = বৈশাখ মাস
বৈশাখ মাস = মধুসূদন মাস	বৈশাখ মাস = মাধব মাস

যদি আপনি চান্দ্র মাস গণনা করে বলেন যে, বহুকাল পূর্বেই কল্কি মাধব মাসে চন্দ্রের দ্বাদশীতে বা ১২ তারিখে আবির্ভূত হয়েছেন, তবে চান্দ্র মাস অনুসারে তা মাঘ মাসকে বোঝাবে; বৈশাখ নয়। আমি পূর্বেই বলেছি চান্দ্র মাস গণনায় মাধব মাস, মাঘ মাসকে বোঝায়। যদি আপনি মাধব মাসকে বৈশাখ বলেন, তার মানে আপনি সৌর মাস গণনা করছেন।

কিন্তু আপনি ইতোপূর্বে বলেছেন, তথাকথিত কল্কি অবতারের জন্মকাল নির্ধারণ করা হয়েছে চান্দ্র মাস অনুসারে। সেক্ষেত্রে এখানে একটি দ্বৈততা উপস্থিত হচ্ছে, কারণ, চান্দ্র মাস অনুসারে শাস্ত্রে বর্ণিত কল্কি অবতারের সাথে তথাকথিত কল্কির জন্মমাসের মধ্যে কোনো মিল নেই। সুতরাং, আপনার কথিত ব্যক্তি যে-ই হোন না কেন, তিনি যে কল্কি নন, এটা নিশ্চিত।

দ্বাদশী তিথি যেকোনো তারিখে হতে পারে

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে, সৌর ও চান্দ্র উভয় মাস গণনায় চন্দ্রের দ্বাদশী তিথি মাসের যেকোনো তারিখে হতে পারে। তাহলে, সে তারিখ অনির্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আপনি কীভাবে নিশ্চিত হলেন যে, সেই কল্কি যে বৈশাখের দ্বাদশী তিথিতে জন্মেছে, সেদিন ১২ তারিখ ছিল? মনগড়া মাসের নাম বললে চলবে না। কেউ কি সঠিকভাবে প্রমাণ করতে পারবে যে, তথাকথিত কল্কিগণ বৈশাখের ১২ তারিখেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

সৌরভ: তাহলে দ্যাখ আবির, যাদের জন্ম-তারিখের সঠিক হিসাবই নেই, তারা কীভাবে মনগড়া মাসের নামোল্লেখপূর্বক শাস্ত্রোক্ত *'দ্বাদশ্যাং'* শব্দের কদর্থ করে, দ্বাদশী (*দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষস্য*) তিথিকে দ্বাদশ তারিখ বলে, আজকাল কত মানুষকে ভগবান কল্কি বলে প্রমাণের অপপ্রচার চালাচ্ছে।

দেবব্রত: প্রকৃতপক্ষে, অন্তত গত দুই সহস্রাব্দের মধ্যে এমন ক্ষণে কোনো মহাপুরুষের জন্ম হয়েছে বলে পৃথিবীর ইতিহাসে উল্লেখ নেই। সুতরাং, এই সময়ের মধ্যে ভগবান কল্কির আবির্ভাবের প্রশ্নই ওঠে না।

মুখ্য ব্রাহ্মণ-গৃহে জন্ম

আবিরঃ কল্কির বংশবর্ণন প্রসঙ্গে শাস্ত্র থেকে আপনি বললেন যে, কল্কি ম্লেচ্ছগৃহে নয়, ব্রাহ্মণ গৃহে আবির্ভূত হবেন। তবু এ বিষয়ে আমি আরো বিস্তারিত জানতে চাই। তাছাড়া, কেউ কেউ বলেন, কল্কি শম্ভল গ্রামের মুখ্য ব্রাহ্মণের পৌত্ররূপে (নাতি) তার গৃহে অবতীর্ণ হবেন। আমার প্রশ্ন– সেই মুখ্য ব্রাহ্মণ কি কল্কির পিতা, নাকি তাঁর ঠাকুরদাদা?

দেবব্রতঃ শ্রীমদ্ভাগবতে (১২.২.১৮) বলা হয়েছে–

শম্ভলগ্রামমুখ্যস্য ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ।
ভবনে বিষ্ণুযশসঃ কল্কিঃ প্রাদুর্ভবিষ্যতি।

অর্থাৎ, "শম্ভল গ্রামের মুখ্য-ব্রাহ্মণ মহাত্মা বিষ্ণুযশের গৃহে কল্কি আবির্ভূত হবেন।" বিষ্ণুপুরাণে (৪.২৪.২৬) বলা হয়েছে–

ভগবতো বাসুদেবস্যাংশঃ সম্ভলগ্রামপ্রধানব্রাহ্মণবিষ্ণুযশসো গৃহে...

"সেই ভগবান বাসুদেব স্বাংশরূপে শম্ভল গ্রামের **প্রধান ব্রাহ্মণ বিষ্ণুযশা**র গৃহে অবতীর্ণ হবেন।"

এ সমস্ত শ্লোকানুযায়ী, কল্কির কাকা, জ্যাঠা বা ঠাকুরদাদা নন, তাঁর পিতা মহাত্মা বিষ্ণুযশই হবেন শম্ভল গ্রামের মুখ্য ব্রাহ্মণ।

আবিরঃ শম্ভল গ্রামে কল্কির পিতাই যে মুখ্য ব্রাহ্মণ – এ ব্যাপারে আপনি ইতোমধ্যে প্রমাণ দিয়েছেন। তবুও, আপনি যদি ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য বা কার্যাবলি কীরূপ তা বলতেন, তাহলে যারা বিভিন্ন ব্যক্তিদের ব্রাহ্মণ না হওয়া সত্ত্বেও কল্কির পিতা বলে প্রমাণ করতে চায়, তাদের সঙ্গে প্রকৃত ব্রাহ্মণের পার্থক্য নিরূপণ করা যেত। ফলে কল্কির পিতা আর তারা যে এক ব্যক্তি নন তা বুঝতে সহজ হতো।

দেবব্রতঃ বৈদিক শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা রয়েছে। কিন্তু আমি এত বিস্তর আলোচনায় যাব না। কল্কি পুরাণে (ক.পু. ১.২.৩৫-৪৩) কল্কির প্রশ্নের উত্তরে তাঁর পিতা শম্ভল গ্রামের মুখ্য ব্রাহ্মণ বিষ্ণুযশ নিজেই ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন– ব্রাহ্মণ বৈদিক দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত এবং বেদ অধ্যয়ন, দান, তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম, উপবীত বা পৈতা ধারণ (ক.পু. ১.৪.১৬-১৭), ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী মন্ত্র জপ ও বিষ্ণুবিগ্রহ অর্চন ইত্যাদি ব্রাহ্মণের কার্য। এছাড়া ব্রাহ্মণগণ মস্তকে শিখা এবং ললাটে মৃত্তিকা, ভস্ম বা চন্দন দ্বারা তিলক ধারণ করবেন–

মৃদ্ভস্মচন্দনাদ্যৈস্তু ধারয়েৎ তিলকং দ্বিজ– ক.পু. ১.৪.১৮-২০)।

এছাড়া, ব্রাহ্মণ হবে সত্ত্বগুণ সম্পন্ন অর্থাৎ তিনি সাত্ত্বিক ভোজন করবেন। ব্রাহ্মণ কখনো কারো প্রতি হিংসা অর্থাৎ প্রাণীহত্যা করবেন না।

সুতরাং, শিখা, পৈতা, তিলক ধারণ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ-কার্যবিহীন কেউ যে কল্কির পিতা নন, ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য অবগত হওয়ার পর আপনি নিশ্চয়ই তার প্রমাণ পেয়েছেন।

চার ভ্রাতা– কবি, প্রাজ্ঞ, সুমন্ত্র ও কল্কি

আবিরঃ অনেকে বলে থাকে কল্কির সাথে চারজন সহচর থাকে। এই চার সহচর কারা?

দেবব্রতঃ কল্কিপুরাণে (১.২.৫) কল্কি স্বয়ং বলেছেন– *চতুর্ভির্ভ্রাতৃভির্দেব করিষ্যামি কলিক্ষয়ম্।* "চার ভ্রাতা মিলে কলিকে বিনাশ করব।" অন্যত্র (ক.পু. ১.২.৩১) বলা হয়েছে –

কল্কের্জ্যেষ্ঠাস্ত্রয়ঃ শূরাঃ কবি-প্রাজ্ঞ-সুমন্ত্রকাঃ।

অর্থাৎ, "কল্কির পূর্বে তাঁর জ্যেষ্ঠ তিন ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করবেন। তাঁদের নাম কবি, প্রাজ্ঞ ও সুমন্ত্র।" ব্রাহ্মণ বিষ্ণুযশার ঔরশে কল্কির এ তিন ভ্রাতা সুমতিরই গর্ভজাত– *সুমত্যাং স্বাংশকৈর্ভ্রাতৃচতুর্ভিঃ (ক.পু. ৩/২১/৩)।* এছাড়াও "গার্গ্য, ভর্গ্য, বিশাল প্রভৃতি ধর্মতৎপর সাধুগণ পূর্বে তাঁরই গোত্রে জন্মগ্রহণ করবেন এবং তাঁরা সকলেই কল্কির অংশ ও অনুগত। তাঁরা বিশাখযুপ নামক ভূপাল কর্তৃক প্রতিপালিত হবেন।" তিন সহোদর সহ তাঁদের সকলেই মহাযুদ্ধে কল্কির সহচর হবেন (ক.পু.৩.১.২)।

এই চারভ্রাতা প্রসঙ্গে কল্কিপুরাণের ১.২.২৩ নং শ্লোকেও উল্লেখ রয়েছে– "*চতুর্ভির্ভ্রাতৃভির্জ্ঞাতি-গোত্রজৈঃ পরিবারিতঃ*"। অর্থাৎ কল্কি, কবি, প্রাজ্ঞ ও সুমন্ত্র– এ চারভাই ছাড়াও, গোত্রজাত জ্ঞাতিগণও কল্কির সহচর হবেন। কিন্তু, অপব্যাখ্যাকারেরা এই 'ভ্রাতৃ' শব্দের কদর্থ করে একে চার 'সহচর' হিসেবে প্রতিপন্ন করে এবং যদিও কল্কিপুরাণে কল্কির ভাইদের নাম স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, যাদের ক্ষেত্রে প্রতিবার 'ভ্রাতৃ' শব্দই প্রয়োগ করা হয়েছে।

সৌরভঃ তবুও কেউ কেউ কোনো এক অশ্বারোহীর সঙ্গে অন্য নামধারী চারজন সহচরের কথা জনসাধারণের কাছে ব্যক্ত করে কল্কি সম্বন্ধে সমাজে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।

দেবব্রতঃ অথচ 'সহচর' শব্দের স্থলে এখানে '*পরিবারিতঃ*' শব্দের প্রয়োগ ইতোমধ্যে

হয়েছে। *পরিবারিতঃ* অর্থ পরিবেষ্টিত (*পরিবারিতঃ পরিবেষ্টিত–মহাভারত, বনপর্ব*, ১৬১.৯৭)। আপনি যাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত, তারাই আপনার সহচর। একইভাবে, কল্কি তাঁর ভ্রাতৃগণ দ্বারা *পরিবারিতঃ* তথা পরিবেষ্টিত হয়ে কলিসংহার করবেন। তাই এখানে *'চতুর্ভির্ভ্রাতৃ'* শব্দ দ্বারা 'চার সহচর' নয়, 'চার ভ্রাতা'-ই বোঝানো হয়েছে। এখন আপনি নিজেই বিচার করে দেখুন, তথাকথিত কল্কিগণের তিন ভ্রাতা আছে কি না?

কল্কির দুই পত্নী– পদ্মা ও রমা

আবির: স্যার, কল্কির কতজন পত্নী থাকবেন এ ব্যাপারে কী শাস্ত্রে কোনো বর্ণনা আছে?

দেবব্রত: আজকালকার তথাকথিত কল্কি অবতারদের কারো এক পত্নী, কারো দুই পত্নী, আবার কারো তারও অধিক পত্নী রয়েছে শোনা যায়। বৈদিক শাস্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী ভগবান কল্কি দ্বিপত্নী গ্রহণ করবেন। অবশ্য একথা জানার পর ইতোমধ্যে আবির্ভূত দ্বিপত্নীধারী তথাকথিত কল্কিগণের অনুসারীদের আনন্দিত হবার কিছু নেই, কেননা শাস্ত্রে কল্কিদেবের পত্নীদ্বয়ের কী নাম রয়েছে তা জানার পর তাদের কপালে হাত পড়বে। কল্কিপুরাণে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে কল্কির দুই পত্নীর নাম– পদ্মা ও রমা (ক.পু.৩.১৬.৫)। এমনকি তাদের পিতামাতা, ভ্রাতা ও পুত্রদের নামও উল্লেখ রয়েছে। পদ্মার পিতার নাম বৃহদ্রথ ও মাতা কৌমুদী (ক.পু.১.২.৬, ১.৫.১-২, ২.৬.৯) এবং রমার পিতা শশীধ্বজ ও মাতা সুশান্তা (ক.পু.৩.১০.২৫)। রমার আবার দুই ভ্রাতা–সূর্যকেতু ও বৃহৎকেতু (ক.পু ৩.৮.১৯-২০)। পদ্মা ও রমা উভয়ে দুটি করে চারটি সন্তানের জন্ম দেন– জয়, বিজয়, মেঘমাল ও বলাহক। রমা তাঁর সন্তান লাভের পূর্বে চার মাস রুক্মিণীব্রত পালন করেন। এমনকি কল্কিপুরাণে পদ্মার আটজন সখীর নাম উল্লেখ রয়েছে– বিমলা, মালিনী, লোলা, কমলা, কামকন্দলা, বিলাসীনী, চারুমতি ও কুমুদা (ক.পু.২.২.১১)। আরো বলা হয়েছে যে, কল্কিপত্নী পদ্মা পদ্মমালা বিভূষিতা এবং কখনো কখনো তিনি অট্টালিকার উপরে পদ্মপত্রের শয্যায় শয়ন করবেন। পদ্মা অপৌগণ্ডে, বাল্য ও কৈশোরে শিবপূজা করে পার্বতীসহ শিবের দর্শন ও বর লাভ করবেন যে, কেবল তার পতি নারায়ণ বা কল্কি ব্যতীত যেকোনো পুরুষ তার প্রতি কামনাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালে, সে তৎক্ষণাৎ স্ত্রীদেহ প্রাপ্ত হবে। আবার, কল্কির অন্তর্ধানের পর তাঁর দুই পত্নী রমা ও পদ্মা অগ্নিতে প্রবেশ করে তাঁকে লাভ করবেন। এসব প্রামাণিক তথ্য জানার পর যাকে-তাকে কল্কি বলে মনে করা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

কল্কির দিব্য অঙ্গকান্তি—নীল মেঘের ন্যায়

আবির: ভগবান কল্কির অঙ্গকান্তি কেমন হবে?

দেবব্রত: শ্রীমদ্ভাগবতে (১২.২.২০) বর্ণিত আছে, জগৎপতিরূপে ভগবান কল্কির দিব্য অঙ্গ অপ্রতিম প্রভাময়। সেই জ্যোতির্ময় অঙ্গকান্তি সম্বন্ধে কল্কিপুরাণে বলা হয়েছে– *নীলজীমূতসঙ্কাশং (৩.১৯.৪)* – "তাঁর অভয় অঙ্গকান্তি নীল মেঘের ন্যায়।" *শ্যাম মেঘৌঘরাজদ্দ্বিজাধীশশরীরর (৩.১৯.১১)* – "তাঁর দেহকান্তি ঘনমেঘ স্বরূপ"। *কল্কিঞ্চ দৃষ্ট্বা নবনীরদাভং (৩.১৮.১৩)*– "ভগবান কল্কি নবীননীরদ সদৃশ কান্তিযুক্ত।" *তমালনীলং কমলাপতিং প্রভুং (২.২.২১)*– সেই প্রভু কমলাপতি (কল্কি) তমালসদৃশ নীলবর্ণ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর তথা কলিযুগ শুরু হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত অতুলনীয় দ্যুতি ও নীল মেঘের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট কোনো দিব্য পুরুষ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হননি। আবার, অতুলনীয় প্রভাবিশিষ্ট দিব্য দেহের অধিকারী কেবল পরম স্রষ্টা পরমেশ্বর ভগবানই। কিন্তু অনেকে এমন ব্যক্তিদের কল্কিরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছেন, যারা কি না ভগবানের আজ্ঞাবহ সেবক মাত্র, যাদের পক্ষে অতুলনীয় প্রভা বিস্তার অসম্ভব। কেননা, অতুলনীয় একজনই– পরমেশ্বর ভগবান। তাই অঙ্গকান্তি এবং অঙ্গদ্যুতি বিচারে নিশ্চিত যে, কল্কি অবতার এখনো অবতীর্ণ হননি।
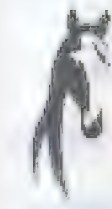
কল্কির অঙ্গরাগ নির্গত সুগন্ধযুক্ত বায়ু

আবির: আমি শুনেছি ,কল্কির অঙ্গ থেকে সুগন্ধ নির্গত হবে। কথাটি কি সত্য?

দেবব্রত: হ্যা, আপনি ঠিকই শুনেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১২/২২/২১) বলা হয়েছে–

অথ তেষাং ভবিষ্যন্তি মনাংসি বিশদানি বৈঃ।
বাসুদেব অঙ্গরাগ অতিপুণ্যগন্ধানিলস্পৃশাম্।
পৌরজানপদানাং বৈ হতেষ্বখিলদস্যু ॥"

"দস্যু রাজাগণ নিহত হলে পুরবাসী এবং জনপদবাসীরা ভগবান বাসুদেবের (কল্কির) অঙ্গরাগ তথা চন্দন লেপনের অতি পবিত্র সুগন্ধ বহনকারী বায়ুর গন্ধ অনুভব করবেন এবং এর ফলে তাদের মন দিব্যভাবে পবিত্র হয়ে উঠবে।"

অপপ্রচারকারীদের কেউ কেউ এ শ্লোকের কোনো ব্যাখ্যাই করে না, আর কেউ অপব্যাখ্যা করে। তারা বলে, "অমুকের দেহ সুগন্ধময় ছিল, কেউ তাঁর সংস্পর্শে এলে, তার দেহও সারাদিন সুগন্ধযুক্ত থাকত। সুতরাং, অমুকই কল্কি।" তাদের এ উক্তি দ্বারা কল্কির জীবনের সাধারণ বর্তমান কালের অর্থাৎ প্রতিদিনকার ঘটনা বোঝানো হচ্ছে। কিন্তু, ভাগবতে উক্ত শ্লোকে '*ভবিষ্যন্তি*' ও '*হতেষ্বখিলদস্যু*' শব্দ দুটি নিশ্চিত করে যে, এখানে কল্কির লীলাবিলাসকালের প্রতিদিনকার ঘটনা নয়, বরং কল্কি দ্বারা সমস্ত দস্যুরাজাগণ নিহত হবার পরের একটি বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা কোনো কল্পিত কল্কির জীবনে ঘটেনি। যদিও পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় শরীর সর্বদা সুগন্ধময়, কিন্তু এ শ্লোকে তাঁর শরীর বা অঙ্গ নয়, বিশেষভাবে তাঁর অঙ্গরাগ তথা চন্দন লেপনের অতি পবিত্র সুগন্ধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে–"*বাসুদেব অঙ্গরাগ অতিপুণ্যগন্ধানিল...*।" এবং পুরবাসী ও জনসাধারণ এ অতি পবিত্র সুগন্ধ অনুভব করবেন দস্যু রাজাগণ নিহত হওয়ার পর এবং তখন তারাও পবিত্র হবেন। যদি প্রতিদিনই তারা এ ধরনের দিব্য গন্ধ অনুভব করে পবিত্র হতো, তবে, দস্যুদের নিহত হওয়ার পর তারা পবিত্র হবে– একথা উল্লেখের কোনো আবশ্যকতা নেই। বাস্তবে, এ ধরনের ঘটনা এ কলিযুগে অদ্যাবধি দৃষ্ট হয়নি। অতএব, কল্কি এখনো আবির্ভূত হননি।

অঙ্গসৌষ্ঠব ও আভূষণ

আবির: তাঁর অঙ্গসৌষ্ঠব ও আভূষণ কেমন?

দেবব্রত: ভগবান কল্কির দিব্য কলেবরের অদ্ভুত সৌন্দর্য বর্ণনা করে কল্কিপুরাণে (৩.১৯.৪-১১) বলা হয়েছে–

নীলজীমূতসঙ্কাশং দীর্ঘপীবরবাহুকম্।
কিরীটেনার্কবর্ণেন স্থিরবিদ্যুন্নিভেন তম্ ॥
শোভমানং দ্যুমণিনা কুণ্ডলেনাতিশোভিনা।
সহর্ষালাপবিকসদ্বদনং স্মিতশোভিনম্ ॥
কৃপাকটাক্ষ-বিক্ষেপ-পরিক্ষিপ্ত-বিপক্ষম্।
তারহারোল্লসদ্বক্ষশ্চন্দ্রকান্তমণিশ্রিয়া ॥
কুমুদ্বতীমোহদবহং স্ফুরৎশক্রায়ুধাম্বরম্।
সর্বদানন্দসন্দেহ-রসোল্লাসিত বিগ্রহম্ ॥

নানামণিগণোদ্যোতদীপিতং রূপমদ্ভুতম্।
দদৃশুর্দেবগন্ধর্বা যে চান্যে সমুপাগতাঃ ॥

তাঁর অভয় কান্তি নীল মেঘের ন্যায়। তাঁর বাহুদ্বয় সুদীর্ঘ (অর্থাৎ আজানুলম্বিত) ও সমুন্নত। শিরোদেশে স্থিরবিদ্যুৎতুল্য সূর্যসম দীপ্ত কিরীট বিরাজিত। তাঁর মুখমণ্ডল সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান কুণ্ডল দ্বারা শোভিত। সেই বদনকমল আনন্দালাপে বিকশিত ও মৃদু মৃদু হাসিতে শোভিত। তাঁর করুণ কটাক্ষপাতে বিপক্ষকুল অনুগ্রহ লাভ করে। তাঁর বক্ষস্থলের মনোরম চন্দ্রকান্তমণিযুক্ত হার দ্বারা শতদলের আনন্দ বর্ধন করে। তাঁর বস্ত্র ইন্দ্রধনুর ন্যায় সৌন্দর্য বিস্তার করে। তাঁর দেহ সর্বদা নানাবিধ মণির জ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত। তাঁর বক্ষস্থলে বিরাজিত কৌস্তুভমণির শোভা যেন শ্যামলকান্তি মেঘের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র। দেবগণ, গন্ধর্বগণ ও জনগণ কল্কিকে এইরূপে দর্শন করেন।

কল্কিপুরাণের অন্যত্র (২.২.২১)– কল্কি সম্পর্কে বলা হয়েছে–

তমালনীলং কমলাপতিং প্রভুং
পীতাম্বরং চারুসরোজলোচনম্।
আজানুবাহুং পৃথুপীনবক্ষসং
শ্রীবৎসসৎকৌস্তুভ কান্তিরাজিতম্ ॥

তাঁর তেজপুঞ্জ অদিত্যতেজকেও পরাভূত করে। তাঁর সর্বাঙ্গ মহামণিসমূহে বিভূষিত। সেই প্রভু কমলাপতি (কল্কি) তমালসদৃশ নীলবর্ণ, পীতবসন (হলুদবস্ত্র), রমণীয় পদ্মপলাশলোচন, আজানুলম্বিত বাহু, প্রসারিত ও উন্নত বক্ষবিশিষ্ট, শ্রীবৎসচিহ্নে চিহ্নিত ও কৌস্তুভমণির কান্তিদ্বারা শোভিত।

সর্বোপরি, কল্কিপুরাণের (১.২.১৯) বর্ণনানুযায়ী কল্কি প্রথমে দেবতাদেরও দুর্লভ চতুর্ভুজ রূপে অবতীর্ণ হন–

চতুর্ভুজমিদং রূপং দেবানামপি দুর্লভম্ ॥

এবং ব্রহ্মার নির্দেশে পবনদেবের প্রার্থনায় তিনি মনুষ্যের ন্যায় দ্বিভুজ রূপ ধারণ করেন–*দ্বিভুজোঽভবৎ (২.২.২১)*।

উক্ত শ্লোকসমূহে কল্কির যে বর্ণনা রয়েছে, তাতে কয়েকটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, নীল মেঘের ন্যায় কান্তি, চতুর্ভুজরূপে আবির্ভাব, আজানুলম্বিত বাহু, পীতবসন, সূর্যসম দীপ্ত কিরীট, সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান কর্ণকুণ্ডল, চন্দ্রকান্তমণিযুক্ত হার ও কৌস্তুভমণি এবং শ্রীবৎস চিহ্ন। এসমস্ত বৈশিষ্ট্য না থাকা সত্ত্বেও আপনারা কীভাবে কাউকে কল্কি অবতার বলতে পারেন?

কল্কির জীবনকাল সহস্রবর্ষ

আবির: কল্কি অবতার কত বর্ষব্যাপী এ পৃথিবীতে প্রকট থাকবেন?

দেবব্রত: বত্রিশ বছর বয়সে তিনি তার অভিযান আরম্ভ করবেন এবং বিশ বছর সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করবেন। কল্কিপুরাণে (৩.১৮.২) স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, "কল্কি ভ্রাতা, পুত্র, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও আত্মীয়বর্গসহ সহস্রবর্ষ শম্ভলে অবস্থান করবেন।" তারপর যথাসময়ে তিনি এজগৎ থেকে অন্তর্হিত হবেন।

শম্ভলে বসতস্তস্য সহস্রপরিবৎসরাঃ।
ব্যতীতা ভ্রাতৃ-পুত্র-স্বজ্ঞাতিসম্বন্ধিভিঃ সহ ॥

কিন্তু, ইতোমধ্যে আবির্ভূত তথাকথিত কল্কিগণের জীবনকাল ১০০০ বছর কি না, তা কি কেউ কখনো বিবেচনা করেছেন? অবশ্য করার কথাও নয়, কেননা এই কল্কিদের অনুসারীরা কোনোদিন কল্কিপুরাণ পড়া তো দূরে থাক, হয়ত চোখেই দেখেননি। আর যদি কেউ কল্কিপুরাণ পড়েও থাকেন, তবু এ বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছেন। কেননা, প্রতারণা করতে হলে তো কিছু লুকাতেই হয়। তাই, যদিও আধুনিক কল্কিগণের প্রায় সকলেই ১০০ বছরেরও কম সময় জীবিত ছিলেন, তথাপি, এসমস্ত কল্কির অনুসারীরা তাদের কল্কি বলে প্রচার করে থাকেন।

সৌরভ: স্যার, কল্কির সহস্র বর্ষ আয়ুষ্কাল অসঙ্গতিপূর্ণ নয় কি?

দেবব্রত: কেন অসঙ্গতিপূর্ণ? আপনি কার সঙ্গে কার সঙ্গতি চান? আপনাকে বুঝতে হবে যে, কল্কি সাধারণ মানুষ নন। তিনি ভগবানের অবতার। তাই তাঁকে সাধারণ মানুষের বিচারে দেখাটা অসঙ্গতিপূর্ণ নয় কি? তিনি শুধু সহস্র বর্ষ নয়, সহস্র যুগ ধরেও পৃথিবীতে অবস্থান করতে পারেন। তাছাড়া, আপনি হয়তো জেনে থাকবেন পূর্ব পূর্ব যুগে মানুষ অত্যন্ত দীর্ঘায়ু ছিল। সত্যযুগে জীবের গড় আয়ুষ্কাল হলো এক লক্ষ বছর, ত্রেতাযুগে ১০,০০০ বছর, দ্বাপরে ১০০০ বছর এবং কলিযুগে ১০০ বছর। কিন্তু কল্কি যদিও কলিযুগে অবতীর্ণ হবেন, তবে তা কলি যুগের অন্তে। অধিকন্তু কল্কি পুনরায় সত্য যুগের সূচনা করবেন এবং এরপরও বহুকাল তিনি মর্ত্যলোকে প্রকট থাকবেন। সুতরাং, সত্যযুগের প্রভাবে সে যুগের মানুষের আয়ুষ্কাল অনুসারে কল্কির এক সহস্র বর্ষ আয়য়ুষ্কাল মোটেও অসঙ্গতিপূর্ণ নয়।

তাই কল্কি অবতার নিয়ে যারা বিভ্রান্তিতে আছেন, সেসব কল্কির অনুসারীদের শুধু একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করাই যথেষ্ট – আপনাদের কল্কি কত বছর জীবিত ছিলেন? তৎক্ষণাৎ প্রমাণ পাবেন যে, ভগবান কল্কি এখনো অবতীর্ণ হননি।

পিতৃ-মাতৃ বিয়োগ

আবির: স্যার, কল্কির পিতৃ-মাতৃবিয়োগ কি বাল্যকালেই হয়েছিল?

দেবব্রত: কল্কি পুরাণ অনুসারে, কল্কির আবির্ভাবের বহু বছর পরও কল্কির পিতা জীবিত থাকবেন এবং কল্কি তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান গ্রহণ করবেন (ক.পু. ১.২.৩৪-৪৭)। এমনকি কল্কির বিবাহ এবং মহাযুদ্ধের পর রাজসিংহাসনে কল্কির অধিষ্ঠানের পরও পিতার নির্দেশে তিনি নানান যজ্ঞানুষ্ঠান ও গঙ্গাতীরে অবস্থান করবেন। এদিকে বিষ্ণুযশা ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সভায় ঋষি তুম্বুরুসহ নারদ মুনি উপস্থিত হন। প্রফুল্ল মনে বিষ্ণুযশা তাদের অর্চনা করেন এবং কীসে মুক্তিলাভ হয়, সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। এরপর নারদ মুনির নির্দেশে তিনি সংসার ত্যাগ করে বদরিকাশ্রমে কঠোর তপস্যা দ্বারা আত্মাকে পরমব্রহ্মে সংযোগ করলেন এবং পূর্ণতা লাভ করে ভৌতিক দেহ ত্যাগ করলেন। কল্কির মাতা সাধ্বী সতী সুমতি মৃত-পত্নীকে আলিঙ্গনপূর্বক অগ্নিতে প্রবেশ করলেন। স্বর্গে দেবগণ তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন। কল্কি মুনিগণ মুখে পিতামাতার স্বধামপ্রাপ্তি শ্রবণ করে স্নেহবশে অশ্রুসজল নয়নে তাদের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পাদন করেন। (ক.পু. ৩.১৬.২-৪৫)। অথচ, আজকাল এমন ব্যক্তিকে কল্কি বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে, যাদের পিতৃমাতৃবিয়োগ কল্কির সাথে সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। তাদের জীবনী দেখলেই তা বুঝতে পারবেন। তবে সেসকল ব্যক্তি কীভাবে কল্কি অবতার হতে পারে?

অধ্যায়
৪

অন্যান্য বিশেষ বিভ্রান্তি ও সমাধান

কল্কি কি মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ করবেন?

আবির: স্যার, কল্কি অবতার কী সনাতন ধর্মে প্রবর্তিত মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ করবেন? এমন কোনো কথা শাস্ত্রে আছে কি?

দেবব্রত: ভগবান এ জগতে অবতীর্ণ হন, দুষ্কৃতকারী অসাধুদের বিনাশ, সাধুদিগের পরিত্রাণ ও ধর্ম সংস্থাপনের জন্য। কিন্তু, আজকাল কল্কিপুরাণের দু'একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে কেউ কেউ বলে থাকেন যে, ভগবান কল্কি নাকি ধর্ম সংস্থাপনের পরিবর্তে সনাতন ধর্মের এক বিশেষ অঙ্গ বা ধর্মস্বরূপ মূর্তিপূজাকেই নিষিদ্ধ করবেন এবং অসাধুর পরিবর্তে তিলকধারী সাধুদের তিনি বিনাশ করবেন। তারপর তারা বলেন, "অমুক মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে ছিলেন, সুতরাং তিনিই কল্কি অবতার।" চলুন দেখা যাক, এ সম্পর্কে কল্কিপুরাণে (৩.১৬.৩-৪) প্রকৃতপক্ষে কী বলা হয়েছে?

নানাদেবাদিলিঙ্গেষু ভূষণৈর্ভূষিতেষু চ।
ইন্দ্রজালিকবদ্‌বৃত্তিকল্পকাঃ পূজকাঃ জনাঃ ॥ ৩ ॥
ন সন্তি মায়ামোহাঢ্যাঃ পাষণ্ডাঃ সাধুবঞ্চকাঃ।
তিলকাঙ্কিতসর্বাঙ্গাঃ কল্কৌ রাজনি কুত্রাচিৎ ॥ ৪ ॥

"কল্কি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁর প্রতাপে (পুনরায় সত্যযুগ প্রতিষ্ঠা হলে) পূর্বযুগে অর্থাৎ কলিযুগে নানাবিধ অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত দেবমূর্তিগণকে ইন্দ্রজালিকের ন্যায় ব্যবহার করে যেসকল পূজক জনসাধারণকে মোহিত করতেন, তারা দূর হবে এবং সাধু না হয়েও সর্বাঙ্গে তিলকচিহ্ন ধারণ করে মায়ামোহ অলঙ্কৃত হয়ে যে পাষণ্ডরা সাধুদের বঞ্চনা করতেন, তাদের আর দেখা যাবে না।"

এই দুটি শ্লোকের তাৎপর্য না বুঝে কেউ কেউ ভ্রান্তিবশত মনে করেন যে, কল্কি অবতার তিলকধারী প্রকৃত বৈষ্ণব ও মূর্তিপূজা বা বিগ্রহ আরাধনা বিলুপ্ত করবেন। তাদের মতানুযায়ী, যদি কল্কি এসেই থাকেন, তবে এখনো কীভাবে মূর্তিপূজা, প্রকৃত বৈষ্ণব ও ভণ্ড দেবপূজক বর্তমান? তাই প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি তা নয়।

❍ প্রথমত, কল্কি ভগবান বিষ্ণুর স্বাংশ প্রকাশ এবং তিনি ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব পরিবারেই আবির্ভূত হবেন; তাই তিনি নিজেই তিলকধারণ করবেন। কেননা, তিলকধারণ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের এক বিশেষ আচার। *মৃত্তস্মচন্দনাদ্যৈস্তু ধারয়েৎ তিলকং দ্বিজ– ক.পু. ১.৪.১৮-২০*। সুতরাং, কল্কি তিলকধারী প্রকৃত সাধুদের নয়, বরং যারা তিলকধারণ করে সাধু সেজে অসাধুর ন্যায় আচরণ করে প্রকৃত সাধুদের বঞ্চনা করবে, তাদের নাশ করবেন। এই শ্লোকে ব্যবহৃত *'ন সন্তি'*, *'মায়ামোহাঢ্যাঃ'*, *'পাষণ্ডাঃ'*, *'সাধুবঞ্চকাঃ'* শব্দগুলোই তার প্রমাণ।

কল্কিপুরাণের অন্যত্রও (১.১.২৯) বলা হয়েছে যে, *ধর্মধ্বজিনঃ সাধুবঞ্চকা–* কলিকালে মানুষ ধর্মচিহ্ন ধারণপূর্বক সাধুদের বঞ্চনা করবে। এর সমর্থনে শ্রীমদ্ভাগবতেও বলা হয়েছে, কলিকালে তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা হবেন শিশ্নোদর পরায়ণ (ভা.১২.৩.৩২)। যারা ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানে না, তারা উচ্চাসনে বসে ধর্মকথা আলোচনা করার স্পর্ধা করবে এবং সংস্কৃতিবিহীন ব্যক্তিরা **বেশ ধারণ করে** তপস্যার অভিনয় করে জীবিকানির্বাহ করবে–*তপোবেষোপজীবিনঃ (ভা.১২.৩.৩৮)*। সুতরাং, কল্কি তিলকধারী প্রকৃত সাধুদের নয়, সাধুবঞ্চকদের নাশ করবেন।

❍ দ্বিতীয়ত, যার পূজা করা হয়, তাকে বলা হয় পূজ্য; আর যিনি পূজা করেন, তিনি হলেন পূজক (*পূজকাঃ জনাঃ*)। সুতরাং, উক্ত শ্লোকে *'ইন্দ্রজালিকবদ্‌বৃত্তি'* এবং 'পূজকা জনাঃ' শব্দগুলো প্রতিপন্ন করে যে, ভগবান কল্কি প্রতিমাপূজা দূরীভূত করবেন না; বরং যারা মূর্তিপূজা তথা বিগ্রহ আরাধনার নাম করে, আরাধনার পরিবর্তে প্রতিমাকে ইন্দ্রজালরূপে ব্যবহার করে জনসাধারণকে মোহিত করবে, পূজকের বেশধারী সেসব প্রতারকদের কল্কি বিনাশ করবেন।

এ কারণেই আগের শ্লোকে (ক.পু. ৩.১৬.২) বলা হয়েছে–

বেদা ধর্মঃ কৃতযুগং দেবা লোকাশ্চরাচরাঃ।
হৃষ্টাঃ পুষ্টাঃ সুসন্তুষ্টাঃ কল্কৌ রাজনি চাভবন্ ॥ ২ ॥

অর্থাৎ, "তিনি (কল্কি) রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে বেদ, ধর্ম, সত্যযুগ, দেবগণ, স্থাবর-জঙ্গমাদি বিশ্বের জীবসকল হৃষ্টপুষ্ট ও প্রীত হন।" কল্কি যদি যথাবিধি দেবপ্রতিমার পূজা বিলুপ্তই করবেন, তবে এখানে দেবগণের প্রীত হওয়ার প্রসঙ্গ আসতো না।

❍ বৈদিকশাস্ত্রে বিগ্রহপূজা

তাছাড়া, বৈদিকশাস্ত্রে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং শ্রীবিগ্রহ পূজা-পরিচর্যার মাধ্যমে তাঁর আরাধনার নির্দেশ দিয়েছেন। ঋগ্‌বেদ সংহিতায় (৭/১০০/১) বলা হয়েছে– "যিনি বহুলোকের কীর্তনীয় শ্রীবিষ্ণুকে হব্য দান করেন, যিনি যুগপৎ স্তোত্র উচ্চারণের দ্বারা তাঁর পূজা করেন এবং মনুষ্যগণের হিতকর বিষ্ণুর পরিচর্যা করেন, তিনি মর্ত্যধন ইচ্ছা করে শীঘ্র প্রাপ্ত হন।" যদি বিগ্রহ নির্মাণ শাস্ত্রানুমোদিত না হতো, তবে এই শ্লোকে 'পরিচর্যা' ও কল্কিপুরাণের উপর্যুক্ত শ্লোকে 'অর্চন'–এ প্রসঙ্গই আসতো না। বিগ্রহ সেবা প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ২৭ অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন– "ভক্তের উচিত সর্বশ্রেষ্ঠ উপাচার অর্পণের মাধ্যমে আমার অর্চনা করা।" তিনি আরো বলেছেন যে, "ব্রাহ্মণের উচিত নিষ্কপটে প্রেম ও ভক্তিযুক্তভাবে উপযুক্ত উপকরণের মাধ্যমে উপাসকের হৃদয়ে উদিত আমার শ্রীবিগ্রহকে ইষ্টদেবরূপে আরাধনা করা।" ভগবানের এরূপ বিগ্রহ ৮ প্রকার উপাদান দ্বারা তৈরি হতে পারে।

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥ –ভা.১১/২৭/১২

অর্থাৎ "শিলা (পাথর), দারু (কাঠ), ধাতু, ভূমি (মাটি), আলেখ্য (চিত্র), বালুকা, মন এবং মণি এই অষ্টপ্রকারে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রকাশিত হন।" এ অধ্যায়ের ২৪ নং শ্লোকে ভগবান বললেন, "উপযুক্ত মন্ত্রোচ্চারণ এবং শ্রীবিগ্রহের অঙ্গন্যাসের মাধ্যমে পরমাত্মাকে বিগ্রহের মধ্যে আহ্বান করে ভক্তের উচিত আমার আরাধনা করা।"

পদ্মপুরাণে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, *অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধী...বিষ্ণৌ সর্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ ॥* অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মন্দিরে অবস্থিত ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে কাঠ-পাথর মনে করে, সে নারকী অর্থাৎ সে নরকে বাস করছে।

অর্থাৎ, বৈদিকশাস্ত্রে ভগবান নিজেই বিগ্রহ আরাধনার অনুমোদন দিয়েছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১১ স্কন্ধে শ্রীবিগ্রহ অর্চন প্রসঙ্গে তার বিশদ বর্ণনা রয়েছে। অধিকন্তু, ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, কল্কি ব্রাহ্মণপুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন। আর কল্কিপুরাণে (১.২.৪১-৪৩) বলা হয়েছে, *ব্রাহ্মণাঃ কেন বা বিষ্ণুর্মর্চয়ন্তি বিধানতঃ.... বিষ্ণর্চনমিদং জ্ঞাত্বা সদানন্দময়ো দ্বিজঃ ॥* সুতরাং, যথাবিধি অনুসারে বিষ্ণুমূর্তি অর্চন ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম। তাই ব্রাহ্মণপুত্ররূপে কল্কি মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ করবেন –একথা সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক। বরং, কল্কিপুরাণ (২.৬.৪১) অনুসারে, ***'দেবার্চনাহীনম্'*** – দেবার্চনা তথা মূর্তিপূজা (বিগ্রহ আরাধনা) যারা করে না, তাদেরই কল্কি বিনাশ করবেন। (*মূর্তিপূজা প্রসঙ্গে বিস্তারিত আমাদের প্রকাশিত 'মূর্তিপূজার রহস্য' শীর্ষক গ্রন্থে দেখুন*)

কল্কি কি মাংসভোজী?

আবির: আমি বইটিতে পড়েছি, কল্কি অবতার নাকি মাংসভোজী। এ সম্বন্ধে সেখানে একটি শ্লোকও উদ্ধৃত করা হয়েছে। কথাটি কি আদৌ সত্য?

দেবব্রত: না। কল্কি অবতার কখনোই মাংস ভোজন করবেন না। কল্কিপুরাণের যে শ্লোকটিকে কেন্দ্র করে কল্কিকে মাংসভোজী বলে অপব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেই শ্লোকটি আমি আপনাকে বলছি।

কল্কিপুরাণে (৩.১৬.৯-১০) উল্লেখ আছে– কলি-সংহারের পর পিতার নির্দেশে কল্কি বিভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন এবং সে অনুষ্ঠানে তিনি চর্ব, চুষ্য, লেহ্য, পেয় ইত্যাদি নানা প্রকার দ্রব্য যথাবিধি ব্রাহ্মণদের ভোজন করান।

চর্ব্যৈশ্চোষ্যৈশ্চ পেয়েশ্চ পুপশষ্কুলিযাবকৈ ॥ ৯ ॥
সদ্যো মাংসৈর্মূলৈ রম্যৈশ্চ বিবিধৈর্দ্বিজান্।
ভোজয়ামাস বিধিবৎ সর্বকর্মসমৃদ্ধিভি ॥ ১০ ॥

এই শ্লোকে উক্ত 'মাংস' শব্দের উপযুক্ত অর্থ না জানার ফলে কেউ কেউ মনে করছেন কল্কি অবতার মাংসভোজী। অথচ, কল্কিপুরাণে প্রাণিহত্যা, বিশেষত গোহত্যাকে জঘন্য পাপকর্ম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (*পাপ... গোব্রহ্মঘাতিনাম্– ক.পু. ১.৭.৫*)। তবে কি কল্কি মাংস ভোজনার্থে প্রাণিহত্যার ন্যায় জঘন্য পাপকার্যে লিপ্ত হবেন, যিনি কি না পাপ হরণার্থে এজগতে অবতীর্ণ হবেন? নিশ্চয়ই না। তবু এ বিষয়ে আপনাদের সুস্পষ্ট ধারণা দিতে এবং 'কল্কি মাংসভোজী' – এ ভ্রান্তি দূরীকরণে কিছু কথা বলতে হয়।

❍ এই শ্লোকে মাংস শব্দের অর্থ

সংস্কৃত অভিধান অনুযায়ী 'মাংস' শব্দের একটি প্রতিশব্দ হলো 'পল' এবং আরেকটি প্রতিশব্দ 'পলল'। 'পল' অর্থ 'শস্যশূন্য-তৃণ' এবং 'পলল' অর্থ 'তিলচূর্ণ'। (অমরকোষ–শ্রীমদ্‌গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য; সংস্কৃত বাংলা অভিধান– শ্রীঅশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

একই শব্দের বহু অর্থ থাকাটা খুব স্বাভাবিক। তখন সেক্ষেত্রে প্রসঙ্গের পূর্বাপর বিচার করতে হবে। শুধু মাংসের ক্ষেত্রেই নয়। আপনি 'গো' শব্দের কথাই ধরুন;

'গো' অর্থঃ বৃষ, চন্দ্র, পশু, স্বর্গ, ঘাণ, বজ্র, কিরণ, জল, কেশ, ইন্দ্রিয়, দৃষ্টি, গবী, বাক্য, দিক, ভূমি, মাতা, গায়ত্রী। (সংস্কৃত বাংলা অভিধান, অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত)।

এখন, যদি বলা হয় গোস্বামী শব্দের অর্থ কী? তবে নিশ্চয়ই সেখানে গরুর স্বামীকে না বুঝিয়ে ইন্দ্রিয়ের অধিপতি বা নিয়ন্তা বোঝাবে, যিনি তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ। ঠিক একইভাবে, শব্দের প্রয়োগের ওপর ভিত্তি করে সেই শব্দের অর্থ করতে হবে। এ বিষয়টি আমি আপনাকে আরো বিস্তৃত করে বলছি–

যেমন, সন্দেশ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সংবাদ বা খবর। আবার, এর আরেকটি অর্থ মিঠাই বা খাবার বিশেষ। আপনি দৈনিক প্রথম আলো'র অফিসে গিয়ে বললেন, নাটোরের কোনো সন্দেশ আছে? আবার, মিষ্টির দোকানে গিয়েও একই কথা বললেন– নাটোরের কোনো সন্দেশ আছে? এ উভয় ক্ষেত্রে সন্দেশ শব্দের অর্থ নিশ্চয়ই এক হবে না। শব্দার্থবিদ্যায় এরকম বহু অর্থের প্রয়োগ দেখা যায়। সংস্কৃতে এমন শব্দের অভাব নেই। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। যেমনঃ

সিংহো মৃগেন্দ্রঃ পঞ্চাস্যো হর্যক্ষ্যঃ কেশরী হরিঃ। (অমরকোষ, সিংহাদিবর্গ)

শ্রবণা মাধবো বিষ্ণুরচ্যুতঃ কেশবো হরিঃ। (নক্ষত্রাভিধান)

(ভ্রান্তি বিজয়, ব্রাহ্মণকাণ্ড, অধ্যায় ১৪, পৃষ্ঠা ২০৮)

এখানে প্রথম বাক্যে '*হরিঃ*' শব্দে 'সিংহ' ও পরের বাক্যে '*হরিঃ*' অর্থে 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে' বোঝানো হয়েছে। এরকম অসংখ্য শ্লোক সংস্কৃতে পাওয়া যাবে। তাই বলে কেউ সিংহের স্থলে ভগবান ও ভগবানের স্থলে সিংহের প্রয়োগ করলে নিশ্চয়ই তাকে মূর্খ ছাড়া অন্য কিছু বলা হবে না।

সাধারণ 'চরণ' শব্দের কতগুলো অর্থ দেখুন– ১. পা ২. কবিতার পঙক্তি ৩. ভ্রমণ ৪. আচরণ। আবার, ইংরেজির ক্ষেত্রেও এরকম শব্দ পাওয়া যায়। যেমনঃ 'Kind' শব্দটির একটি অর্থ 'দয়ালু', আরেকটি অর্থ 'প্রকার'। এরকম সব ভাষাতেই এ ধরনের বহু শব্দ রয়েছে। সংস্কৃতের তো কথাই নেই। সেক্ষেত্রে প্রয়োগের ওপর ভিত্তি করে আমাদের দেখতে হবে যে, কোন অর্থে সেটি ব্যবহৃত হয়েছে। ঠিক একইভাবে উক্ত শ্লোকে মাংস শব্দের অর্থ প্রাণিবিশেষের মাংস বোঝায়নি, শষ্যশূন্য তৃণ বা তিলচূর্ণ বোঝানো হয়েছে।

❍ ব্রাহ্মণের মাংসাহার শাস্ত্রনিষিদ্ধ

আবিরঃ স্যার, কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়। এ শ্লোকের ক্ষেত্রে আমরা কেন মাংস অর্থে শস্যশূন্য তৃণ বা তিলচূর্ণ গ্রহণ করবো?

দেবব্রতঃ আমি পূর্বে বলেছি যে, কল্কি হবেন ব্রাহ্মণপুত্র। আর ব্রাহ্মণের অন্যতম গুণ হলো তিনি সত্ত্বগুণসম্পন্ন, তাই তিনি সর্বদা সাত্ত্বিক ভোজন করেন এবং দয়া তার আরেকটি মহৎ গুণ। কিন্তু মাছ-মাংস রজো ও তমগুণসম্পন্ন, তাই তা ব্রাহ্মণদের নয়, ম্লেচ্ছদের খাবার। তাই সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণরূপে কল্কি কখনোই মাংসভোজন করবেন না। এজন্য এ শ্লোকে মাংস অর্থে প্রাণীর মাংস বোঝায়নি।

আবিরঃ স্যার, ব্রাহ্মণ যে আমিষাহার অর্থাৎ মাছ-মাংস ভোজন করেন না, এ ব্যাপারে আপনি কি কোনো শাস্ত্র প্রমাণ দিতে পারেন?

দেবব্রতঃ নিশ্চয়ই। ভগবদ্গীতায় (১৭/৯,১০) স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, এ ধরনের দুর্গন্ধযুক্ত, অমেধ্য (অপবিত্র) ও রোগপ্রদ খাবার রাজসিক ও তামসিক লোকদের প্রিয়। তাই একজন শুদ্ধ সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ যে রজো ও তমগুণসম্পন্ন মাছ-মাংস ভোজন করবেন না, তার আর প্রমাণের কী আবশ্যকতা? আপনি কি সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ কল্কিকে নিম্নশ্রেণির রজো-তমোগুণসম্পন্ন বলতে চান?

আবিরঃ আমি আরো সুস্পষ্ট প্রমাণ চাই।

দেবব্রতঃ স্কন্দপুরাণের বিষ্ণুখণ্ডে (৫/২৭) একথা স্পষ্ট উল্লেখ আছে–

যথাশক্তি দ্বিজা ভোজ্যাঃ প্রত্যহং বাথ পর্চণি।

হবিষ্য ভোজনং কুর্যাদামিষং পরিবর্জয়েৎ ॥

অর্থাৎ, "দ্বিজগণ তথা ব্রাহ্মণগণ নিত্য হবিষ্যান্ন ভোজন করবেন। কখনো আমিষ ভোজন কর্তব্য নয়।"

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে (২৭/২৭)

শ্বেত বর্ণঞ্চ তালঞ্চ মসূরং মৎস্যমেব চ।

সর্বেষাং ব্রাহ্মণাঞ্চ ত্যাজঞ্চ সর্বদেশতঃ ॥

"সকল দেশে সমস্ত ব্রাহ্মণেরই শ্বেত তাল, মসুর ডাল ও মৎস্য পরিত্যাজ্য।"

এছাড়া, মহাভারতের শান্তিপর্ব ২৬৬ অধ্যায়ে এক তপস্যাসিদ্ধ ব্রাহ্মণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি যজ্ঞে পশুহিংসা কর্তব্য জ্ঞান করেছিলেন, যার ফলে তার সমস্ত তপস্যা নষ্ট হয়ে যায় এবং তিনি পুনরায় যজ্ঞ ও তপস্যা করে সেই পাপ হতে অব্যাহতি পান। এ থেকে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দেন যে– *তস্মাৎ হিংসা ন যজ্ঞিয়া*–"অতএব,

যজ্ঞে প্রাণিহিংসা কর্তব্য নয়।" (শ্লোক-১৮)। তবে ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণরূপে কল্কি কীভাবে তা করতে পারেন?

আবির: কিন্তু স্যার, কেউ কেউ আমাদের শাস্ত্র থেকেই বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করতে চান যে, মাছ-মাংস ভোজন আমাদের বেদ-শাস্ত্র অনুমোদিত।

দেবব্রত: কিন্তু এ অনুমোদনের প্রকৃত অর্থ তারা অবগত নয়। আর অবগত হলেও সার্থান্বেষীরা শাস্ত্র থেকে শুধু তাদের ভ্রান্ত মতের অনুকূল অংশগুলো উদ্ধৃত করে মূর্খদের বিভ্রান্ত করে।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, "বলি দিয়ে মাংস খাওয়া ধর্মানুমোদিত মনে করে যদি কেউ মাংসাশী হয়, তবে সে স্বধর্ম ত্যাগ করে বিধর্মকেই স্বধর্ম মনে করে।" (ভা. ১১/৫/১৩)। "ধর্মজ্ঞানহীন সাধুত্ব-অভিমানী দুর্জন ব্যক্তি নিঃশঙ্কচিত্তে পশুহিংসা করলে পরলোকে সেই পশুরাই ঘাতকদের অনুরূপভাবে ভক্ষণ করে থাকে।"(ভা. ১১/৫/১৪)। "আর যেসব দাম্ভিক ব্যক্তি ইহলোকে ধন এবং প্রতিষ্ঠার গর্বে গর্বিত হয়ে, দম্ভ প্রকাশ করবার জন্য যজ্ঞে পশুবলি দেয়, পরলোকে তারা 'বৈশস' নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। যমদূতগণ তাদের অশেষ যাতনা দিয়ে বধ করে।" (ভা. ৫/২৬/২৫)।

মহাভারতের অনুশাসনপর্বের ১০০তম অধ্যায়ে (২১-২৩) ভীষ্মদেব বলেন– "বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনো মাংস ভক্ষণ করেন না। যে ব্যক্তি মোহপ্রভাবে পুত্রমাংসসদৃশ অন্য জীবের মাংস ভক্ষণ করে, সে অতি জঘন্য প্রকৃতির এবং তার সে জীবহিংসা কর্মই বহুবিধ পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করার একমাত্র কারণ।" তবে কি তথাকথিত মাংসভোজী কল্কিগণের অনুসারীরা কল্কিদেবকে অবিচক্ষণ ও পাপী বলে আখ্যায়িত করতে চান? এ অধ্যায়ে (৭৬, ৭৮, ৮৪) আরো বলা হয়েছে, "যে মাংসাশী দেবপূজা বা যজ্ঞাদিতে পশুবিনাশ করে, তাকে নিশ্চয়ই নিরয়গামী (নরকগামী) হতে হয়। যারা হত্যা করার নিমিত্ত পশু আহরণ, পশুবিনাশে অনুমতি প্রদান, স্বয়ং বিনাশ, রন্ধন ও ভোজন করে, তারা সকলেই ঘাতকের তুল্য পাপে লিপ্ত হয়। (মনুসংহিতায়ও একথা বলা হয়েছে।) অতএব, নিরুপদ্রবে থাকতে ইচ্ছুক মানুষ জগতে সমস্ত প্রাণীর মাংসই বর্জন করবে।"

"যে অন্যের মাংস দ্বারা নিজের মাংস বর্ধিত করতে ইচ্ছা করে, তার চেয়ে ক্ষুদ্রাশয়, নিষ্ঠুর আর নেই। শুক্র হতে মাংস উৎপন্ন হয়; অতএব, তা ভক্ষণে গুরুতর দোষ হয় এবং তা বর্জনে পুণ্য হয়ে থাকে– একথাই মুনিগণ বলেন।" (মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, ১০১/১১,১৩)।

তাই আপনাকে বুঝতে হবে যে, বেদে উদ্ধৃত সব আচরণ বিধি সবার জন্য প্রযোজ্য নয়। সত্ত, রজো ও তমো – এ ত্রিগুণ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির ব্যক্তির জন্য

আচরণ বিধিও ভিন্ন ভিন্ন। বেদে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় মার্গের কথা বলা হয়েছে। তাই শাস্ত্রোক্ত মাংসাহারের আপাত অনুমোদন কেবল তাদেরই জন্য, যারা জড় ইন্দ্রিয় সুখভোগ থেকে সরাসরি নিবৃত্তির পন্থা গ্রহণে অসমর্থ এবং তা সেসব প্রবৃত্তি মার্গীয় লোকদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনা ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে।

মানুষ যেন নীতিবিরুদ্ধ হয়ে যখন তখন নিরীহ পশুদের হত্যা করে মহাপাপের ভাগী না হয় এবং সেই সাথে ধীরে ধীরে তাদের পারমার্থিক উন্নতি হয় এবং সর্বোপরি মাংসাহার নিয়ন্ত্রণের জন্যই শাস্ত্রে কোথাও কোথাও এই বিধান। এ প্রসঙ্গে আমি একটি দৃষ্টান্ত প্রায়ই দিয়ে থাকি। যেমন, কেউ যদি সিগারেটের প্রতি অত্যধিক আসক্ত থাকে, তবে ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে ডাক্তার হয়ত প্রমাবস্থায় তাকে সম্পূর্ণভাবে ধূমপান ত্যাগ করতে বললে তার পক্ষে তা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই কারো যদি দৈনিক দুই প্যাকেট সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস থাকে, তবে ডাক্তার তাঁকে প্রমাবস্থায় হয়ত এক প্যাকেট, তারপর পাঁচটি, তারপর তিনটি বা দুটি সিগারেটের অনুমোদন দিতে পারে, যাতে ধীরে ধীরে তিনি সিগারেট খাওয়ার বদভ্যাস ত্যাগ করতে পারেন। একইভাবে, শাস্ত্রে প্রাণিহিংসা বা মাংসাহারের আপাত অনুমোদন কেবল ইন্দ্রিয়ভোগে একেবারে নিরত হতে অসমর্থ প্রবৃত্তি মার্গীয়দের জন্য। এ প্রসঙ্গে মহাভারতে অনুশাসন পর্বের ১০০, ১০১তম অধ্যায়ে চমৎকার ব্যাখ্যা রয়েছে। যেহেতু আমাদের অলোচ্য বিষয় ব্রাহ্মণকল্কি মাংসভোজী কি না, তাই আমরা আহার-বিতর্ক নিয়ে বিশদ আলোচনায় যাচ্ছি না। সেখানে (শ্লোক-৮০) বলা হয়েছে, শাস্ত্রের এ অনুমোদন মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষীদের জন্য নয়– *ন তু মোক্ষকাঙ্ক্ষিণাম্*। তাই মনুসংহিতায় (৫/৪৯, ৫৬) বলা হয়েছে–

সমুৎপত্তিঞ্চ মাংসস্য বধবন্ধৌ চ দেহিনাম্।
প্রসমীক্ষ্য নিবর্তেত সর্বমাংসস্য ভক্ষণাৎ ॥৪৯॥
ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিং তু মহাফলা ॥৫৬॥

"মাংসের উৎপত্তির কথা বিবেচনা করে (অর্থাৎ, অশুচি জঠরের মধ্যে মাংসের বৃদ্ধি এবং শুক্র-রক্তরূপ অশুচি বস্তু থেকে তার উৎপত্তি, অতএব এরকম যে উৎপত্তি তা নিন্দিত–একথা চিন্তা করে) এবং মাংস লাভ করতে গেলে কীভাবে প্রাণিগণকে বধ ও বন্ধন করতে হয়–সেসব পর্যালোচনা করে সাধু ব্যক্তিরা বিহিত মাংসের ভোজন থেকেও নিবৃত্ত হন, অবৈধ মাংসের তো কথাই নেই। তাই যদিও মাংসাহার, মদ্যপান এবং মৈথুনাচার বদ্ধজীবের স্বাভাবিক প্রবণতা বলেই বিবেচিত হয়ে থাকে এবং এধরনের কার্যকলাপ শাস্ত্রবিধি অনুসারে অনুষ্ঠিত হলে তা এতটা দোষাবহ নয়, তবুও এগুলো থেকে নিবৃত্ত হওয়াই মহাফলজনক।"

শুধু এ দু'একটি শ্লোকেই নয়, শাস্ত্রের বিশেষত মনুসংহিতা এবং মহাভারতে আমি দেখেছি, যেখানে মাংসাহারের আপাত অনুমোদন রয়েছে, তার ঠিক পরপরই বলা হয়েছে যে, তা না করাই উত্তম। কিন্তু অপব্যাখ্যাকারা সে শ্লোকগুলো কখানোই উদ্ধৃত করে না।

মহাভারতে শান্তিপর্বের ২৫৯তম অধ্যায়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মদেবের বিচখ্যুনৃপ সংবাদে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, "অহিংসাই সমস্ত ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যেসকল মানুষ যজ্ঞে পশু হত্যা করে বৃথা মাংস ভোজন করে, তাদের সে কর্ম নিন্দনীয়। ধূর্তরাই মদ, মাংস, মাছ ইত্যাদি খাওয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু বেদে প্রকৃত অর্থে এসব ভক্ষণের বিধি নেই। বস্তুত, কাম, লোভ, মোহবশতই লোকদের এসব অমেধ্য দ্রব্যে প্রবৃত্তি হয়ে থাকে।"

অতএব, শাস্ত্রসমূহ রজো-তমোগুণাচ্ছন্ন লোকদের মাংসাহার নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাণিহত্যা আপাত অনুমোদন দিচ্ছে মনে হলেও, ধূমপানে অত্যাধিক আসক্ত রোগীকে পরিমিত সিগারেট খাওয়ার অনুমোদনের মতো এক্ষেত্রেও পরোক্ষভাবে সকলের জন্য তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/১১/৩১) বলা হয়েছে–সকল জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করো এবং সকলকে অভয় প্রদান করে আত্ম-উপলব্ধি করো।

মহাভারতে শান্তিপর্বের ২৫৯ নং অধ্যায়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মদেবের বিচখ্যুনৃপ সংবাদে স্পষ্ট বলা হয়েছে –

বিষ্ণুমেবাভিজানন্তি সর্বযজ্ঞেষু ব্রাহ্মণাঃ।

পায়সৈঃ সুমনোভিশ্চ তস্যাপি যজনং স্মৃতম্ ॥ (শ্লোক ১২)

"বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সমস্ত যজ্ঞেই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আবির্ভাব হয় জেনে যজ্ঞের উপযোগী বৃক্ষ, পুষ্প ও সুস্বাদু পায়স দ্বারা তাঁর আরাধনা করে থাকেন। বেদোক্ত যজ্ঞের যোগ্য যেসকল বৃক্ষ এবং বিচক্ষণেরা যা সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করেন, আর বিশেষ এবং অধ্যবসায়ী ও বিশুদ্ধ লোকের যা কর্তব্য, সেসমস্ত দ্রব্যই দেবতাদের দান করবে।"

এখানেও প্রমাণিত যে বিষ্ণুর অবতার হিসেবে ব্রাহ্মণ কল্কি কখনো মাংস ভোজন করবেন না।

যুধিষ্ঠির বললেন, "হে পিতামহ, নিতান্ত হিংসাশূন্য হয়ে মানুষ কীভাবে জীবনযাপন করবে?" ভীষ্মদেব বললেন, "বৎস, মানুষ যাতে শরীর বিনষ্ট না হয় এবং অহিংসা ধর্ম পালিত হয়, সে কর্মই করবে।" (ম.ভা. শান্তিপর্ব, ২৫৯/১,২)। আবার, শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে– *যক্ষরক্ষাংসি ভূতানি পিশাচাঃ পিশিতাশনাঃ (৪/১৮/২১)* যক্ষ-রাক্ষস, ভূত, প্রেত, পিশাচরাই মাংসাশী হয়।

আবার, মহাভারতে (অনুশাসনপর্ব, ১০০/৩৯, ৪০, ভীষ্মদেবের উক্তি) স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, "যিনি সংযত হয়ে প্রত্যেক মাসে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, তিনি সমভাবে মদ্য ও মাংস পরিত্যাগ করবেন। জ্ঞানী সপ্তর্ষিগণ, বালখিল্য মুনিগণ মরীচি আদি ঋষিগণ মাংস ভক্ষণ না করারই প্রশংসা করেন।" সুতরাং, এ শ্লোক অনুসারে, যজ্ঞকারী কল্কি নিশ্চয়ই মাংসভোজন করবেন না।

অধিকন্তু, এ অধ্যায়েরই ৪৪ নং শ্লোকে বলা হয়েছে–

দদাতি যজতে চাপি তপস্বী চ ভবত্যপি।

মধুমাংসনিবৃত্তে হি প্রাহ চৈবং বৃহস্পতি ॥

"সাধুজন মদ্য ও মাংস ভক্ষণ রহিত হয়েই দান, যজ্ঞ ও তপস্যা করেন, দেবগুরু বৃহস্পতি সে কথা বলেছেন।" এ শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে যজ্ঞানুষ্ঠানে বেদজ্ঞ কল্কির মাংসভোজনের প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

তাছাড়া, কল্কিপুরাণে (৩.৪.২৪) কল্কিদেব স্বয়ং বলেছেন যে, *হত্বা ম্লেচ্ছানধর্মিষ্ঠান্ প্রজাভূতবিহিংসকান।* অর্থাৎ, "আমি এক্ষণে প্রজাপীড়ক প্রাণিহিংসক অধার্মিক ম্লেচ্ছদের বিনাশ করব।" যেহেতু কল্কি নিজেই প্রাণিহত্যার বিপক্ষে, সুতরাং তিনি কীভাবে প্রাণিহত্যার অনুমোদন দিবেন? অধিকন্তু, বহু নিষিদ্ধাচারের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতে (১/১৭/৩৮) বিশেষ চারটি বিষয় বর্জনের নির্দেশ রয়েছে–

অভ্যর্থিতস্তা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।

দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্মশ্চতুর্বিধঃ ॥

অর্থাৎ, "কলির আবেদন শ্রবণ করে মহারাজ পরীক্ষিত কলিকে যেখানে দ্যূত ক্রীড়া, আসব পান, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ এবং পশু হত্যা হয়, সেই সেই স্থানে থাকবার অনুমতি দিলেন।" যেহেতু পশুহত্যাস্থানে কলির অবস্থান, তাই যে কল্কি অবতার কলিকে বিনাশ করতে অবতীর্ণ হয়েছেন, তিনি পশুহত্যা করে মাংস ভোজনের অনুমোদন দ্বারা কলিকে প্রশ্রয় দিবে–একথা একেবারেই অসঙ্গতিপূর্ণ।

তাই, কল্কিপুরাণের উক্ত শ্লোক অনুসারে, কোনো প্রাণীর মাংস নয়, কল্কি ব্রাহ্মণদের তৃণ অথবা তিলচূর্ণ অথবা উভয়ই ভোজন করান। পণ্ডিতগণ উক্ত শ্লোকের কদর্থ করে কল্কিকে কখনো মাংসভোজী বলেন না। অতএব, মাংসভোজী কোনো ব্যক্তি কখনো কল্কি অবতার নন।

"নৃপলিঙ্গচ্ছদো দস্যূন্ কোটিশো নিহনিষ্যতি"

– অপব্যাখ্যার সমাধান

সৌরভঃ স্যার, শ্রীমদ্ভাগবতে (১২.২.২০) কল্কি অবতারের কার্যাবলি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– *"নৃপলিঙ্গচ্ছদো দস্যূন্ কোটিশো নিহনিষ্যতি"*। কেউ কেউ এ শ্লোকে উক্ত *'নৃপলিঙ্গচ্ছদো'* শব্দের কদর্থ করে বলে– "কল্কি অবতার হবেন লিঙ্গচ্ছেদী; তিনি রাজবেশে অসংখ্য গুপ্ত দস্যুকে সংহার করবেন।" এ বিষয়টি দয়া করে ব্যাখ্যা করুন।

দেবব্রতঃ বর্তমান সমাজে কল্কি অবতার সম্বন্ধে প্রচলিত অপব্যাখ্যাগুলোর অন্যতম দৃষ্টান্ত এই শ্লোকটি। আমি অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবে বিষয়টি আপনাদের কাছে ব্যাখ্যা করব।

❍ এককথায় বলতে গেলে, ভবিষ্যপুরাণ (প্রতিসর্গ পর্ব–২১.২৪-২৫) অনুসারে, লিঙ্গচ্ছেদ একপ্রকার ম্লেচ্ছ সংস্কৃতি। কিন্তু ভগবান কল্কি আবির্ভূত হবেন উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ পরিবারে, যে সংস্কৃতিতে লিঙ্গচ্ছেদ বলে কোনো সংস্কার নেই। বরং, ব্রাহ্মণপুত্ররূপে কল্কি গর্ভাধানাদি দশবিধ সংস্কার (*গর্ভাধানাদিসংস্কৃতঃ–ক.পু.* ১.২.৪২) যথা– ১.গর্ভাধান, ২.পুংসবন, ৩.সীমন্তোন্নয়ন, ৪.জাতকর্ম, ৫.নামকরণ, ৬.অন্নপ্রাশন, ৭.চূড়াকরণ, ৮.উপনয়ন, ৯.সমাবর্তন ও ১০. বিবাহ – এ সকল সংস্কার পালন করবেন। *কে চ তে দশ সংস্কারা ব্রাহ্মণেষু প্রতিষ্ঠিতাঃ। (ক.পু.* ১.২.৪১)। কল্কিপুরাণের ১ম অংশে ২য় অধ্যায়ের ২৯, ৩৫-৪৮ নং শ্লোকে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। *দশযজ্ঞৈঃ সংস্কৃতা যে ব্রাহ্মণা...। (ক.পু.* ১.২.৩৭)। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ অবশ্যই দশ যজ্ঞ দ্বারা সংস্কৃত হবেন। তাহলে ব্রাহ্মণপুত্ররূপে কল্কি যে সংস্কার কখনোই পালন করবেন না, তা তাঁর ওপর কীভাবে আরোপ করতে পারেন?

❍ এবার 'নৃপলিঙ্গচ্ছদো' শব্দটি বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। 'নৃপ' শব্দের আভিধানিক অর্থ রাজা এবং 'লিঙ্গ' অর্থ প্রতীক, চিহ্ন, উপস্থ, সূচক, অর্থ প্রকাশক, সূক্ষ্ম ইত্যাদি। আর, 'ছদঃ' শব্দে এখানে 'ছদ্মবেশ' বোঝানো হয়েছে।

নৃপলিঙ্গচ্ছদো = (নৃপ) রাজ+(লিঙ্গ)চিহ্ন/লক্ষণ+(চ)সহিত+(ছদ)আবৃত/বেষ্টিত

= রাজার লক্ষণাদি বৈশিষ্ট্যগুলো দ্বারা আবৃত

সুতরাং, উক্ত শ্লোকে 'নৃপ-লিঙ্গ' শব্দের অর্থ নিশ্চয়ই রাজার উপস্থ নয়, রাজার লক্ষণবিশিষ্ট/রাজচিহ্নবিশিষ্ট। অর্থাৎ, এই শ্লোকে লিঙ্গ শব্দটি চিহ্ন বা প্রতীক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রমাণস্বরূপ, এর কয়েকটি শ্লোক আগেই (ভা.১২.২.১৩) বলা হয়েছে যে –*দস্যুপ্রায়েসু রাজসু*। ৮নং শ্লোকে–*রাজন্যৈনির্ঘৃণৈদস্যু*। ৭নং শ্লোকে– *শূদ্রানাং যো বলী ভবিতা নৃপঃ*। অর্থাৎ, কলিযুগে শূদ্রগণ যদিও বলপূর্বক রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করবে, রাজবেশে তথা রাজচিহ্নবিশিষ্ট হয়ে তারা হবে দস্যু-তস্কর। শাস্ত্রানুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র– এ চারটি আশ্রমের মধ্যে ক্ষত্রিয়গণই রাজা হন; আর যোগ্য ক্ষত্রিয়ের অভাবে ব্রাহ্মণগণ। কিন্তু, এ অধ্যায়ের ৪নং শ্লোকে বলা হয়েছে– *লিঙ্গমেবাশ্রমখ্যাতা...। (লিঙ্গম্ এব আশ্রম-খ্যাতৌ)* অর্থাৎ, "কলিযুগে কেবল বাহ্য প্রতীক অনুসারে ব্যক্তির আশ্রম নির্ধারিত হবে।" এখানেও প্রতীক অর্থে লিঙ্গ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যথায়, অপব্যাখ্যাকারেরা এই শ্লোকে ব্যবহৃত *'লিঙ্গ'* শব্দের কী অর্থ করবে? আবার, ৩৬ নং শ্লোকেরই বা *(নামলিঙ্গানাং)* কী অর্থ করবে?

❍ এবার আসা যাক উক্ত শ্লোকে ব্যবহৃত 'ছদঃ' শব্দের বিশ্লেষণে। এখানে ছদঃ শব্দের অর্থ– ছদ্মবেশ। কিন্তু সংস্কৃত সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ কতিপয় ব্যক্তি **'ছদঃ'** শব্দে **'ছেদঃ'** শব্দের অর্থ করে কদর্থ করছে। কিন্তু 'ছদ' ও 'ছেদ' এদুটি শব্দের মধ্যে কোনো মিল নেই। একটির অর্থ ছদ্মবেশ ধারণ করা আর অন্যটি ছিন্ন করা। এরকম বহু শব্দ দেখা যায় যেগুলোর কেবল সামান্য কার চিহ্ন পরিবর্তনে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে যেমন-

ছত্র (ছাতা) – ছাত্র (শিক্ষার্থী)
ছন্ন (আবৃত) – ছিন্ন (ছিঁড়ে গেছে এমন)
তল (নিম্নভাগ) – তেল (তৈলাক্ত পদার্থ)
বল (শক্তি) – বেল (ফলবিশেষ)
দশ (সংখ্যাবিশেষ) – দেশ (স্থানবিশেষ)

এভাবে অসংখ্য শব্দ রয়েছে যার কেবল একটি 'কার' বা 'ফলা' চিহ্ন পরিবর্তন করলেই সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে যেখানে মূল শ্লোকে 'ছদঃ' শব্দ রয়েছে সেস্থলে 'ছেদঃ' শব্দ প্রয়োগ করা প্রতারণা নয় কি?

প্রকৃতপক্ষে, এ শ্লোক অনুযায়ী, ক্ষত্রিয় বা রাজা হওয়ার যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও শূদ্রা রাজার ছদ্মবেশ ধারণ করবে, তারপর দস্যুবৃত্তি করবে এবং এসমস্ত রাজার ছদ্মবেশধারী দস্যুদেরই ভগবান কল্কি সংহার করবেন। এটাই উল্লিখিত শ্লোকের প্রকৃত অর্থ।

আবিরঃ স্যার, অসাধারণ ব্যাখ্যা। কিন্তু এ বিষয়টি সেই বইটিতে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে এর দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই প্রকৃত সত্য মানুষের মাঝে তুলে ধরতে হবে।

ভবিষ্যপুরাণোক্ত ত্রিপুরাসুরই কি কল্কি অবতার?

আবির: শুনেছি ভবিষ্যপুরাণে এক অসুরের কথা বলা আছে। তিনিই নাকি কল্কিরূপে ইতোমধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন?

দেবব্রত: হা হা হা হা...। সকলেই জানে যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু কল্কিরূপে অবতীর্ণ হবেন। আর আপনি বলছেন বিষ্ণুবিদ্বেষী অসুর আসবে কল্কিরূপে! নিশ্চয়ই আপনি কখনো ভবিষ্যপুরাণ পড়েননি। ভবিষ্যপুরাণে ত্রিপুর নামে এক অসুরের কথা বলা আছে, যাকে বহুকাল পূর্বে দেবাদিদেব শিব ভস্ম করেছিলেন। এই ত্রিপুরাসুরই পরবর্তীকালে এক ম্লেচ্ছ আচার্যরূপে জন্মগ্রহণ করেছে। ভবিষ্যপুরাণে একথা স্পষ্ট বলা হয়েছে। কিন্তু এ সত্য কেউ যথাযথরূপে না জেনে, কেউবা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে তাকেই কল্কি অবতার বলছে। কিন্তু তিনি কল্কি অবতার নন।

সৌরভ: স্যার, আপনি হয়ত জানেন এ ব্যাপারে ইউটিউব, ফেসবুকসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে অপপ্রচারে ছেয়ে গেছে। এমনকি আপনি যদি গুগলে কল্কি অবতার লিখে সার্চ করেন, তবে বেশির ভাগ রেজাল্ট আসবে তথাকথিত কল্কি অবতারদের। এমনকি শাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ অনেকেই এসব মিথ্যার জালে ফেঁসে যাচ্ছে। স্যার, আপনি যদি ভবিষ্যপুরাণোক্ত এই ত্রিপুরাসুর সম্বন্ধে আমাদের বিস্তারিত বলতেন...।

দেবব্রত: আপনি ঠিকই বলেছেন সৌরভ। আমি ভারতেও দেখেছি, ভবিষ্যপুরাণের এই প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে বিভ্রান্তিমূলক কিছু বইও প্রকাশিত হয়েছে। আমি এ ব্যাপারে ভবিষ্যপুরাণ থেকেই আপনাদের বিস্তারিত বলছি–

[বুক-সেলফ থেকে দেবব্রত বাবু ভবিষ্যপুরাণটি হাতে নিয়ে প্রতিসর্গ পর্ব, ৩য় খণ্ড ৩য় অধ্যায় বের করলেন]

চলুন, তবে আমরা ধারবাহিকভাবে ৩য় অধ্যায়ের প্রাসঙ্গিক অংশটুকু পড়ি। তাহলে এ সম্বন্ধে আমরা একটা স্বচ্ছ ধারণা পাবো।

এ অধ্যায়ের শুরুতেই শালিবাহন বংশের রাজাদের কথা বলা হচ্ছে।

সূত উবাচ

শালিবাহন বংশে চ রাজানো দশ চা ভবন্।
রাজ্যং পঞ্চদশাব্দং চ কৃত্বা লোকান্তরং যযুঃ ॥১॥
মর্যায়া ক্রমতে লীনা জাতা ভূমণ্ডলে তদা।
ভূপতি দশমো যো বৈ ভোজরাজ ইতি স্মৃতঃ।

দৃষ্ট্বা প্রক্ষীণমর্যাদাং বলী দিগ্বিজয়ং যযৌ ॥২॥
সেনয়া দশসহস্র্যা কালিদাসেন সংযুতঃ।
তথান্যৈর্ব্রাহ্মণৈ সার্দ্ধং সিন্ধুপারমুপাযযৌ ॥৩॥
জিত্বা গান্ধারজান্ ম্লেচ্ছান্কাশ্মীরান্নারবাঞ্ছঠান্ ।
তেষাং প্রাপ্য মহাকোশং দণ্ডয়ো গ্যানকারয়ৎ ॥৪॥

"সূত গোস্বামী বললেন, শালিবাহন বংশে দশজন রাজা ছিলেন। তারা ৫০০ বছর পর্যন্ত রাজ্য শাসন করে শেষে পরলোকগত হন। ॥১॥ ভূমণ্ডলে তাদের মর্যাদা ক্রমে লীন হতে থাকে। দশমরাজা ভোজরাজ ক্ষীণমর্যাদা দেখে দিগ্বিজয়ের জন্য যাত্রা করেন। ॥২॥ দশসহস্র সেনা ও কালিদাসকে সঙ্গে নিলেন। সেইসাথে অন্য ব্রাহ্মণদের নিয়ে তিনি সিন্ধু তীরে পৌঁছালেন। ॥৩॥ তিনি সেখানে গান্ধার, ম্লেচ্ছ, কাশ্মীর ইত্যাদি জয় করে তাদের দণ্ডদানস্বরূপ বহু কোশ প্রাপ্ত হলেন। ॥৪॥"

আচার্যেণ সমন্বিতঃ

দেখুন, পরবর্তী ৫ম শ্লোকে এক ম্লেচ্ছ আচার্যের কথা বলা হয়েছে–

এতস্মিন্নন্তরে ম্লেচ্ছঃ আচার্যেণ সমন্বিতঃ।

সৌরভ: এ শ্লোকাংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেন, "আচার্য বলতে বোঝায় সম্মানিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে। তাই এখানে যাকে আচার্য বলে সম্বোধন করা হয়েছে, তিনি মহাপুরুষ এবং মহৎ গুণাবলি সমন্বিত। তাই, তিনি ত্রিপুরাসুর নন। বরং তিনি ত্রিপুরাসুরকে নাশ করেছেন।"

দেবব্রত: 'আচার্য' শব্দের আভিধানিক অর্থ– শিক্ষাগুরু, যিনি আচরণ করে তার শিষ্যদের শিক্ষা দেন। যিনি যে বিষয়ে শিক্ষা দেন, তিনি সে বিষয়ের আচার্য। ভালোভাবে লক্ষ্য করুন, এ শ্লোকাংশের ঠিক পরবর্তী চরণে সেই আচার্য সম্পর্কে বলা হয়েছে– *"শিষ্য শাখা সমন্বিত"* অর্থাৎ, তিনি ছিলেন শিষ্য সমন্বিত। সুতরাং, এই শ্লোকেও 'আচার্য' শব্দটি গুরু অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

এবার দেখুন, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের অনুসারীদের কাছে অবশ্যই শুক্রাচার্য মহৎ গুণাবলি সমন্বিত এবং তার নামের সঙ্গেও 'আচার্য' শব্দ যুক্ত রয়েছে। কিন্তু তিনি দৈত্যগুরু, দেবগুরু নন। দেবগুরু হলেন বৃহস্পতি। তেমনি, এই শ্লোকে বলা হয়েছে, *'ম্লেচ্ছঃ আচার্যেণ'* অর্থাৎ তিনি ম্লেচ্ছদের গুরু, আর্যদের নন। 'আর্য'-এর বিপরীত শব্দ হলো 'অনার্য' এবং 'ম্লেচ্ছ' ও 'অনার্য' সমার্থক শব্দ। আমি ইতোপূর্বে ম্লেচ্ছ শব্দের বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি যে, ম্লেচ্ছ ও আর্য সম্পূর্ণ ভিন্নার্থক শব্দ। তবে, একজন ম্লেচ্ছগুরু কীভাবে আর্য ব্রাহ্মণরূপী ভগবান কল্কি হতে পারেন?

○ মহাদেবং

আর আপনি বললেন, "শিষ্যসমন্বিত সেই ম্লেচ্ছ আচার্য ত্রিপুরাসুর নন; তিনি ত্রিপুরাসুরকে নাশ করেছেন।" এবার আমি আপনাকে পরের শ্লোকগুলো দেখাচ্ছি। দেখুন, এর পরবর্তী শ্লোকগুলোতে কী বলা হয়েছে–

নৃপশ্চৈব মহাদেবং মরুস্থলনিবাসিনম্।
গঙ্গাজলৈশ্চ সংস্নাপ্য পঞ্চগব্য সমন্বিতৈ ॥৬॥
নমস্তে গিরিজানাথ মরুস্থল নিবাসিনে।
ত্রিপুরাসুরনাশায় বহুমায়া প্রবর্তিনে ॥ ৭ ॥
ম্লেচ্ছগুপ্তায় শুদ্ধায় সচ্চিদানন্দরূপিনে।
ত্বং মাং হী কিংকরং বিদ্বিশরণার্থমুপাগত্ ॥৮॥

অর্থাৎ, রাজা ভোজ তখন মরুস্থলনিবাসী মহাদেবকে (শিবকে) গঙ্গাজল, পঞ্চগব্যদ্বারা অর্চনা করে সন্তুষ্ট করলেন। ॥৬॥ ভোজরাজ বলেন, মরুস্থলনিবাসী, বহু মায়া প্রবর্তক ত্রিপুরাসুরনাশকারী, ম্লেচ্ছ দ্বারা রক্ষিত শুদ্ধ সচ্চিদানন্দরূপী গিরিজানাথকে নমস্কার। আমি আপনার সেবক, আপনার শরণে এসেছি ॥৭-৮॥

আবিরঃ স্যার, এখানে 'মহাদেব' বলতে কি শিবকে বোঝানো হচ্ছে, নাকি অন্য কোনো ব্যক্তিকে? ঐ বইতে লেখা ছিল 'মহাদেব' অর্থে এখানে 'শিব' নয়, বরং মহান এক স্বর্গীয় দেবতা তথা সেই ম্লেচ্ছ আচার্যকে বোঝানো হয়েছে। তারা এই মহাদেব শব্দটি ভেঙ্গে বিভিন্ন আভিধানিক অর্থ দেখিয়েছে।

দেবব্রতঃ আবির, এটা নিতান্তই মূর্খের প্রলাপ ছাড়া কিছু নয়। ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে শিবকেই মহাদেব বলে জানে। এমনকি বেদ-পুরাণ-উপনিষদাদি সমস্ত শাস্ত্রে শিব মহাদেব নামে পরিচিত। যেমন, পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ২৩৬তম অধ্যায়ের ২নং শ্লোকে শিবকে মহাদেব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও আরো অসংখ্য স্থানে শিবই যে মহাদেব, তা উল্লেখ আছে।

আজ হঠাৎ কেউ এসে বললেন, মহাদেব শিব নন, অন্য কেউ– অমনি সুধী সমাজ তা মেনে নেবে? যেমন– পঞ্চপাণ্ডবদের একজন সহদেব। এখন, কোনো এক শ্লোকে 'সহদেব' এর কথা উল্লেখ আছে। কোনো এক ব্যক্তি এসে বলল, এখানে সহদেব বলতে পঞ্চপাণ্ডবের একজন নন, বরং দেবতাদের সহকারী কাউকে বোঝানো হয়েছে। আপনি কি তা মেনে নেবেন? না।

এভাবে আমরা প্রায় বেশিরভাগ নামের অর্থ দিয়ে নামধারী ব্যক্তিসত্তাকে সমাধিস্থ করে, এই নাম দ্বারা অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। তাই বলে

প্রকৃত সত্য হারিয়ে যাবে না। তাই এখানে 'মহাদেব' অর্থে অন্য কাউকে বোঝানো হয়নি, শিবকেই বোঝানো হয়েছে। তার প্রমাণ পরবর্তী শ্লোকেই দেখতে পাই, যেখানে সেই মহাদেবকেই 'গিরিজানাথ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ঠিক যেমন, সহদেব অর্থে দেবতাদের সহকারী হতে পারে, কিন্তু যখন আমরা পঞ্চপাণ্ডব হিসেবে সহদেবকে বলবো, তখন তা মাদ্রীর পুত্র সহদেবকেই বোঝাবে। একইভাবে, যদি কারো সংশয় থাকে যে, এখানে 'মহাদেব' অর্থে অন্য কাউকে বোঝানো হয়েছে, তবে সেটা এজন্যই ভিত্তিহীন কারণ, 'গিরিজানাথ' কেবল শিবকেই বলা হয়, অন্য কাউকে নয়।

○ গিরিজানাথ

সৌরভঃ স্যার, কেউ কেউ বলেন, "এখানে গিরিজানাথ অর্থে নাকি শিবকে নয়, সেই ম্লেচ্ছ আচার্যকেই বোঝানো হয়েছে। তারা 'গিরিজানাথ' বলতে বোঝায় 'মানব জাতির গর্ব'।

দেবব্রতঃ যদি আমি বলি, গিরিজানাথ বলতে বোঝায় 'গীর্জানাথ' তথা 'যীশুখ্রিস্ট'কে। তার মানে কি এই যে, যীশুই ত্রিপুরাসুর নাশ করেছিলেন, রাজা ভোজ যীশুকেই পূজার্চনা ও স্তুতি করেছিলেন? যদি এভাবে প্রতিটি শব্দের কাল্পনিক অর্থ করা হয়, তবে তা হয় মূর্খতা, নয়তো প্রতারণা। কারণ, এ থেকে বোঝায় যে তার শাস্ত্র সম্বন্ধে, এমনকি বাংলা বা সংস্কৃত সম্বন্ধেও সাধারণ ধারণা নেই। শাস্ত্রে বহুস্থানে এমনিভাবে নাথ শব্দের প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। যেমন–

সীতানাথ = রাম (জনককন্যা সীতার যিনি নাথ)
গোপীনাথ = কৃষ্ণ (বৃন্দাবনের গোপীদের নাথ)
শ্রীনাথ = নারায়ণ (শ্রী অর্থাৎ, লক্ষ্মীদেবীর নাথ)

একইভাবে, গিরিজানাথ = শিব (গিরিজা অর্থাৎ হিমালয়ের কন্যা পার্বতীর নাথ)
শাস্ত্রে অসংখ্য স্থানে দেবী পার্বতীকে গিরিজা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তার মধ্যে পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ২৩৬তম অধ্যায়ের ১৩ নং শ্লোকে শিবের পত্নী পার্বতীই যে গিরিজা তা স্পষ্ট উল্লেখ আছে।
অর্থাৎ, গিরিজানাথ বলতে যে, এখানে শিবকেই বোঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে কোনো সংশয় থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

❍ ত্রিপুরাসুরনাশায়

আবির: তারা বলছে, সেই ম্লেচ্ছ আচার্যকেই এখানে ত্রিপুরাসুরনাশায় বলা হয়েছে।

দেবব্রত: কখনোই না। আমরা ইতোমধ্যেই প্রমাণ করেছি যে, মহাদেব ও গিরিজানাথ উভয় শব্দ দ্বারা শিবকেই সম্বোধন করা হয়েছে, সুতরাং, ত্রিপুরাসুরনাশায় সম্বোধনটিও শিবের ক্ষেত্রেই প্রজোয্য। তাই আপনার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণরূপে ভুল, মিথ্যা ও বানোয়াট। কারণ, লিঙ্গপুরাণের ৭২তম অধ্যায় এবং শিবপুরাণের (জ্ঞান সংহিতা) ২৪তম অধ্যায়ে দেবাদিদেব শিবই যে বহুকাল পূর্বে ত্রিপুরাসুরকে ভস্ম করেছিলেন, তার স্পষ্ট ইতিহাস সুবিস্তারে বর্ণিত রয়েছে। আর সেই ত্রিপুরাসুরই যে পিশাচধর্ম প্রচারের জন্য ম্লেচ্ছ আচার্যরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেছে, তা ভবিষ্য পুরাণে শিব নিজেই বলছেন–

বহুবাত্র মহামায়ী যোহসৌ দগ্ধো ময়া পুরা।
ত্রিপুরো বলিদৈত্যেন প্রেষিত পুনরাগত ॥১১॥

"যে মায়াবী দৈত্যকে আমি ভস্ম করেছিলাম, সেই ত্রিপুরাসুরই বলিদৈত্য কর্তৃক প্রেরিত হয়ে পুনরায় আগমন করেছে।" ॥১১॥

তাহলে, ৬ষ্ঠ শ্লোকে *'মহাদেবং'*, ৭ম শ্লোকে *'গিরিজানাথ'* শব্দদ্বয় থেকে এটি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, এখানে শিবকেই সম্বোধন করা হচ্ছে। তারপর, আবার ১১নং শ্লোকে এর পুষ্টিবিধান হচ্ছে, শিব যে পূর্বে ত্রিপুরাসুরকে বধ করেছিলেন, সে উদ্ধৃতি দ্বারা। তাছাড়া, ত্রিপুরাসুর পুনরায় অবতীর্ণ হয়ে কী ধরনের কার্য সম্পন্ন করবে, সে কথাও ভবিষ্যপুরাণে স্পষ্ট– *পৈশাচকৃতিতৎপরঃ (শ্লোক ১২)*।

❍ মরুস্থলনিবাসিনম্

সৌরভ: স্যার, এ ব্যাপারে আমার আরেকটি প্রশ্ন আছে। আমরা দেখলাম যে, ৬ ও ৭নং শ্লোকে মরুস্থলনিবাসী শিবের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কেউ কেউ বলে, শিব মরুস্থলে থাকেন না, তাই এখানে 'মহাদেব' বলতে সেই ম্লেচ্ছ আচার্যকে বোঝানো হয়েছে।

দেবব্রত: সৌরভ, আপনি আরো প্রমাণ চান! কোন শাস্ত্রে আছে যে, শিব মরুস্থলে থাকেন না? শিব ভগবানের গুণাবতার; তিনি স্বয়ং বা তাঁর বিগ্রহরূপে সর্বত্র আত্মপ্রকাশ করতে পারেন। বৈদিক সভ্যতার ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। আমরা তো এখানে কেবল কয়েক সহস্রাব্দের ইতিহাস শুনছি। আমি প্রথমেই আপনাকে বিভিন্ন যুগের আয়ুষ্কাল বলেছি। শিব পুরাণপুরুষ। অনাদিকাল ধরে শিবের আরাধনা প্রচলিত আছে। অথচ, বর্তমান সভ্যতায় আমরা কেবল খ্রিস্টপূর্ব কয়েক সহস্রাব্দের

ইতিহাস খুঁজে পাই। তাই এর ওপর ভিত্তি করে আমরা কীভাবে বলতে পারি যে, শিব মরুস্থলে থাকতে পারেন না। বরং শিব যে মরুস্থলে ছিলেন, এমনকি এখনো আছেন– এমন প্রমাণের অভাব নেই। রাজস্থানে এখনো বহু প্রাচীন শিব মন্দির রয়েছে। গুগলে ও ইউটিউবে এ বিষয়ে সার্চ করলে এর বহু প্রমাণ পাওয়া যাবে।

আবির: তাহলে সার্বিক আলোচনায় এটা পরিষ্কার যে, ভবিষ্যপুরাণোক্ত মহাদেব, ত্রিপুরাসুরনাশক, গিরিজানাথ শব্দগুলো দ্বারা দেবাদিদেব শিবকেই বোঝানো হয়েছে এবং ম্লেচ্ছ আচার্য ও শিব ভিন্ন ব্যক্তিসত্তা। অধিকন্তু, সেই শিবই পূর্বে যে ত্রিপুরাসুরকে ভস্ম করেছিলেন, ভবিষ্যপুরাণ অনুসারে সেই ত্রিপুরাসুরই পৈশাচধর্ম প্রচারের জন্য ম্লেচ্ছ আচার্যরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। আর তিনি কখনোই কল্কি অবতার নন।

দেবব্রত: হ্যাঁ, এবার মূল বিষয়টি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। যাহোক, শিবের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হওয়ার পর ম্লেচ্ছ আচার্যের সঙ্গে ভোজরাজের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সেই বর্ণনা আপনারা ভবিষ্যপুরাণ থেকে পড়ে নেবেন। আমি এ গ্রন্থটি আপনাদের দিয়ে যাব। তবে, আরেকটি বিষয় আমি বলতে চাই। তা হলো, ম্লেচ্ছ আচার্যের সঙ্গে ভোজরাজের দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার। ভোজরাজ নিজরাজ্যে ফিরে গেলে রাত্রিবেলা সেই ম্লেচ্ছ আচার্য পিশাচদেহ ধারণপূর্বক (*পৈশাচদেহ সাস্থায়-শ্লোক-২৩*) ভোজরাজের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাকে বলেন–

***আর্যধর্ম** হি তে রাজন্ **সর্বধর্মোত্তমঃ** স্মৃতঃ।*
*ঈশাজ্ঞয়া করিষ্যামি **পৈশাচং ধর্ম**দারুণম্ ॥২৪॥*
লিঙ্গচ্ছেদী শিখাহীনঃ শ্মশ্রুধারী স দূষকঃ।
*উচ্চালাপী **সর্বভক্ষী** ভবিষ্যতি জনো মম ॥২৫॥*

"হে রাজন, তোমার আর্যধর্ম (বৈদিকধর্ম) অতি উত্তম। কিন্তু ঈশ্বরের আজ্ঞায় আমি পৈশাচ ধর্ম পালন ও প্রচার করব। আমি লিঙ্গচ্ছেদন, শিখাচ্ছেদন, শ্মশ্রুধারণ, দুষক, উচ্চৈঃস্বরে আলাপ ও সকল কিছু ভক্ষণ করব।"

এখানে স্পষ্ট যে, আর্য বা বৈদিকধর্ম অতি উত্তম বা সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, অপরপক্ষে ত্রিপুরাসুর তার পরবর্তী জন্মে আচরণ করবে পিশাচধর্ম এবং পিশাচও এক প্রকার ম্লেচ্ছ। অথচ ভগবানের অবতার কল্কি হবেন ম্লেচ্ছনিধনকারী। তবে ত্রিপুরাসুর কীভাবে কল্কি হতে পারে?

তবুও, ত্রিপুরাসুর তথা ম্লেচ্ছ আচার্য ও কল্কি যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি, তাদের মধ্যে কী কী পার্থক্য তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমি এ বিষয়টি আরো স্পষ্টীকরণ করছি–

ত্রিপুরাসুর ও ভগবান কল্কির মধ্যে পার্থক্য		
বিষয়	**কল্কি অবতার**	**ত্রিপুরাসুর**
স্বরূপ	কল্কি হলেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অবতার।	ত্রিপুর হলো অসুর।
প্রচারিত ধর্ম	কল্কি অতিউত্তম আর্যধর্ম তথা বৈদিক ধর্ম প্রচার করবেন।	ত্রিপুরাসুর ম্লেচ্ছ ও পৈশাচ ধর্ম প্রচার করবে।
আবির্ভাব কাল	কল্কি কলিযুগের অন্তে অর্থাৎ আরো প্রায় ৪,২৬,৮৮০ বছর	ত্রিপুরাসুর ইতোমধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছে।
সংস্কৃতি	পর আবির্ভূত হবেন। কল্কি পৈতাধারী, নম্রভাষী ও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ-সংস্কৃতিসম্পন্ন।	ত্রিপুরাসুর লিঙ্গচ্ছেদী, শিখাহীন, শ্মশ্রুযুক্ত, উচ্চালাপী ও পৈশাচিক সংস্কৃতিসম্পন্ন।
আহার	কল্কি সাত্ত্বিক-আহারী ব্রাহ্মণ।	ত্রিপুরাসুর ম্লেচ্ছ (মাংসাশী) ও সর্বভুক।

আবিরঃ স্যার, এবার আমার মনে হচ্ছে, ভগবান কল্কি ও ত্রিপুরাসুরের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকার পর, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কখনো ত্রিপুরাসুরকে কল্কি বলার ধৃষ্টতা করবেন না; কেননা, তাতে ভগবান কল্কির মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করা হবে।

ভবিষ্যপুরাণে দুই কল্কি অবতারের বর্ণনা অসম্ভব

আবিরঃ স্যার, তবে কি ভবিষ্যপুরাণে কল্কি অবতারের কথা উল্লেখ নেই?

দেবব্রতঃ আপনি খুব সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছেন। ভবিষ্যপুরাণে কল্কি অবতারের উল্লেখ অবশ্যই রয়েছে। আমি প্রথমেই আপনাদের কলিযুগের আয়ুষ্কাল বিষয়ে বলেছি এবং কল্কির আবির্ভাবকাল বিষয়ে অন্যান্য শাস্ত্রসহ ভবিষ্যপুরাণ থেকে প্রমাণ দেখিয়েছি যে, কল্কি অবতার অবতীর্ণ হবেন কলিযুগের অন্তে। ভবিষ্যপুরাণে প্রতিসর্গ পর্ব, চতুর্থ খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়ে (কলিযুগের ইতিহাস বর্ণন) কল্কি অবতার প্রসঙ্গে স্পষ্ট বলা হয়েছে–

কলিযুগান্তকে...কল্কি চ ভবিতাস্ম্যহম্ ॥ (শ্লোক-২৮)

ভগবান বললেন, "কলিযুগের অন্তে আমি কল্কি অবতার রূপে অবতীর্ণ হব।" কলিযুগের ৪,৩২,০০০ বছরের মধ্যে মাত্র প্রায় ৫০০০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। অপরপক্ষে, ভবিষ্যপুরাণোক্ত ম্লেচ্ছ আচার্য কলির সূচনালগ্নে অর্থাৎ ইতোমধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে। একই গ্রন্থে উল্লেখিত ভিন্ন সময়ে জন্মগ্রহণকারী দুজন ব্যক্তি কীভাবে এক হতে পারে? এখানেই স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে যে, কল্কি অবতার ও সেই ম্লেচ্ছ আচার্য–এ দুজন সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। আর যদি তারা এক হতো, তবে ম্লেচ্ছ আচার্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে অবশ্যই সেখানে তার কল্কি অবতারের মতো এত বড় একটা পরিচয় উহ্য থাকতো না। অধিকন্তু, শাস্ত্রোক্ত কল্কি অবতারের সাথে ম্লেচ্ছ আচার্যের কোনো মিল নেই। তাই, ভবিষ্যপুরাণোক্ত ম্লেচ্ছ আচার্যকে কল্কি বলে প্রচার করা প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়।

আবিরঃ এখন বিষয়টি আরো স্পষ্ট ও প্রমাণিত হলো যে, কল্কি অবতারের সাথে ভবিষ্যপুরাণে বর্ণিত ম্লেচ্ছ আচার্যের কোনো সম্পর্ক নেই। ভাবতেই অবাক লাগছে, এমন একটি বর্ণনাকে কীভাবে তারা মিথ্যা ভাষ্য দ্বারা গুজবে পরিণত করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।

কল্কিপুরাণোক্ত ঘটনাপ্রবাহের কাল প্রসঙ্গ

সৌরভ: স্যার, আরেকটি বিষয় আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে, কল্কিপুরাণ পড়লে এমন মনে হয় যেন, ঘটনাগুলো ইতোমধ্যে ঘটে গেছে। অথচ, কল্কি অবতার আবির্ভূত হবেন বহু বছর পর। সেক্ষেত্রে এখানে কি একটি অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় না?

দেবব্রত: পরীক্ষিৎ মহারাজের বৈকুণ্ঠ গমনের পর মার্কণ্ডেয় প্রমুখ মুনিগণের প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব গোস্বামী কলির প্রাদুর্ভাব ও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কল্কি অবতার সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, শ্রীসূত গোস্বামী পরবর্তীকালে তা শৌনকাদি ঋষিদের নিকট বর্ণনা করেন। ভগবান কল্কি সম্পর্কিত সে আলোচনাই কল্কিপুরাণরূপে আজ আমাদের মাঝে বিদ্যমান, যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। একথা কল্কি পুরাণের শুরুতেই বলা হয়েছে।

তবে, আপনার প্রশ্নটি অত্যন্ত যৌক্তিক। যে কেউ কল্কিপুরাণ পড়লেই তার মনে এই প্রশ্নের উদয় হওয়া স্বাভাবিক। আপনি কী কখনো কোনো নাটক বা সিনেমার স্ক্রিপ্ট পড়েছেন? লেখক যখনই স্ক্রিপ্ট লিখুক না কেন তা পড়লে আপনার কাছে বর্তমান কাল বা ইতোমধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনার মতো মনে হবে। যদিও এখনো তা মঞ্চস্থ বা চিত্রায়িত হয়নি, অর্থাৎ ঘটনাটি এখনো ঘটেনি। কিন্তু তা পড়লে মনে হবে যেন, ইতোমধ্যেই তা সংঘটিত হয়ে গেছে বা বর্তমানে হচ্ছে। একইভাবে, কল্কি অবতার যদিও এখনো আসেননি, তবুও কল্কিপুরাণে যেহেতু তাঁর জীবনবৃত্তান্ত ঘটনা আকারে বর্ণনা করা হয়েছে, তাই তা পড়ে আপাত মনে হচ্ছে তা ঘটে গেছে। কিন্তু কল্কি পুরাণে কল্কি অবতারের লীলা বর্ণনের পূর্বেই প্রথম অধ্যায়ের ৮ নং শ্লোকে বলা হয়েছে–

সূত উবাচ

শৃণুধ্বমিদমাখ্যানং ভবিষ্যং পরমাদ্ভুতং।

"সূত গোস্বামী বললেন, আমি ভবিষ্য পরমাদ্ভুত উপাখ্যান কীর্তন করছি, শ্রবণ করুন।" তারপর সূত গোস্বামী ঘটনা বলতে শুরু করলেন। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ভবিষ্যতে ঘটবে এমন ঘটনা তিনি বর্ণনা করছেন।

সৌরভ: সত্যিই তো তা-ই। এভাবে তো কখনো ভেবে দেখে নি।

কল্কি অন্তিম অবতার নন

আবির: শোনা যায়, কল্কি নাকি অন্তিম অবতার। সেক্ষেত্রে আপনি কী বলবেন? কল্কি সম্পর্কে অপপ্রচারকারীদের অনেকেই বলেন, কল্কি হলেন অন্তিম অবতার।

দেবব্রত: শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, কল্কি অবতার অবতীর্ণ হবেন '*যুগসন্ধ্যায়াং*' – কলিযুগ এবং পুনরায় সত্যযুগের যুগসন্ধিক্ষণে অর্থাৎ কলিযুগের অন্তে বা শেষ দিকে। এমন নয় যে, তিনি শেষ অবতার। বৈদিক শাস্ত্রে অন্তিম অবতার বলে কিছু নেই। যখনই পৃথিবীতে ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই তিনি অবতীর্ণ হন–

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানি...তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে (২.৪১) বলা হয়েছে–

এবমাদিন্যনেকানি রূপাণ্যস্য মহাত্মনঃ।

যেষাং নামানি সংখ্যাতুংশক্যন্তে নাব্দকোটিভিঃ।

অর্থাৎ, "পরমপুরুষোত্তম ভগবানের নানা রূপে অবতার এত যে, বহু কোটি বৎসরেও তাদের নামোচ্চারণ করে শেষ করা যায় না।"

তাই, শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৩/২৬) বলা হয়েছে–

অবতারা হি অসংখ্যেয়া...

"বিশাল জলাশয় থেকে যেমন অসংখ্য নদী প্রবাহিত হয়, ঠিক তেমনি ভগবান থেকে অসংখ্য অবতার প্রকাশিত হয়।" এর কোনো অন্ত নেই।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১২/২/৩৯) বলা হয়েছে–

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরং চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগম্।

অনেন ক্রমযুগেন ভুবি প্রাণিষু বর্ততে ॥

অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি–এ চারটি যুগ ঘড়ির কাঁটার ন্যায় চক্রাকারে চলতে থাকে। এ চতুর্যুগ অবিরাম গতিতে চলতে থাকে, যার কোনো অন্ত নেই। তদ্রুপ, ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হন।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভামি যুগে যুগে।

তাঁর অবতরণেরও অন্ত নেই। সুতরাং, এমন নয় যে, কল্কি অবতারের পর আর কোনো অবতার হবে না। যুগাবর্তে তিনি আবার অবতীর্ণ হবেন। অতএব, যারা তাদের পছন্দনীয় ব্যক্তিকে যিনি কি না তাদের মতে ঈশ্বর প্রেরিত অন্তিম বার্তাবাহক, ঐ ধরনের ব্যক্তি কখনো কল্কি অবতার নন।

জগৎপতি কল্কি– ঈশ্বরের দূত নন, ঈশ্বর

আবির: স্যার, কেউ বলে কল্কি ঈশ্বর, কেউ বলে ঈশ্বরের প্রেরিত দূত। কোনটি ঠিক? কল্কি কি ঈশ্বর-দূত, নাকি ঈশ্বর?

দেবব্রত: কল্কি সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতে *(ভা. ১.৩.২৫ ও ১২.২.১৯)* ও *কল্কিপুরাণে (২.২.১২,২৩)* কল্কিকে 'জগৎপতি' শব্দে আখ্যায়িত করা হয়েছে– *কল্কির্জগৎপতিঃ, বিষ্ণৌ জগৎপতৌ, বিষ্ণুং জগৎপতি*। জগৎ শব্দে পৃথিবী বা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বোঝায়; আর 'পতি' শব্দের আভিধানিক অর্থ– স্বামী, প্রভু, রক্ষক, অধীশ্বর, পালক, পরিচালক বা নিয়ন্তা ইত্যাদি। এ প্রতিটি শব্দের পূর্বে 'জগৎ' শব্দ যুক্ত হলে যে অর্থ দাঁড়ায়– যেমন, জগৎস্বামী, জগৎপালক, সমগ্র বিশ্বের রক্ষক, জগদীশ্বর ইত্যাদি নিঃসন্দেহে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরমেশ্বর বা পরম স্রষ্টাকেই নির্দেশ করে; তাঁর সৃষ্ট জীবকে নয়।

তাছাড়া, এখানে 'জগৎপতি' শব্দের পূর্বে 'বিষ্ণু' শব্দটি যুক্ত রয়েছে; সুতরাং নিশ্চিতরূপে 'জগৎপতি' শব্দে পরমেশ্বর ভগবানকেই বুঝানো হয়েছে, ভগবানের দূতকে নয়।

কল্কির আবির্ভাব প্রসঙ্গে ভাগবত পুরাণে (১২.২.১৭) বলা হয়েছে, স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু অবতার হিসেবে জন্মগ্রহণ করবেন এবং শ্রীবিষ্ণু সম্পর্কে সেই শ্লোকে বলা হচ্ছে, তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, সর্বব্যাপী পরমাত্মা ও জগদ্গুরু।

অবতার-দর্শন অনুসারে, পরমেশ্বর ভগবান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে মনুষ্যরূপে লীলাবিলাস করেন এবং বৈদিকশাস্ত্রে বিষ্ণু হলেন পরমেশ্বরের একটি নাম। বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বী তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকেন এবং 'সর্বশক্তিমান' বা 'পরমাত্মা' বিশেষণ কেবল পরমেশ্বরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

সৌরভ: তবে কি যারা ঈশ্বরের নিরাকাররূপে বিশ্বাসী এবং কল্কিকে ঈশ্বরের দূত বলে জানেন, তারা এটা স্বীকার করছেন যে, তাদের স্বনির্বাচিত কল্কিই স্বয়ং ঈশ্বর, যিনি নির্বিশেষ হওয়া সত্ত্বেও মানবরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন?

কিন্তু সম্প্রতি অনেকে 'জগৎপতি' শব্দটি ভগবানের প্রেরিত কোনো মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, যাকে তাকে কল্কি অবতার বলে প্রচার করছে।

কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে এ অর্থে 'জগৎপতি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি, হয়েছে সমগ্র জগতের পরমপতি পরমেশ্বর অর্থে। কেননা, ভাগবতে উল্লেখিত কল্কি সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্ত শ্লোকে তাঁকে পরমেশ্বর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন:

ভাগবতের ১২ স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ে কলিযুগের লক্ষণ বর্ণনা করার পর কল্কির আবির্ভাব প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা হয়েছে–

ইত্থং কলৌ গতপ্রায়ে জনেষু খরধর্মীষু।
ধর্মত্রাণায় সত্ত্বেন ভগবান্ অবতরিষ্যতি ॥ (ভা.১২.২.১৬)

"কলিযুগ গতপ্রায় হলে মানুষ যখন ধর্মহীন ও গাধার মতো হবে, তখন পরমেশ্বর ভগবান এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন এবং শুদ্ধ সত্ত্বগুণের শক্তিতে কার্য করে তিনি সনাতন ধর্মকে রক্ষা করবেন।"

চরাচরগুরোর্বিষ্ণোরীশ্বরস্যাখিলাত্মনঃ।
ধর্মত্রাণায় সাধুনাং জন্ম কর্মাপনুত্তয়ে ॥ (ভা.১২.২.১৭)

"চরাচর সমস্ত জীবের গুরু ও পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু ধর্মরক্ষার জন্য এবং সাধু-ভক্তদের জড়জাগতিক কর্মবন্ধন থেকে ত্রাণ করার জন্য এ জগতে আবির্ভূত হন।"

এর পরবর্তী শ্লোকেই কল্কির আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে এবং পরবর্তী প্রতিটি শ্লোকে কল্কিকে– জগৎপতি (ভা. ১২.২.১৯), বাসুদেব–যা ভগবানের নাম (ভা. ১২.২.১৯,২২), ধর্মপতি (ভা. ১২.২.২৩), হরি (ভা. ১২.২.২৩) প্রভৃতি শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে এবং এ প্রতিটি সম্বোধন একমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

এছাড়া, কল্কিপুরাণে সর্বত্র কল্কিকে ভগবান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন: কল্কিপুরাণে ১ম অংশের ২য় অধ্যায়ে (১-৮) বর্ণিত আছে যে, কলির প্রকোপে অতিষ্ঠ দেবতাদের অনুরোধে ব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নিকট গমন করেন এবং শ্রীবিষ্ণু দেবতাদের বলেন যে, "শম্ভল নামক গ্রামে বিষ্ণুযশ নামক ব্রাহ্মণের গৃহে সুমতিনাম্নী ব্রাহ্মণকন্যার পুত্ররূপে শ্রীঘ্রই আমি আবির্ভূত হয়ে (*প্রাদুর্ভাবাম্যহম্*) কলিক্ষয় করব (*করিষ্যামি*)। এই আমার প্রিয়া (*মম প্রিয়া*) লক্ষ্মীও সিংহলে আবির্ভূত হয়ে পদ্মা নামে বিখ্যাত হবেন। পুনরায় দেবাপি ও মরু নামক রাজাদ্বয়কে পৃথিবীর শাসনকর্তৃত্বে স্থাপন করব (*স্থাপয়িষ্যাম্যহম্*)। পুনরায় সত্যযুগ স্থাপন করে আমার আলয় (*স্ব আলয়ং*) বৈকুণ্ঠে আগমন করব।"

ভগবান শ্রীবিষ্ণু এ বাক্যসমূহে কোথাও বলেননি যে, "আমার দূত অবতীর্ণ হবে"; তিনি প্রতিবার 'আমি' ও 'আমার' শব্দ ব্যবহার করেছেন।

আবার, কল্কি যেমন চতুর্ভুজ রূপে অবতীর্ণ হবেন, তেমনি তাঁর অন্তর্ধান লীলায়ও দেখা যায় যে, তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ (*গত্বা বিষ্ণুঃ সুরগণৈর্বৃতশ্চারুচতুর্ভুজেন–ক.পু ৩.১৯.২১*) ধারণ করে এ জগৎ থেকে অন্তর্হিত হন। কল্কিপুরাণে বলা হয়েছে (৩.১.৩১-৩৩)–

...কল্কি পরমাত্মকঃ।
কাল স্বভাবসংস্কার-নামাদ্যা প্রকৃতিঃ পরা।
যস্যেক্ষয়া সৃজত্যগুং মহাহংকারকাদিকান্ ॥
যন্মায়য়া জগদ্‌যাত্রা সর্গস্থিত্যন্তসঙ্গিতা।
য এবাদ্যঃ স এবান্তে তস্যায়ং সোহয়মীশ্বরঃ ॥

অর্থাৎ, "কল্কিই সেই পরমাত্মা। তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই কাল, স্বভাব, সংস্কার, নাম প্রভৃতির আদিভূত পরম প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব অহংকারতত্ত্ব প্রভৃতি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করছে। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপ জগৎপ্রপঞ্চ তাঁরই মায়া ভিন্ন আর কিছু নয়। তিনি সকলের আদি, তিনিই সকলের অন্ত। তাঁর থেকেই জগতের সমুদয় শুভ সংঘটিত হচ্ছে। সেই ঈশ্বর তিনিই।"

এছাড়াও কল্কিপুরাণের বহুস্থানে কল্কি সম্বন্ধে ব্যবহৃত (২.৩.২, ৯, ১৭, ২৩; ২.৪.১; ২.৬.৩১; ৩.৪.৩১; ৩.৮.২,৫; ৩.১১.৩; ৩.১৮.২৪,২৫; ৩.১৯.১০; ৩.১৯.১০-...) দেবদেব, পরমাত্মা, জগদীশ্বর, ভূতপতি, অনন্তশক্তি, বৈকুণ্ঠপতি, যজ্ঞপুরুষ, হরি, ঈশ্বর, জগৎপতি বিষ্ণু, সাক্ষাৎ নারায়ণ, পরেশ-পরমেশ্বর, বৈকুণ্ঠমীশ্বরম্ ইত্যাদি শব্দ প্রমাণ করে যে, কলিক্ষয় করতে ঈশ্বরের দূত নয়, ঈশ্বরই কল্কিরূপে অবতীর্ণ হবেন।

"সম্ভবামি যুগে যুগে" অর্থাৎ "যুগে যুগে 'আমি' অবতীর্ণ হই"- ভগবদ্গীতায় উদ্ধৃত এ ভগবদ্বাক্যের কদর্থ করে মূর্খেরা বলে ভগবানের দূত অবতীর্ণ হন। কল্কিপুরাণেও (১.৪.২-১৫) - ভগবান কল্কি নিজেই তাঁর ভগবত্তার কথা বিশ্লেষণ করেছেন। "পূর্বে কেবল আমিই ছিলাম, আর কিছুই ছিল না। ব্রহ্মা প্রভৃতি সমুদয় জীব ও পদার্থ আমা হতেই সৃষ্টি হয়েছে। আমার কাছ থেকেই ব্রহ্মা আমার বাক্যরূপ বেদ দ্বারা সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত হন। বেদে আমাকে চরাচর সকল হতে শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর বলে থাকে। আমি ভক্তি দ্বারা তোষিত হয়ে প্রিয়তমা লক্ষ্মীর সহিত যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে থাকি।"

এভাবে, কল্কিপুরাণে যদিও কল্কিরূপে পরমেশ্বরের অবতরণের উল্লেখ রয়েছে এবং বহুবার তাঁকে পরমেশ্বর বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে, তথাপি আজকাল অনেকে পরমেশ্বরের প্রেরিত দূতকে, যাকে তারা মানুষ বলে মনে করে, তাকেই কল্কি অবতার হিসেবে প্রমাণ করতে গিয়ে অল্পবুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে।

সুতরাং, যারা ইতোমধ্যে জন্ম নিয়েছে এমন কোনো ব্যক্তিকে একইসঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেরিত দূত বা প্রেরিত পুরুষ অথচ কল্কি বলে মনে করছে, তারা নিঃসন্দেহে বিপথগামী ও অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে। কেননা, কল্কি কারো প্রেরিত পুরুষ বা ঈশ্বরের দূত নন, ঈশ্বর।

বেদোক্ত নরাশংস কখনোই কল্কি নন

আবির: স্যার, অনেকে বলে থাকেন, বেদে উল্লেখিত নরাশংসই নাকি কল্কি অবতার। কথাটি কি ঠিক?

দেবব্রত: অথর্ববেদ সংহিতার ২০নং কাণ্ড, ৯ম অনুবাক-এর ৩১নং সুক্তের নাম কুন্তাপ সুক্ত। এই সুক্তটির বিষয়বস্তু হলো "রাজধর্মোপদেশ"। আমরা ধারাবাহিকভাবে প্রতিটি মন্ত্রের ভাষান্তর পড়ে দেখব যে, কীভাবে স্বার্থান্বেষী প্রতারকরা এর অপব্যাখ্যা করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। প্রকৃত অর্থে, এখানে আদৌ কল্কি সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। চলুন তবে দেখা যাক, কুন্তাপসুক্তে প্রকৃতপক্ষে কী বলা হয়েছে-

ইদং জনা উপ শ্রুত নরাশংস স্তবিষ্যতে।
ষষ্টি সহস্রা নবতি চ কৌরম আ রুশমেষু দদ্মহে ॥১॥

শব্দার্থ: **জনাঃ**-হে মনুষ্যগণ; **ইদম্**-এটা; **উপ**-সম্মানের সাথে/মনযোগের সাথে; **শ্রুত**-শোন; **নরাশংস**-মনুষ্যদের মধ্যে প্রশংসা পাওয়া পুরুষ; **স্তবিষ্যতে**-তাকেই স্তুতি করা হবে; **কৌরম**-পৃথিবীর ওপর রাজত্বকারী রাজন; **ষষ্টিসহস্রা**-ষাট হাজার; চ-আরো; **নবতিম্**-নব্বইতে (অনেক প্রকার দান অর্থে); **রুশমেষু**-ভীতিকরদের মধ্য থেকে/ সেইসব ভীত বা সন্ত্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে/ সাধারণ মনুষ্যদের মধ্য থেকে একজন বীর বা নেতা।

অর্থাৎ, "হে মানবগণ, সংসারে তারাই প্রশংসিত, যারা উত্তম কর্মের সাথে যুক্ত। একজন যথার্থ রাজা এটি বিচার করে অনেক ব্যক্তির মধ্য হতে প্রকৃত নেতা/ বীরকে চয়ন করে বহু দান দিবে।" ॥১॥

এই সুক্তে উক্ত নরাশংস যে কল্কি অবতার নন, তা প্রমাণ করতে সম্পূর্ণ সুক্তের চুলচেরা বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন; কেবল কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করলেই খুব সহজে তা প্রমাণিত হবে।

'নরাশংস' নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি নন

আবির: স্যার, এখানে তো নরাশংস বলতে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে নির্দেশ করা হয়নি, তবে তারা কীভাবে বলে যে, নরাশংসই কল্কি?

সৌরভ: তুমি জান না আবির, 'নরাশংস' মানে প্রশংসিত ব্যক্তি-একথা বলে কেউ

কেউ জনৈক তথাকথিত প্রশংসিত ব্যক্তিকে নরাশংস বলে প্রতিপন্ন করতে চায় এবং তাকেই তারা কল্কি অবতার বলে থাকে।

দেবব্রতঃ যদি প্রসংশিত ব্যক্তিমাত্রই কল্কি অবতার হন, তবে জগতে কল্কি অবতারের সংখ্যা অগণিত। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে সকলের কাছেই আমি অত্যন্ত প্রশংসিত। তবে কি আমিও কল্কি অবতার?

আবির ও সৌরভঃ হা হা হা হা...।

সৌরভঃ কিন্তু স্যার, এক্ষেত্রে কেউ বলতে পারেন যে, শুধু প্রশংসিত হলেই চলবে না, একইসাথে এই সুক্তে উল্লেখিত অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলোও সাদৃশ্যপূর্ণ হতে হবে।

দেবব্রতঃ আপনার কথা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু ভিত্তিহীন। কারণ, এখানে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলো কল্কি অবতারের সঙ্গে মোটেও সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। সুতরাং, তথাকথিত সেই ব্যক্তি কল্কি নন। তাদের অপব্যাখ্যার আরো প্রমাণ দেখুন–

❍ 'স্তবিষ্যতে' মানে ভবিষ্যতে নয়

দেবব্রতঃ এ সুক্তে *'স্তবিষ্যতে'* শব্দের অপপ্রয়োগ করে এ স্থলে 'ভবিষ্যতে' অর্থ করে বলা হয় যে, নরাশংস ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করবে। কিন্তু *'স্তবিষ্যতে'* আর 'ভবিষ্যতে' সম্পূর্ণ ভিন্নার্থক শব্দ। *'স্তবিষ্যতে'* মানে 'স্তুতি করবে'। সুতরাং, এ সুক্তে ভবিষ্যতে কারো জন্মগ্রহণের বিষয়টি একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। এবার আমরা পরবর্তী মন্ত্রগুলো দেখি–

উষ্ট্রা যস্য প্রবাহণো বধূমন্তো দ্বির্দশ।
বর্ষ্মা রথস্য নি জিহীড়তে দিব ঈষমাণা উপস্পৃশঃ ॥২॥
এষ ইষায় মামহে শতং নিষ্কান্ দশ স্রজঃ।
ত্রীণি শতান্যর্বতাং সহস্রা দশ গোনাম্ ॥৩॥

যস্য–যাঁর (রাজা অর্থে); **রথস্য**–রথের; **প্রবাহণঃ**–নিয়ে চলে; **ঈষমারণঃ**–দ্রুতগামী; উপস্পৃশঃ–যুক্ত করে; **বধূমন্তঃ**–স্ত্রী উট নিয়ে, **দ্বির্দশ**–দুইবার দশ; **উষ্ট্রা**–পুরুষ উট; **দিবঃ**–উত্তম/পরিশ্রমীদের; বর্ষ্মা (বর্ষ্মানম্)–উচ্চ পদকে; **নি জিহীডতে**–আরো সম্মানিত করে তোলে; **এষঃ**–সেই (রাজাকে বোঝায়); **ইষায়**–পরিশ্রমী ব্যক্তিদের মধ্যে; শতম্–একশত; **নিষ্কান্**–স্বর্ণমুদ্রা; **দশ**–দশ (সংখ্যা); **স্রজঃ**–মালা/হার; **শতান্যর্বতামত্রীনিশতানি**–তিনশত ঘোড়া আর; গোনম্ দশ সহস্রা–দশ হাজার গাভী; **মামহে**–দান করেন।

অর্থাৎ, "দ্রুত বেগবান্ রথের রাজার সহিত বিশবর্ষীয় উটযুগল (মতান্তরে বিশটি উট) উত্তম/পরিশ্রমী পুরুষের পদকে আরো উচ্চ/সম্মানিত করে তোলে। তিনি নিজেও পরিশ্রম করেন এবং পরিশ্রমী জনগণের মধ্যে একশত স্বর্ণমুদ্রা, দশটি মাল্য/হার, তিনশত ঘোড়া আর দশ হাজার গাভী দান করেন।" ॥২-৩॥

সৌরভঃ কিন্তু এ দুটি মন্ত্রে উক্ত ***উষ্ট্রা যস্য প্রবাহণো, বধূমন্তো দ্বির্দশ, মামহে*** প্রভৃতি শব্দসমূহের ক্ষেত্রে আমি যে অর্থ পড়েছি তা হলো, "'মামহে' মানে একজন প্রশংসিত ঋষি, যার কথা বেদের বহুস্থানে উল্লেখ রয়েছে এবং তিনি ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি উটে আরোহণ করবেন। যেহেতু এখানে উটের কথা বলা হয়েছে, তার মানে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমিতে জন্মগ্রহণ করবেন। কল্কিও নাকি উটের রথে আরোহণ করবেন। তাই তিনিই হলেন কল্কি, যিনি ইতোমধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছেন।"

❍ 'উষ্ট্রা যস্য প্রবাহণো'–কল্কি উষ্ট্রারোহী নন, অশ্বারোহী

দেবব্রতঃ এ সুক্তে উটের প্রসঙ্গ রয়েছে। কিন্তু সেই উটকে নিয়ে আপনি গেলেন পৃথিবীর মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমিতে। কিন্তু মরুভূমি আর উট তো ভারতের রাজস্থানেও রয়েছে। তাহলে সেই উটকে মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমিতে টেনে নিয়ে যাবেন কোন যুক্তিতে। এই মরুভূমিতো ভারতেও হতে পারে।

যাহোক, এ শ্লোকের অপব্যাখ্যা করে বলা হয়, ব্রাহ্মণপুত্র কল্কি নাকি উষ্ট্রারোহী অর্থাৎ উটে আরোহণ করবেন। আবার, এও বলা হয়, এখানে উটের রথ নাকি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কী হাস্যকর ব্যাপার! আবার, মনুসংহিতার (১১.২০২) উদ্ধৃতি দিয়ে তারাই বলে, ব্রাহ্মণদের উটে আরোহণ নিষিদ্ধ। আর এর দ্বারা তারা বলতে চায় যে, কল্কি ভারতবর্ষের বাইরে কোনো ম্লেচ্ছরূপে জন্মগ্রহণ করবে। অথচ, সমস্ত শাস্ত্র অনুসারে কল্কি ব্রাহ্মণপুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন। শুধু তাই নয় মহাভারতে (বনপর্ব, ১৬১.১০২) কল্কিকে *দ্বিজোত্তমান্* বলা হয়েছে। অর্থাৎ, কল্কি হবেন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ।

তাই তাদেরই উদ্ধৃত শাস্ত্রবচন অনুসারে, ব্রাহ্মণপুত্ররূপে কল্কি উটে আরোহণ করবেন না। তাছাড়া, শাস্ত্রে কোথাও বিশেষত কল্কিপুরাণে কল্কি অবতারকে উষ্ট্রারোহী বলা হয়নি; বরং তিনি যে অশ্বারোহী হবেন তা সর্বশাস্ত্র স্বীকৃত। সুতরাং, উষ্ট্রারোহী কোনো ম্লেচ্ছব্যক্তি কখনোই দিব্য অশ্বারোহী ব্রাহ্মণকল্কি হতে পারে না।

❍ 'বধূমন্তো দ্বির্দশ'-এর প্রকৃত অর্থ

দেবব্রত: কেউ কেউ কুন্তাপ সুক্তে ব্যবহৃত ***বধূমন্তো দ্বির্দশ*** শব্দগুলোর বিশ্লেষণে *'দ্বির্দশ'* শব্দের অর্থ করে থাকেন দ্বাদশ। আর *'বধূ'* অর্থে পত্নী। তাই তারা বলে থাকে, নরাশংসের দ্বাদশ পত্নী। যদিও ইতোমধ্যে দেখেছি যে, এখানে নরাশংস বলতে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে বোঝায় না। তথাপি, এই সূত্র ধরে কেউ কেউ অন্য কাউকে কল্কি অবতার বলে থাকেন। এবার আমরা কুন্তাপ সুক্তে ব্যবহৃত এ ***বধূমন্তো দ্বির্দশ*** শব্দগুলো বিশ্লেষণ করব।

আমরা দেখলাম যে, এই মন্ত্রে *উষ্ট্রাঃ* বলতে পুরুষ উট, আর *বধূমন্তঃ* বলতে স্ত্রী উট নিয়ে বোঝানো হয়েছে এবং *'দ্বির্দশ'* শব্দে দুই বার দশ অর্থাৎ বিশ। তাছাড়া, ১২-কে সংস্কৃতে দ্বাদশ বলা হয়, দ্বির্দশ নয়। সুতরাং, এখানে ১২ জন পত্নীর কোনো প্রসঙ্গই নেই। তাছাড়া, কল্কির পত্নী দু'জন– রমা ও পদ্মা। এমনকি কারো দ্বিপত্নী হলেও যদি কল্কিপত্নীদ্বয়ের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাদের বৈশিষ্ট্য শতভাগ সাদৃশ্যপূর্ণ না হয়, তবে তিনি কল্কি নন, যে বিষয়ে ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। তাহলে দুইয়ের অধিক পত্নীগ্রহণকারী কেউ যে কল্কি নন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

❍ 'মামহ' কোনো ঋষি নন

সৌরভ: স্যার, আমি দেখেছি, কল্কি সম্পর্কে অপব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেউ কেউ বলে, এ সুক্তের ২য় মন্ত্রে নরাশংসকেই 'মামহ' ঋষি বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তারা ঋগ্‌বেদ সংহিতার একটি মন্ত্রের কথা উল্লেখ করে–

তন্নো মিত্র বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥

– ঋগ্‌বেদ সংহিতা, মণ্ডল ১, সুক্ত ৯৪-১১৫

দেবব্রত: আপনি কি এ মন্ত্রের অর্থ কখনো সরাসরি বেদ থেকে পড়েছেন?

সৌরভ: না তো!

[দেবব্রত বাবু সেলফ্ থেকে ঋগ্‌বেদ সংহিতা হাতে নিলেন।]

দেবব্রত: দেখুন, এ মন্ত্রে কী বলা হয়েছে–

"হে মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যৌ, আমাদের রক্ষা করুন [অন্যত্র, পূজা গ্রহণ করুন (সামবেদ, আরণ্যক কাণ্ড, ১ম খণ্ড, মন্ত্র ৫৯০ (৫)]।"

এখানে *মামহন্তামদিতিঃ* শব্দ বিশ্লেষণ করলে যা দাঁড়ায়– মাম্+অহন্তাম্+অদিতিঃ।

এখানে 'মাম্' সর্বনামপদ, 'অহন্তাম্' ক্রিয়াপদ এবং 'অদিতি' বিশেষ্য পদ। এখানে 'মামহ' শব্দের কোনো অস্তিত্বই নেই। যদি তাদের মতানুযায়ী *মামহন্তামদিতিঃ* শব্দ বিশ্লেষষ করা হয়, তবে তা হবে– মামহ+ন্তাম্+অদিতি। কিন্তু *'ন্তাম্'* বলে কোনো শব্দের অস্তিত্ব অভিধানে নেই। অর্থাৎ, উপর্যুক্ত মন্ত্রে মামহে শব্দে *'মামহ ঋষি'*'র প্রয়োগ কেবলই মিথ্যাচার।

আবার, কুন্তাপ সুক্তে কোথায় 'মামহ' নামে কোনো ঋষির কথা ব্যক্ত হয়নি। এমনকি বেদের কেবল একজন অনুবাদক ব্যতীত কেউই 'মামহে' শব্দটিকে বিশেষ্যরূপে অনুবাদ করেননি। কারণ, প্রকৃত অর্থে, এ সুক্তে ব্যবহৃত 'মামহে', একটি ক্রিয়াপদ, যার অর্থ হলো 'দান করা'। যেমন:

অনস্বন্তাসৎপতির্মামহে মে গাবা চেতিষ্ঠো অসুরো মঘোনঃ।

ত্রৈবৃষ্ণো অগ্নে দশভিঃ সহস্রৈর্বৈশ্বানর ত্র্যরুণশ্চিকেত ॥

– *ঋগ্‌বেদ সংহিতা, মণ্ডল ৫, সুক্ত ২৭, মন্ত্র ১*

অর্থাৎ "হে মানবগণের অধিনায়ক বৈশ্বানর, সাধুগণের রক্ষক, জ্ঞানবান, অসুর এবং ধনবান, ত্রৈবৃষ্ণের পুত্র ত্র্যরুণ নামক রাজর্ষি, আমাকে শকটসংযুক্ত গোদ্বয় এবং দশ সহস্র সুবর্ণ **প্রদান করে** খ্যাতিলাভ করেছেন।" আবার, কুন্তাপ সুক্তে দেখুন–

এষ ইষায় মামহে শতং নিষ্কান্ দশ স্রজঃ।

ত্রীণি শতান্যর্বতাং সহস্রা দশ গোনাম্ ॥৩॥

অথর্ববেদ সংহিতা, কাণ্ড ২০, অনুবাক ৯, সুক্ত ৩১, মন্ত্র ৩

এ দুটি মন্ত্রে 'মামহে' ভিন্ন আর কোনো ক্রিয়াপদ নেই। যদি মামহে-কে বিশেষ্যরূপে ধরা হয়, তবে এ বাক্যটি অশুদ্ধ হবে। ভগবানের শক্ত্যাবিষ্ট মহর্ষি বেদব্যাস নিশ্চয়ই এত বড় ভুল করবেন না।

সুতরাং, সার্বিক বিচারে প্রমাণিত হয় যে, মামহ নামে কোনো ঋষির কথা বেদে উল্লেখ নেই। তবে, এ কল্পিত মামহ ঋষি কীভাবে কল্কি হতে পারে? এমন ভিত্তিহীন দর্শনের দ্বারা বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনো প্রভাবিত হন না।

দেবব্রত: যাহোক, এতটুকু আলোচনায় আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, এই সুক্তে কল্কি অবতারের কোনো প্রসঙ্গ নেই। তাই আর অধিক বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। তবু আপনারা সবগুলো মন্ত্র ও অনুবাদ জেনে নিন, তাতে করে এ সম্পর্কে আপনাদের ধারণা আরো স্পষ্ট হবে।

বচ্যস্ব রেভ বচ্যস্ব বৃক্ষে ন পক্বে শকুনঃ।

নষ্টে জিহ্বা চর্চরীতি ক্ষুরো ন ভুরিজোরিব ॥৪॥

প্র রেভাসো মনীষা বৃষা গাব ইবেরতে।

অমোতপুত্রকা এষামমোত গা ইবাসতে ॥৫॥
প্র রেভ ধীং ভরস্ব গোবিন্দং বসুবিদম্।
দেবত্রেমাং বাচং শ্রীণীহীষুর্নাবীরস্তারম্ ॥৬॥
রাজ্ঞো বিশ্বজনীনস্য যো দেবোহমর্ত্যাঁ অতি।
বৈশ্বানরস্য সুষ্টুতিমা সুনোতা পরিক্ষিতঃ ॥৭॥
পরিচ্ছিন্নঃ ক্ষেমমকরোৎ তম আসনমাচরন্।
কুলায়ন্ কৃণ্বন্ কৌরব্যঃ পরির্বদতি জায়য়া ॥৮॥
কতরৎ ত আ হরাণি দধি মন্থাং পরি শ্রুতম্।
জায়াঃ পতিং বি পৃচ্ছতি রাষ্ট্রে রাজ্ঞঃ পরিক্ষিতঃ ॥৯॥
অভীবস্বঃ প্র জিহীতে যবঃ পক্কঃ পথো বিলম্।
জনঃ স ভদ্রমেধতি রাষ্ট্রে রাজ্ঞঃ পরিক্ষিতঃ ॥১০॥
ইন্দ্রঃ কারুমবুবুধদুত্তিষ্ঠ বি চরা জনম্।
মমেদুগ্রস্যচর্কৃধি সর্ব ইৎ তে পৃণাদরি ॥ (১১)
ইহ গাবঃ প্রজায়ধ্বমিহাশ্বা ইহ পুরুষাঃ।
ইহো সহস্রদক্ষিণোহপি পূষা নি ষীদতি ॥১২॥
নেমা ইন্দ্র গাবো রিষন্ মো আসাং গোপরীরিষৎ।
মাসামমিত্রয়ুর্জন ইন্দ্র মা স্তেন ঈশত ॥ (১৩)

হে বিদ্বানগণ, সর্বদা সদুপদেশ প্রদান করুন। আদর্শ গৃহস্থ স্ত্রী-পুরুষ যেভাবে তাদের সন্তানদের সদুপদেশ দিয়ে প্রসন্ন হন, যেভাবে ফলবতী বৃক্ষের উপর পাখি, তেমনি সদুপদেশ/ধর্মের বাণীর মাধ্যমে জীবনের সকল ক্লেশ দূর করা সম্ভব; ঠিক যেভাবে নাপিত ক্ষুর দ্বারা চুল ছাটাই করেন ॥৪॥ যেভাবে বলবানের বল বৃদ্ধি পায়, তেমনি বিদ্বান মনুষ্যগণ বাধাবিঘ্ন থেকে মুক্ত হয়ে বুদ্ধিকে প্রসারিত করেন। আর তাদের যোগ্য উত্তরসূরী পুরুষ/সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষা বা বিদ্যা দিয়ে পৃথিবীর/ভূমির সেবক করে গড়ে তুলবে ॥৫॥ হে মনুষ্যগণ, তোমরা বিদ্বানদের সঙ্গে বসে নিশ্চিত করো, কীরূপে রাষ্ট্র ও সম্পদ অর্জনে সফল হতে হবে। সেভাবেই তা স্থির করো, যেভাবে দক্ষ তীরন্দাজ লক্ষ্য ভেদ করেন ॥৬॥ সকলের মধ্যে অন্যতম, সবার নেতা/বীর, যিনি ঐশ্বর্যশালী এবং সকলের/সর্বজীবের হিতাকাঙ্ক্ষী, সেই পুরুষের (রাজার) থেকে সব মানুষ উত্তম গুণগুলো গ্রহণ করো ॥৭॥ যিনি অন্ধকার দূর করে ন্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রজাদের মধ্যে আনন্দের বিস্তার ঘটান, সেই ন্যায়কারী প্রজাপালক রাজার গুণগান গৃহস্বামীগণ তাদের স্ত্রীদের সাথে করে থাকেন ॥৮॥ ন্যায়কারী রাজার রাজ্যে দুগ্ধ, দধি, মাখন, ঘৃত আদি সকল বস্তু বিপুল পরিমাণে

পেয়ে প্রজাগণ সুখী হন ॥৯॥ রাজার সুব্যবস্থায় কৃষাণ আর সমৃদ্ধ সকলেই ফসল পাকার পর একত্রে সংগ্রহ করে খোরাক পূরণ করে এবং যথাসময়ে কাজে লাগিয়ে খুশি হয় ॥১০॥ ঐশ্বর্যশালী রাজার উদ্যোগে কর্মীরা উদ্যোগী হয়ে ওঠে, আর দেশপ্রেমিক হয়ে প্রজাগণের শত্রু চোর আদিকে দাস করে ॥১১॥ উত্তম চরিত্রবান রাজার সব্যবস্থাপনার সহায়তায় গৃহস্থরা তাদের গাভী, ঘোড়া আর মানুষদের বাড়িয়ে পারস্পরিক উপকার করে ॥১২॥ প্রতাপী রাজা চোর-ডাকাত আদি শত্রুদের হাত থেকে জমি আর ভূমি রক্ষা করবে এবং প্রজাপালন করবে ॥১৩॥

সৌরভঃ দেখেছ আবির, যদিও এই সুক্তে কল্কি অবতারের কোনো প্রসঙ্গই নেই, তবুও মানুষ কীভাবে এর অপব্যাখ্যা করে সাধারণ লোকদের বিভ্রান্ত করছে!

আবিরঃ তুমি ঠিকই বলেছ সৌরভ। তবে, এ প্রসঙ্গে স্যারকে আমি আরেকটি বিষয় বলতে চাই। তা হলো, যদিও আমরা দেখলাম যে, কতিপয় লোকের কথিত নরাশংস বা মামহ নামে কোনো ঋষি নেই এবং তারা কল্কি অবতার হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, তথাপি সেই বইটিতে বেদ থেকে বহু রেফারেন্স দেয়া হয়েছে, যেখানে নরাশংস ও মামহের কথা উল্লেখ রয়েছে। এই বিষয়ে আপনি কী বলবেন?

দেবব্রতঃ আবির, আমরা এইমাত্র প্রমাণ পেলাম যে, নরাশংস একটি গুণবাচক শব্দ। যার অর্থ প্রশংসিত। আর মামহে একটি ক্রিয়াপদ, যার অর্থ হলো দান করা। সুতরাং, এই শব্দগুলো বেদে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ থাকতেই পারে। ঠিক যেমন শ্রেষ্ঠ, উত্তম, দয়া করা ইত্যাদি শব্দ রয়েছে। একটি বইয়ে বহুস্থানে এই শব্দগুলোর উল্লেখ থাকার অর্থ এই নয় যে, তা দ্বারা একক কোনো ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে। আর তথাকথিত কল্কি তো দূরের কথা; বেদে বা বৈদিক শাস্ত্রে আপনি নরাশংস বা মামহের বিষয়ে যেসব রেফারেন্সের কথা বললেন, সে রেফারেন্সগুলো যাচাই করলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে, সেখানে কোথাও কল্কি অবতারের কোনো প্রসঙ্গই নেই। সাধারণ মানুষ এসব বিচার না করেই গড্ডালিকা প্রবাহে মিথ্যার পেছনে ছুটছে। তার একটি কারণ হলো বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র অধিকাংশ মানুষের কাছেই নেই। কিন্তু আপনারা শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও মেধাবী তরুণ। আপনাদের কখনোই এসব মিথ্যা আর অপপ্রচারের দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়।

তাছাড়া, এজগতে সাধারণ কোনো প্রতিভাধর ব্যক্তিও নিজেকে গোপন রাখতে পারেন না। মিডিয়ার যুগে তা প্রায় অসম্ভব। আর কল্কি অবতার যেসমস্ত কার্য সাধনের জন্য এ জগতে আবির্ভূত হবেন তা নিশ্চয়ই গবেষণা করে খোঁজার প্রয়োজন হবে না, বরং তখন পৃথিবীতে দুই শ্রেণির ব্যক্তি যারা সাধু ও সদ্গুণসম্পন্ন, তারা

কল্কি অবতারের স্তুতি ও বন্দনা কীর্তন করবেন; আর অসাধুরা প্রাণভয়ে পলায়ন করবে। তাই কল্কি অবতার এসেছেন– এ সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই; এমনিতেই তার আবির্ভাব বার্তা সমস্ত জগতে প্রতিধ্বনিত হবে। এবার একটা গল্প বলছি শুনুন–

সত্য যখন প্রতারণার শিকার

এক গ্রামে এক সহজ সরল কৃষক ছিল। তার একটি ছাগল ছিল। একদিন সে তার ছাগলটিকে কাঁধে নিয়ে হাটে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনজন প্রতারক কৃষকের কাছ থেকে ছাগলটি হাতিয়ে নেয়ার ফন্দি আঁটল। তারা যেকোনোভাবে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে লোকটিকে বোকা বানিয়ে তার কাছ থেকে ছাগলটি নেয়ার জন্য পরিকল্পনা করতে লাগল। তারপর তিন প্রতারক পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে ছাগলবহনকারী সরল কৃষকের পথিমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকল।

কৃষকটি যখন একটি নির্জন স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন প্রথম প্রতারক এসে তাকে বলল–"হায়! হায়! আপনি এ কী করছেন? আপনি একটি কুকুরকে কাঁধে নিয়ে যাচ্ছেন? কৃষকটি তার কথার প্রতিবাদ করে বলল, আরে আপনি কী বলছেন? দেখতে পাচ্ছেন না, এটা কুকুর নয়, এটা ছাগল। তখন প্রতারকটি বলল, "ক্ষমা করবেন, আপনার বিশ্বাস হোক আর না-ই হোক, আমি যা দেখছি তা-ই বললাম।" লোকটির কথায় বিরক্ত হয়ে কৃষকটি সামনে হাঁটতে শুরু করল।

কিছুদূর যাওয়ার পর, দ্বিতীয় প্রতারক কৃষকটির পথে এসে বলল, "এ কী করছেন! আপনি একটি মৃত বাছুরকে কাঁধে নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?" কৃষক উত্তর দিল, "আরে মশাই, আপনার কি চোখ নেই? এটা মৃত বাছুর নয়, ছাগল।" প্রতারকটি বলল, "ক্ষমা করবেন। বিশ্বাস, অবিশ্বাস আপনার ব্যাপার; আমি চোখে যা দেখছি, তা-ই বলছি।" কৃষকটি আবার হাঁটতে শুরু করল।

পথ চলতে চলতে কিছুক্ষণ পর তৃতীয় প্রতারক এসে কৃষকটিকে বলল, "ও দাদা, আপনার মাথা ঠিক আছে তো? আপনি একটি গাধাকে কাঁধে চড়িয়ে নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?" এবার কৃষক সত্যিই অবাক হলো। সে এখন তার নিজের ওপরই অবিশ্বাস করতে লাগল। "আসলে আমি কী নিয়ে যাচ্ছি? তিনজনই ভিন্ন ভিন্ন মন্তব্য করছে। তাহলে নিশ্চয়ই এটি ছাগল নয়, এটি ভূতও হতে পারে। তাই এটি একেক

ব্যক্তির কাছে একেক রূপ নিচ্ছে।" তখন কৃষকটি ভয় পেয়ে কাঁধের ছাগলটি ভূমিতে রেখে ভো দৌড় দিল। আর তিন প্রতারক মিলে ছাগলটা নিয়ে চলে গেল।

এই গল্প থেকে আমরা কী শিক্ষা পেলাম? আসলে বর্তমান সমাজে জনসাধারণের অবস্থাটাও এরকম কৃষকের মতো। কতিপয় ব্যক্তি যাকে তাকে কল্কি অবতার বলে জনসাধারণের সাথে প্রতারণা করছে। আর সাধারণ জনতা এর সত্যতা যাচাই না করেই নিজের সত্য বিশ্বাসকে জলাঞ্জলি দিতে যাচ্ছে। তাই যার-তার কথায় কান দেয়ার পূর্বে আমাদের বিশ্বাসের সত্যতা পরীক্ষা করে নেয়া উচিত এবং সাধারণের মাঝে যত সম্ভব এই সত্য প্রচার করা উচিত।

তাই, কোনোরকম প্ররোচনার শিকার না হয়ে শাস্ত্র ও উপযুক্ত ব্যক্তির বাক্যকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করলেই সকল সংশয়ের নির্মূল সম্ভব। তাই সুধীবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, কল্কি অবতার যে এখনো পৃথিবীতে আবির্ভূত হননি, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বরং, বর্তমানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত সংকীর্তন আন্দোলন বিশ্বে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন নামে এক পারমার্থিক আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরই কর্তব্য মহাপ্রভুর এ সংকীর্তন আন্দোলনে যোগ দিয়ে কল্কি অবতার আসার পূর্বেই ভগবদ্ধামে ভগবানের নিত্যদাস হিসেবে প্রত্যাবর্তন করা।

আবির: আপনার আলোচনা শুনে আমি এক গভীর অন্ধকার থেকে মুক্তি পেলাম। না জানি আমার মতো আরো কত যুবক-যুবতী এই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বানোয়াট মিথ্যা অপপ্রচারের দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে। ভাবতেই অবাক লাগে, এমন এক ধ্রুব সত্যকে প্রতারকরা মিথ্যার আবরণে আবৃত করতে চাচ্ছে। অথচ আপনার সাথে আলোচনায় জানতে পারলাম, কল্কি অবতার সম্বন্ধে প্রতারকরা যা প্রচার করছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যাচার। আপনার সাথে কথা না হলে আমিও হয়ত তাদেরই দলে নাম লিখাতাম। আপনার মূল্যবান সময় দিয়ে আমাকে সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

দেবব্রত: আপনাকেও ধন্যবাদ। আসুন আমরা কল্কি অবতার সংক্রান্ত এসমস্ত তথ্য সকলের মাঝে প্রচারের মাধ্যমে মিথ্যাচাররূপ অন্ধকার দূরীভূত করে সত্যের আলো প্রজ্জ্বলন করি।

অধ্যায়

৫

কল্কি সম্পর্কে প্রতারণা করতে যে তথ্যগুলো আড়াল করা হয়

ধর্মের নামে প্রতারণা করে সাধারণ লোকদের বোকা বানিয়ে কলির ফাঁদে ফেলতে আজকাল কতিপয় ধর্মপ্রচারকদের দ্বারা কল্কি সম্পর্কিত অনেক তথ্যই প্রচার করা হয় না; হয়ত সেগুলোর বিকৃত অর্থ তারা এখনো আবিষ্কার করতে পারেনি, তাই। সুতরাং, এর পূর্বেই ধর্মসচেতন ব্যক্তিদের এ সকল সত্য জানা প্রয়োজন, যেন দিগ্‌ভ্রান্ত হওয়ার পূর্বেই সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া যায়।

- কল্কির স্ত্রীর নাম– রমা ও পদ্মা (ক.পু. ৩.১৬.৫)
- পদ্মার পিতামাতার নাম–বৃহদ্রথ ও কৌমুদী (ক.পু. ১.৫.১-২, ২.৬.৯)
- শিবের নিকট থেকে পদ্মার বরপ্রাপ্তি–পদ্মার প্রতি কামনাযুক্ত দৃষ্টিপাতকারী পুরুষের স্ত্রী দেহ প্রাপ্তি (ক.পু. ১.৪.৪০,৪১; ২.১.২৯,৩০)
- পদ্মার আটজন প্রধান সখীর নাম–বিমলা, মালিনী, লোলা, কমলা, কামকন্দলা, বিলাসীনী, চারুমতি ও কুমুদা (ক.পু.২.২.১১)।
- পদ্মা পদ্মমালা বিভূষিতা ও পদ্মগন্ধা (ক.পু. ১.৬.১৭, ১৯)
- পদ্মার পদ্মপত্রের শয্যায় শয়ন (ক.পু. ২.২.৪)
- পদ্মার স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজাদের নাম–১.৫.১১-১৩
- শিবিকাতে (পালকীতে) আরোহণ–২.২.১৩
- বাদ্য ও নৃত্যের প্রচলন– ২.২.১৮, ৩.১৬.১২, ৩.১৬.১৪
- কল্কির জ্যেষ্ঠ তিন ভ্রাতার নাম– কবি, প্রাজ্ঞ ও সুমন্ত্র (ক.পু. ১.২.৩১)
- কল্কিপত্নী পদ্মার দুই পুত্র– জয় ও বিজয় ২.৬.৩৬
- কল্কির দ্বিতীয় পত্নী রমার দুই পুত্র– মেঘমাল ও বলাহক (৩.১৭.৪৪)
- অন্যান্য স্বগোত্রীয় ভ্রাতা ও বিশাখযূপাদি নৃপতিদের নাম (ক.পু. ১.২.৩২, ৩৩)
- মাহিষ্মতি রাজ্যের নাম (ক.পু. ১.৩.৩৩)

- মহামতি নামক রাজা– ৩.১৪.২১
- চতুর্ভুজরূপে কল্কির আবির্ভাব ও তিরোভাব (ক.পু. ১.২.১৯, ৩.১৯.২১)
- কল্কির আবির্ভাবের পরপরই গঙ্গাজল দ্বারা স্নান– ১.২.১৬
- গাত্রবর্ণ (নীল মেঘের ন্যায়)– ২.২.২১; ৩.১৮.১৩; ৩.১৯.৪,
- নানাবিধ অলংকার ধারণ– (ক.পু. ২.২.২০)
- শ্রীবৎস চিহ্নযুক্ত – (ক.পু. ২.২.২১)
- জাতকরণাদি দশবিধ সংস্কার (ক.পু. ১.২.২৯)
- উপনয়ন বা পৈতাধারণ (ক.পু. ১.২.৩৫)
- তিলক ধারণাদি ব্রাহ্মণ্যকর্ম (ক.পু. ১.৪.১৮)
- ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী মন্ত্র জপ (ক.পু. ১.২.৪২)
- কল্কির গুরুকুলে বাস (ক.পু. ১.৩.১)
- ভৃগুবংশীয় জমদগ্নি মুনির পুত্র ভগবান পরশুরামের নিকট বেদ অধ্যয়ন (ক.পু. ১.৩.৬)
- শিবের নিকট থেকে শুকপাখি প্রাপ্তি (ক.পু. ১.৩.২৫)
- শম্ভল গ্রামের আয়তনসহ বিস্তারিত বর্ণনা (ক.পু. ২.৬.২০)
- দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা কর্তৃক শম্ভল নগর নির্মাণ (ক.পু. ২.৬.১-৭)
- শম্ভল গ্রামে স্থিত ৬৮টি তীর্থ (ক.পু. ৩.১৮.৪)
- সাগর বেষ্টিত মনোরম সিংহলদ্বীপের বর্ণনা– (ক.পু. ৩.৪.৩১-৩৪, ২.১.৪০-৪৬)
- কল্কির সাগরজলে অবগাহন ও সমুদ্রপার – (ক.পু. ২.৬.১৩-১৪)
- যুদ্ধের বর্ণনা
- যুদ্ধে ব্যবহৃত গদাসহ বিভিন্ন দিব্য অস্ত্র (ক.পু. ২.৭.৮, ২১)
- দেবাপি ও মরুর নাম
- চার পুত্রের হাতে রাজ্যভার অর্পণ (ক.পু. ৩.১৯.১৪)
- পরিবার, পুত্রগণ– ২.৬.৩৩-৩৬
- পদ্মাও অপৌগণ্ড, বাল্য ও কৈশোরে শিবপূজা করেছিলেন (ক.পু. ১.৬.৩০)
- চন্দ্রবংশীয় ও সূর্যবংশীয় দেবাপি ও মরুকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতকরণ– (ক.পু. ১.৩.৪৪)
- সিংহল দ্বীপে গমন
- নানাবিধ আকাশযান সমন্বিত সিংহল (ক.পু. ২.১.৪০)
- বৃহদ্রথ কর্তৃক কল্কিকে গজ, অশ্ব, রথ, দাসী দান ২.৬.১০
- বিশাখযুপ রাজার প্রতি কৃপা
- সৈন্য ও বাহনগণের সহিত কল্কির সমুদ্র পার (ক.পু. ২.৬.১৪)
- যুদ্ধের সাজসজ্জার বর্ণনা (ক.পু. ২.৬.৪৪-৪৫)
- যুদ্ধে সহস্র সহস্র কোটি কোটি মানুষের প্রাণনাশ (ক.পু. ৩.৮.৩১, ২.৬.৪৯)
- কল্কির অযোধ্যা, হস্তিনাপুর, বারাণাবত গমন, মথুরা নগরীতে অবস্থান (ক.পু. ৩.৪.২৬, ৩.১৪.২৩-২৫)
- কল্কির সহস্রবর্ষ সম্ভলে অবস্থান (ক.পু. ৩.১৮.২)

- কল্কিকর্তৃক অশ্বমেধ ও বিশেষত রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন (৩.১৬.৭)।
- কল্কিকৃত যজ্ঞানুষ্ঠানে অগ্নিদেব পাচক, বরুণদেব জলদানকারী এবং পবনদেব পরিবেশনকর্তা–ক.পু. ৩.১৬.১১
- যজ্ঞানুষ্ঠানে গন্ধর্বের অংশগ্রহণ (ক.পু. ৩.১৬.১৪)
- কল্কি কর্তৃক ব্রাহ্মণ ও সুপাত্রে অর্থাদি দান (ক.পু. ৩.১৬.১৪)
- কল্কির গঙ্গাতীরে অবস্থান (ক.পু. ৩.১৬.১৪)
- বিষ্ণুযশার সভাগৃহে তুম্বুরু ও দেবর্ষি নারদের আগমন (৩.১৬.১৬)
- নানা কুসুমসমূহসঙ্কুল বনোপবনসমূহ শোভিত সম্ভল গ্রাম (ক.পু. ৩.১৮.৫)
- তিরোধান–চতুর্ভুজ রূপে বৈকুণ্ঠে গমন ও স্ত্রীদের অগ্নিতে প্রবেশ (ক.পু. ৩.১৯.২৬)
- গঙ্গা-যমুনার মধ্যস্থলে কল্কি যজ্ঞানুষ্ঠান করেন (ক.পু. ৩.১৬.৮)
- গঙ্গাতীরে অবস্থান (ক.পু. ৩.১৬.১৪)
- পরশুরামের নির্দেশে কল্কিপত্নী রমার পুত্র কামনায় ৪ বছর রুক্মিণীব্রত পালন এবং হবিষ্যান্ন ভোজন। (ক.পু. ৩/১৭/১,৪২,৪৪)
- বিষ্ণুযশের বদরিকাশ্রমে দেহত্যাগ ও সুমতির মৃতপতীকে আলিঙ্গনপূর্বক অগ্নিতে প্রবেশ। (ক.পু. ৩.১৬.৪৩,৪৪)
- পিতা-মাতার উদ্দেশ্যে কল্কির শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পাদন (ক.পু. ৩.১৬.৪৫)
- কল্কির পত্নীদ্বয় রমা ও পদ্মার অগ্নিতে প্রবিষ্ট হয়ে অন্তর্ধান (ক.পু. ৩.১৯.২৬)
- কল্কি **বর্ণাশ্রম সমন্বিত** সনাতনধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবেন। (ভা. ১২.২.৩৮)
- কল্কি প্রতিষ্ঠিত সত্যযুগের লক্ষণ ও শান্তিপূর্ণ পৃথিবী

কল্কি অবতার

তৃতীয় ভাগ

কল্কি পুরাণ অবলম্বনে

কল্কি অবতারের জীবনগাথা

প্রথমাংশ
অধ্যায়
১

প্রাক-কথা

পরীক্ষিৎ মহারাজের বৈকুণ্ঠ গমনের পর মার্কণ্ডেয় প্রমুখ মুনিগণের প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব গোস্বামী কলির প্রাদুর্ভাব ও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কল্কি অবতার সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, শ্রীসূত গোস্বামী পরবর্তীকালে তা শৌনকাদি ঋষিদের নিকট বর্ণনা করেন। ভগবান কল্কি সম্পর্কিত সে আলোচনাই কল্কিপুরাণরূপে আজ আমাদের মাঝে বিদ্যমান, যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। এ কল্কিপুরাণে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর কলির প্রাদুর্ভাব এবং কলিযুগের অন্তে শ্রীকৃষ্ণের কল্কিরূপে অবতরণের প্রেক্ষাপট, কল্কি অবতারের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তি, বস্তু ও স্থানের নাম, বিবরণ এবং কল্কির রূপ, গুণ, লীলা (কার্যাবলি) ও পরিকরগণসহ সবকিছুর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

বর্তমান সমাজে ভুরি ভুরি ভুঁইফোড় কল্কি অবতারের আবির্ভাব হয়েছে। তাদের মধ্য থেকে প্রকৃত কল্কিদেবকে চিহ্নিত করতে গিয়ে বিভ্রান্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। কল্কিপুরাণে বর্ণিত কল্কিদেবের সঙ্গে তথাকথিত কল্কিদের জীবনী মিলিয়ে নিলে দিগ্‌ভ্রান্তরা সহজেই সঠিক পথের দিশা পাবে; জানতে পারবে যে, প্রকৃতপক্ষে কল্কি এখনো আবির্ভূত হননি। তাই, এ গ্রন্থে কল্কিপুরাণ অবলম্বনে কল্কি অবতারের জীবনী অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন, আমি ভবিষ্য পরমাদ্ভুত উপাখ্যান কীর্তন করছি, শ্রবণ করুন। পূর্বে মহর্ষি নারদের প্রশ্নের উত্তরে তাঁর পিতা ব্রহ্মা তাঁর নিকট ভাগবত কথা বলেছেন। পরে নারদও পরম তেজস্বী ব্যাসের নিকট তা কীর্তন করেন। ব্যাস স্বীয় পুত্র শুকদেবের কাছে এসব বলেছিলেন। শুকদেবও অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিতের সভায় এই আঠারো হাজার শ্লোক সমন্বিত ভাগবত বর্ণন করেন। অনন্তর সপ্তাহ শেষে রাজা পরীক্ষিৎ বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হলে, পুণ্যাশ্রমে মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি মুনিগণের প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব যা বলেছিলেন, আমি

সেখানে তাঁর অনুমতিক্রমে সেগুলো শ্রবণ করেছিলাম। এখন সেই পবিত্র শুভ ভাগবত ভবিষ্য কথা বলছি। আপনারা নিরন্তর সমাহিত মতি হয়ে সেগুলো শ্রবণ করুন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৈকুণ্ঠধামে গমন করলে যে রূপে কলির প্রাদুর্ভাব হয়, তা বলছি।

কলির প্রাদুর্ভাব ও নিবাসস্থল

যখন প্রলয়কালের অবসান হলো, তখন জগৎস্রষ্টা লোকপিতামহ ব্রহ্মা নিজের পৃষ্ঠদেশ হতে ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণ পাতকের সৃষ্টি করলেন। সেই পাতক অধর্ম নামে বিখ্যাত হলো। অধর্মের মনোহারিণী প্রণয়িনীর নাম মিথ্যা। অধর্ম থেকে মিথ্যার গর্ভে একটি পুত্র উৎপন্ন হয়। তার নাম দম্ভ। দম্ভের ভগিনীর নাম মায়া। দম্ভ থেকে মায়ার গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা উৎপন্ন হয়। পুত্রের নাম লোভ ও কন্যার নাম নিকৃতি। লোভ থেকে নিকৃতিতে ক্রোধ নামে একটি পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল। ক্রোধের ভগিনীর নাম হিংসা। হিংসা ক্রোধের সংস্পর্শে একটি পুত্র প্রসব করল। এই পুত্রের নাম কলি।

এই কলি দ্যূতক্রীড়াস্থলে, মদ্যালয়ে, বেশ্যালয়ে ও সুবর্ণস্থানে সর্বদাই অবস্থান করে। [শ্রীমদ্ভাগবত (১/১৭/৩৮) অনুসারে-*অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ। দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্মশ্চতুর্বিধঃ ॥* অর্থাৎ, কলির আবেদন শ্রবণ করে মহারাজ পরীক্ষিত তাকে যেখানে দ্যূত ক্রীড়া, আসব পান, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ এবং পশু হত্যা হয়, সেই সেই স্থানে থাকবার অনুমতি দিলেন।] তার ভগিনীর নাম দুরুক্তি। তার ঔরসে দুরুক্তির গর্ভে একটি পুত্র ও একটি কন্যা উৎপন্ন হয়। পুত্রের নাম ভয় ও কন্যার নাম মৃত্যু। ভয়ের সহবাসে মৃত্যু থেকে নিরয় নামে পুত্র উৎপন্ন হয়েছে। যাতনা নামে নিরয়ের একটি ভগিনী উৎপন্ন হয়। ঐ নিরয় থেকে যাতনার গর্ভে শত শত পুত্র উৎপন্ন হয়েছে।

কল্কির আবির্ভাবপূর্ব পৃথিবী

এই রূপে কলিবংশে অসংখ্য ধর্মনিন্দুকের আবির্ভাব হয়েছে। এরা যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, দান প্রভৃতি ধর্ম-কর্মের লোপ করে এবং বেদ, তন্ত্র প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রের ধ্বংসকরণে সর্বদা যত্নবান থাকে। এরা আধি-ব্যাধি, জরা, গ্লানি, দুঃখ, শোক, ভয় প্রভৃতির আশ্রয়। এরা সকলেই কলি রাজের অনুগত হয়ে লোকদের নাশের নিমিত্ত দলে দলে ভ্রমণ করছে।

ঐসকল মানুষ সর্বদাই কামুক। এরা দম্ভাচার দুরাচার ও পিতৃমাতৃহিংসক। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা বেদবিবর্জিত দীন ও সর্বদা শূদ্র সেবাপরায়ণ। এরা সর্বদা কুতর্ক করে থাকে। এই অধর্মেরা ধর্ম বিক্রয় করে। এরা বেদবিক্রয়ী ব্রাত্য রসবিক্রয়ী। মাংসবিক্রয়ী ক্রুর ও শিশ্নোদরপরায়ণ। এদের সম্বন্ধী ভিন্ন আর কাউকেই বন্ধুভাবে গ্রহণ করে না। নীচ সংসর্গে অবস্থান করতেই এদের সর্বদা অভিরুচি। এরা নিরন্তর বিবাদ কলহেই ক্ষুব্ধ থাকে। কেশসংস্কার, বেশবিন্যাস ও ভূষণধারণেই এদের অভিরুচি।

কলিকালে যাদের ধন আছে তারাই কুলীন বলে মান্য হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ বার্দ্ধুষিক অর্থাৎ টাকার সুদ নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে, তারাই সকলের পূজ্য। এই কলিকালে সন্ন্যাসীরা গৃহে বাস করতে রত থাকে এবং গৃহস্থেরা বিবেচনাশূন্য হবে। এই কলিকালে সকলে গুরু নিন্দা পরায়ণ হবে এবং ধর্মচিহ্ন ধারণপূর্বক সাধুদের বঞ্চনা করবে। এ কালে বরকন্যার পরস্পর স্বীকার মাত্রই বিবাহ সম্পন্ন হবে। সকলে শঠ ব্যক্তির সাথে মিত্রতা ও প্রতিদানকালে বদান্যতা প্রকাশ করবে। কোনো ব্যক্তির অপকার করতে অসমর্থ হলে ক্ষমা প্রকাশ করবে, অক্ষম ব্যক্তির প্রতি বিরাগ প্রকাশে যত্নবান হবে।

এ কলিকালে সকলে পাণ্ডিত্যপ্রকাশের জন্য বাচালতা প্রকাশ করবে এবং যশোলাভের নিমিত্ত ধর্ম সেবা করবে। লোকে ধনাঢ্য হলেই সাধু বলে মান্য হবে এবং দূর দেশস্থিত জলাশয়কেই তীর্থ বলে মান্য করবে। কলিকালে গলায় সূত্র থাকলেই ব্রাহ্মণ বলে পরিগণিত হবে এবং দণ্ড ধারণ করলেই পরিব্রাজক হতে পারবে। কুলকামিনীরা বেশ্যার ন্যায় আলাপাদি করতে যত্নবতী হবে, নিজ নিজ স্বামীর প্রতি তাদের মন থাকবে না। ব্রাহ্মণেরা পরান্নলোলুপ হবেন। তারা চণ্ডালের যাজক হতেও পরাঙ্মুখ হবেন না। স্ত্রীলোক আর বিধবা হবে না (কারণ, তারা তখন বিবাহ ব্যতিরেকেই মৈথুন কার্যে লিপ্ত হবে)। তারা স্বেচ্ছাচারিণী হবে। মেঘ হতে অনিয়মিত বৃষ্টি হবে। বসুমতী অল্পশস্যা হবেন। রাজাগণ প্রজাপীড়ন করবেন। প্রজাবর্গ রাজকরে সাতিশয় প্রপীড়িত হবে। হতভাগ্য প্রজাগণ স্কন্ধে ভার ও হস্তে পুত্রকে ধারণ করে ক্ষুব্ধচিত্তে দুর্গম পর্বত ও ঘোর অরণ্য আশ্রয় করবে। তারা মধু, মাংস ও ফলমূল আহার করে জীবনধারণে প্রবৃত্ত হবে ও সকলেই কৃষ্ণের নিন্দা করতে থাকবে। কলির প্রথম পাদে সকলে এরূপ আচরণ করবে। কলির দ্বিতীয় পাদে লোকে কৃষ্ণ-নাম-বিবর্জিত হবে। তৃতীয় পাদে বর্ণসঙ্কর হতে থাকবে। চতুর্থপাদে সকলে একবর্ণ হবে এবং বিষ্ণুর আরাধনা এককালে বিস্মৃত হয়ে যাবে।

পৃথিবীতে বেদাধ্যয়ন স্বধা, স্বাহা, বৌষট্‌, ওঙ্কার প্রভৃতি রহিত হওয়াতে দেবগণ কাতর হয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। তাঁরা ক্ষীণা দীনা ভগবতী বসুমতীকে অগ্রে নিয়ে ব্রহ্মালোকে গমন করলেন এবং ব্রহ্মাকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করলেন।

কল্কির আবির্ভাব

কল্কির আবির্ভাবের জন্য দেবতাদের প্রার্থনা

সূত গোস্বামী বললেন, তারপর ব্রহ্মার বচনানুসারে দেবগণ সম্মুখে উপবিষ্ট হয়ে যত্নপূর্বক, কলির দোষে যে ধর্ম হানি হচ্ছে, তা নিবেদন করলেন। ব্রহ্মা দুঃখিত দেবগণের বাক্য শ্রবণ করে তাঁদের বললেন– চলো, বিষ্ণুকে প্রসন্ন করে অভীষ্ট সাধন করি। ব্রহ্মা একথা বলে দেবগণ পরিবৃত হয়ে বিষ্ণুলোকে গিয়ে বিষ্ণুর স্তব করে দেবগণের মনোগত ভাব ও প্রার্থনা জানালেন। পুণ্ডরীকাক্ষ বিষ্ণু সেকথা শ্রবণ করে ব্রহ্মাকে বললেন– "আমি তোমার অনুরোধক্রমে শম্ভল-নামক গ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের গৃহে সুমতিনাম্নী ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে আবির্ভূত হব। চার ভ্রাতা মিলে কলিক্ষয় করব। দেবগণ, তোমরা স্ব স্ব অংশে অবতীর্ণ হয়ে আমার সাথে মিত্রতা করবে। এই আমার প্রিয়া কমলনয়না কমলা বৃহদ্রথ-নামক সিংহলেশ্বরের কৌমুদীনাম্নী মহিষীতে জন্মপরিগ্রহ করবেন। তিনি পদ্মা নামে বিখ্যাত হবেন। হে দেবগণ, তোমরা পৃথিবীতে গমনপূর্বক স্ব-স্ব অংশে অবতীর্ণ হও। আমি পুনর্বার মরু ও দেবাপি নামক নৃপদ্বয়কে পৃথিবীর শাসনভার অর্পণ করব। পুনরায় আমি সত্যযুগের সূচনাকরতঃ পূর্বের ন্যায় ধর্ম সংস্থাপন করব এবং কলিরূপে দৃষ্ট ভুজঙ্গকে দূর করে বৈকুণ্ঠে প্রত্যাবর্তন করব।"

কল্কির আবির্ভাব

শ্রীহরির এরূপ বাক্য শ্রবণ করে ব্রহ্মাদি দেবগণ স্ব-স্ব লোকে গমন করলেন। ভগবান পরামাত্মা বিষ্ণু স্বীয় মহিমা দ্বারা মনুষ্যরূপে অবতরণ বিষয়ে কৃতপ্রযত্ন হয়ে শম্ভল গ্রামে প্রবেশ করলেন। পরে বিষ্ণুযশা হতে সুমতির পুণ্যগর্ভে এলেন। গ্রহ, নক্ষত্র, রাশি প্রভৃতি সকলেই ঐ গর্ভস্থ শিশুর পদারবিন্দ সেবা করতে লাগলেন।

জগৎপতি বিষ্ণু যে সময় জন্মপরিগ্রহ করলেন, তখন নদী, সমুদ্র, পর্বত, দেবগণ, ঋষিগণ ও স্থাবর-জঙ্গম সমুদয় লোক হর্ষযুক্ত হলেন। সকল প্রাণীই নানাপ্রকার আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। পিতৃগণ আহ্লাদে নৃত্য করতে আরম্ভ করলেন, দেবগণ পরিতুষ্ট হৃদয়ে বিষ্ণুর যশোগান করতে লাগলেন। গন্ধর্বগণ বাদ্য বাজাতে প্রবৃত্ত হলেন, অপ্সরাগণ নৃত্য করতে লাগলেন। এরপর মাধব মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশী তিথিতে ভগবান বিষ্ণু ধরাধামে আবির্ভূত হলেন।

ভগবান শ্রীবিষ্ণু কল্কিরূপে অবতীর্ণ হলে মহাষষ্ঠী তাঁর ধাত্রী মাতা ও অম্বিকা নাভিচ্ছেত্রী হলেন। সাবিত্রী এসে গঙ্গাজল দ্বারা গাত্রমার্জনপূর্বক তাঁর ক্লেদ অপনয়ন করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাকালে যেরূপ বারিবর্ষণ হয়েছিল, সেরূপ সে অনন্ত বিষ্ণুর কল্কি অবতাররূপে অবতরণকালেও তাঁর নিমিত্ত বসুধা জলরূপসুধা ধারণ করলেন। মাতৃকাগণ মাঙ্গল্য বাক্যে আশীর্বাদ করতে লাগলেন।

ব্রহ্মা দ্রুতগামী পবনদেবকে বললেন, তুমি সূতিকাগারে গমন করে আমার প্রার্থনানুসারে বিষ্ণুর নিকট নিবেদন কর যে, হে নাথ, আপনি বিবেচনা করে দেখুন, আপনার এ **চতুর্ভুজ রূপ** দর্শন করা দেবগণের পক্ষেও দুর্লভ। অতএব, আপনি এই রূপ ত্যাগ করে মনুষ্যের ন্যায় রূপ ধারণ করুন। পবনদেব ব্রহ্মার এ বাক্য শ্রবণ করে দ্রুত বেগে ধাবমান হয়ে তা শিশুরূপী পরমেশ্বর বিষ্ণুর নিকট বললেন। পুণ্ডরীকাক্ষ হরি সেই বাক্য শ্রবণ করে তৎক্ষণাৎ দ্বিভুজ হলেন। তাঁর পিতা-মাতা তা অবলোকন করে বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগলেন। এরপর বিষ্ণুর মায়াক্রমে তাঁর চতুর্ভুজ রূপ দর্শন ভ্রান্তি বলে মনে করলেন। পরে শম্ভল নগরে সকল প্রাণী উৎসব প্রকাশ করতে লাগল। সকলেই পাপ-তাপ বিবর্জিত হয়ে সর্বদা মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হলো।

কল্কির নামকরণ

মাতা সুমতি জগৎপতি জয়শীল বিষ্ণুকে পুত্ররূপে লাভ করে পূর্ণমনোরথা হলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে আহ্বানপূর্বক একশত গো দান করলেন। ব্রাহ্মণ বিষ্ণুযশা হরির কল্যাণ কামনায় শুদ্ধচিত্ত হয়ে ঋক্, যজু ও সামবেদী প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ দ্বারা শিশুর নামকরণে প্রবৃত্ত হলেন। তৎকালে পরশুরাম, কৃপাচার্য, ব্যাসদেব ও অশ্বত্থামা ভিক্ষু শরীর ধারণপূর্বক বালরূপী ভগবান হরিকে দর্শনের নিমিত্ত আগমন করলেন। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুযশা এ চারজন প্রধান ব্যক্তিকে আসতে দেখে পুলকিত হয়ে অভ্যর্থনা ও পূজা করলেন। নানা রূপ ধারণক্ষম রাম, কৃপ প্রভৃতি বিষ্ণুযশা

কর্তৃক পূজিত ও স্ব-স্ব আসনে সুখাসীন হয়ে পিতার ক্রোড়স্থিত হরিকে দর্শন করলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ পরশুরাম প্রমুখ, বালক নরাকার বিষ্ণুকে নমস্কার করে পৃথিবীর পাপরূপ মল অপনোদনের নিমিত্ত আবির্ভূত কল্কি বলে জানতে পারলেন। তাঁরা ঐ বালকের নামকরণ কালে 'কল্কি' এই বিখ্যাত নাম রাখলেন এবং জাতকর্মাদি সংস্কার সম্পাদনপূর্বক প্রহৃষ্ট চিত্তে প্রতিগমন করলেন।

কল্কির ভ্রাতৃবর্গ ও জ্ঞাতিবর্গ

তারপর, শুক্লপক্ষে বর্ধনশীল চন্দ্রের ন্যায়, কল্কিরূপী বিষ্ণু, সুমতি কর্তৃক পরিপালিত হয়ে অল্প কালের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে লাগলেন। কল্কির পূর্বে তাঁর জ্যেষ্ঠ তিন ভ্রাতা জন্মপরিগ্রহ করেন। তাঁদের নাম কবি, প্রাজ্ঞ ও সুমন্ত্র। তাঁরা গুরু ও পিতামাতার প্রিয়কারী ছিলেন। গুরু ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই এঁদের প্রসংশা করতেন। গার্গ্য, ভর্গ্য, বিশাল প্রভৃতি ধর্মতৎপর সাধুগণ অগ্রে তাঁরই গোত্রে জন্মপরিগ্রহ করেন। এঁরা সকলেই কল্কির অংশ ও কল্কির অনুগত। এঁরা বিশাখযূপ নামক ভূপাল কর্তৃক প্রতিপালিত। এ সকল ব্রাহ্মণ কল্কিকে দেখে সন্তাপ রহিত ও পরম প্রীতিযুক্ত হলেন।

পিতার কাছে ব্রাহ্মণ-সংস্কৃতির জ্ঞান লাভ

এরপর বিষ্ণুযশা, ধীর, সর্বগুণাকর, কমললোচন কুমার কল্কিকে বিদ্যাশিক্ষার উপযুক্ত দেখে বললেন– বৎস, এখন তোমার উপনয়নরূপ ব্রহ্মসংস্কার সম্পাদন করে গায়ত্রী উপদেশ দেব, পরে বেদ অধ্যয়ন করবে।

কল্কি বললেন– পিতা, বেদ কাকে বলে? গায়ত্রীই বা কী? কীরূপ সূত্র দ্বারা সংস্কৃত হলে ব্রাহ্মণ বলে বিখ্যাত হতে পারা যায়? তা আমাকে বলুন।

পিতা বললেন– বৎস, বিষ্ণুর বাক্যই বেদ। সাবিত্রী বেদমাতা বলে বিখ্যাত আছেন। ত্রিগুণিত সূত্রে গ্রন্থি দিয়ে তিন গুণ করলে উপবীত হয়। ব্রাহ্মণেরা এই উপবীত ধারণপূর্বক প্রতিষ্ঠাভাজন হয়ে থাকেন। যাঁরা দশ যজ্ঞ দ্বারা সংস্কৃত, তাঁরাই ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মবাদী। এঁরা ত্রিলোকের মঙ্গলের জন্য বেদ রক্ষা করেন। ঐ ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপস্যা, বেদপাঠ ও ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা বেদ ও তন্ত্রের বিধানানুসারে ভক্তিপূর্বক হরিকে প্রীত করেন।

এজন্য আমি শুভদিন দেখে বন্ধুবান্ধব ব্রাহ্মণগণের সাথে সমবেত হয়ে তোমার উপনয়ন সংস্কার করতে ইচ্ছা করি।

পুত্র বললেন– ব্রাহ্মণেরা যে দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হন, সেই দশ সংস্কার কী? ব্রাহ্মণেরা কীরূপেই বা যথাবিধানে বিষ্ণুর অর্চনা করেন?

পিতা বললেন, যিনি ব্রাহ্মণ হতে ব্রাহ্মণীগর্ভে জন্মপরিগ্রহ করে গর্ভাধান প্রভৃতি দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হবেন, যিনি ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ ও পূজা করবেন, যিনি তপস্বী, সত্যবাদী, ধীর ও ধর্মাত্মা হন, তিনি বিষ্ণু পূজার প্রকরণ জ্ঞাত হয়ে সর্বদা আনন্দময় থাকেন ও সংসার সাগর হতে পরিত্রাণ করেন।

পুত্র বললেন– যিনি সাধু পথে থেকে বিষ্ণুকে প্রীত করেন, যিনি লোকত্রয়ের কামধুক্, যিনি অখিল জগৎ উদ্ধার করেন– এমন ব্রাহ্মণ কোথায় আছেন?

পিতা বললেন– যাঁরা ধর্মশীল ব্রাহ্মণ, তাঁরা ব্রাহ্মণদ্বেষী ধর্মঘাতক বলবান কলি কর্তৃক নিরাকৃত হয়ে বর্ষান্তরে গমন করেছেন (ভারতবর্ষ ত্যাগ করেছেন)। যাঁদের অল্প তপস্যা, তাদের মতো ব্রাহ্মণেরা কলিযুগের অধিকারের মধ্যে আছেন বটে, কিন্তু তাঁরা শিশ্নোদরপরায়ণ, অধর্মনিরত, বৈদিক-ক্রিয়াকলাপ বিবর্জিত, পাপাত্মা, দুরাচারী, তেজহীন ও শূদ্রসেবক হয়েছেন। তাঁরা কলির প্রভাবে আত্মরক্ষা করতেও সমর্থ নয়।

কলি-কুল ধ্বংসের জন্য যাঁর আন্তরিক ইচ্ছা, তাঁর মতো সাধুনাথ কল্কি, এরূপ পিতৃ বাক্য শ্রবণ করে পিতা ও ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক পঠিত মন্ত্রে উপনীত হয়ে গুরুকুলে বাস করতে গমন করলেন।

গুরুকুলে বাস ও পরশুরামের কাছে বেদ অধ্যয়ন

সূত গোস্বামী বললেন– তারপর কল্কি গুরুকুলে বাস করার নিমিত্ত গমন করছেন, দেখে মহেন্দ্র-পর্বত-স্থিত প্রভাবশালী পরশুরাম তাঁকে আশ্রমে আনলেন এবং বললেন আমি তোমাকে অধ্যয়ন করাবো। ধর্মতঃ আমাকে গুরু বলে বিবেচনা করবে। আমি মহাপ্রভাবশালী জামদগ্ন্য। ভৃগুবংশে আমার জন্ম হয়েছে। বেদ বেদাঙ্গের সমুদয় তত্ত্ব আমি জ্ঞাত আছি, বিশেষত ধনুর্বেদবিষয়ে আমি অদ্বিতীয়। আমি সমুদয় পৃথিবী নিক্ষত্রিয় করে ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দিয়েছিলাম। তারপর আমি তপস্যা করার জন্য মহেন্দ্র পর্বতে আগমন করি। হে ব্রাহ্মণ-কুমার, বেদ বা অন্যান্য শাস্ত্র যা ইচ্ছা হয়, তা তুমি এখানে আমার নিকট অধ্যয়ন কর।

কল্কি পরশুরাম মুখে এরূপ বাক্য শ্রবণ করে হৃষ্টচিত্ত হলেন এবং তাঁর নিকট প্রপত্তিপূর্বক বেদ অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করলেন। তিনি জামদগ্ন্যের নিকট চৌষট্টিকলাসহ বেদ ও ধনুর্বেদ অধ্যয়ন করেন। বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হলে কল্কি কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, হে গুরুদেব, আমার পাঠসমাপ্তি হলো। আমি আপনাকে কী দিতে পারি? আপনি এরূপ দক্ষিণা গ্রহণ করুন, যাতে আমার সমুদয় সিদ্ধি হয় এবং আপনার পরিতোষ জন্মে। পরশুরাম বললেন– মহাত্মন ব্রহ্মা কলির উন্মূলনের নিমিত্ত সর্বাশ্রয় পূর্ণ বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করেন। সেই বিষ্ণুই তুমি শম্ভল গ্রামে জন্মপরিগ্রহ করেছ। এক্ষণে তুমি আমার কাছ থেকে বিদ্যা, শিব থেকে অস্ত্র ও বেদময় শুককে লাভ করে সিংহলদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়া পদ্মার পাণিগ্রহণপূর্বক সনাতন ধর্ম সংস্থাপন করবে। তুমি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হয়ে ধর্ম-বিবর্জিত কলিপ্রিয় ভূপালগণকে পরাজয়পূর্বক নাস্তিকদের সংহার করে দেবাপি ও মরু নামক ধার্মিকদের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করবে। আমি এ সকল সৎ কর্মেই পরিতুষ্ট হব এবং এতেই আমার সম্পূর্ণ দক্ষিণা প্রদত্ত হবে; কারণ, সনাতন ধর্ম সংস্থাপিত হলে, আমরা যথোপযুক্ত যজ্ঞ, দান ও তপস্যা প্রভৃতি পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান করতে পারি।

পরশুরামের নিকট কল্কির অস্ত্রশিক্ষা লাভ

শিবের নিকট থেকে অশ্ব, শুক ও তরবারি প্রাপ্তি

কল্কি একথা শুনে গুরুদেবকে প্রণামপূর্বক বিল্বোদকেশ্বর দেবদেব শিবের উদ্দেশ্যে গমন করে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। তিনি শান্তিগুণাবলম্বী আশুতোষ মহেশ্বর শিবকে যথাবিধানে পূজা করে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্বক হৃদয়মধ্যে ধ্যান করতে লাগলেন।

কল্কি বললেন– যিনি গৌরীনাথ, বাসুকী যাঁর কণ্ঠভূষণ, যিনি ত্রিনয়ন ও পঞ্চবদন, সেই আদি দেবকে নমস্কার। যিনি যোগের অধীশ্বর, যিনি কাম্য কর্মের নাশক, যিনি করাল ও গঙ্গাসঙ্গমে যাঁর মস্তক সর্বদা সিক্ত রয়েছে, যিনি মহাকাল, যাঁর ললাটে চন্দ্রকলা শোভা পাচ্ছে, সেই ঈশ্বরকে নমস্কার করি। ভূতগণ ও বেতালগণের সাথে যিনি সর্বদা শ্মশানে বাস করেন, যাঁহার হস্তে খড়গ, শূল প্রভৃতি নানা অস্ত্রশস্ত্র শোভা পাচ্ছে, প্রলয়কালে সমুদায় লোক যাঁর ক্রোধাগ্নিতে আহুত ও অস্তমিত হবে। যিনি ভূতাদি অর্থাৎ তামস অহংকার স্বরূপ ও পঞ্চতন্মাত্রস্বরূপ হয়ে অদৃষ্ট ও কাল সহকারে সৃষ্টি করেন, সেই ঈশ্বরকে নমস্কার করি।

মহেশ্বর শিব কল্কির এই স্তব শ্রবণ করে পার্বতীর সাথে কল্কির সম্মুখে আবির্ভূত হলেন এবং হাস্য করে বলতে আরম্ভ করলেন। তিনি প্রথমত প্রীতিপূর্বক হস্ত দ্বারা কল্কির সমস্ত অবয়ব স্পর্শ করে বললেন– শ্রেষ্ঠ, তুমি কোন বর কামনা কর, বলো। এই যে অশ্বটি দেখছো, এটি পক্ষীরাজ গরুড়ের অংশসম্ভূত। এই অশ্বটি কামগামী (ইচ্ছানুযায়ী গমনশীল) ও বহুরূপী। এই শুকপাখিটি সর্বজ্ঞ। আমি এই অশ্ব ও শুক পাখিটি তোমাকে দিচ্ছি, গ্রহণ করো। এই অশ্ব ও শুকের প্রভাবে সকলেই তোমাকে সর্ববিজয়ী বলবে। আর এই করাল করবাল দিচ্ছি, গ্রহণ করো। এর মুষ্টি রত্নময়। এটা অতীব প্রভাবশালী। এই করবালই গুরুভারা পৃথিবীর ভার হরণের প্রধান সাধন হবে।

কল্কি মহেশ্বরের এই বাক্য শ্রবণ করে তাঁকে নমস্কারপূর্বক অশ্বে আরূঢ় হয়ে শীঘ্র শম্ভল গ্রামে উপস্থিত হলেন। তিনি পিতা, মাতা ও ভ্রাতৃগণকে যথাবিধানে প্রণাম করে পরশুরাম কর্তৃক কথিত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন। পরম তেজস্বী কল্কি মহেশ্বর থেকে বর লাভের বিষয় তাঁদের নিকটে ব্যক্ত করে প্রহৃষ্ট চিত্তে জ্ঞাতিগণের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁদের সমক্ষে ঐ সমস্ত মঙ্গল সমাচার ব্যক্ত করলেন। গার্গ্য, ভর্গ্য, বিশাল প্রমুখ তাঁর বন্ধুগণ সেসব কথা শুনে আনন্দিত হলেন। শম্ভল গ্রামবাসীগণের মধ্যে পরস্পর কেবল সে বিষয়ে উক্তবিষয়ক কথোপকথন হতে লাগল। বিশাখযূপ নামক রাজা ঐ সকল কথা লোকমুখে শুনতে পেলেন এবং তিনি স্থির করলেন যে, কলি দমনের জন্য ভগবান শ্রীহরি আবির্ভূত

কল্কির শিব-পার্বতীর দর্শন ও শিবের নিকট থেকে অশ্ব, শুক ও তরবারি প্রাপ্তি

হয়েছেন। রাজা বিশাখযূপ দেখলেন, মাহিষ্মতী নামে তাঁর নিজ পুরীতে বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই যাগশীল, দানশীল, তপোনিষ্ঠ ও ব্রতপরায়ণ হয়েছে। শ্রীপতি বিষ্ণুর প্রাদুর্ভাবে সকলেই স্বধর্ম নিরত হয়েছে, দেখে রাজাও স্বয়ং ধর্মপরায়ণ হলেন। তখন তিনি নির্মল অন্তঃকরণের সাথে প্রজাপালন করতে লাগলেন। যারা অধার্মিকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে, তাদের ধর্মকর্মে ঐকান্তিক মনোনিবেশ করতে দেখে, লোভ, মিথ্যা প্রভৃতি কলিবংশীয়েরা দুঃখিত অন্তঃকরণে সেই দেশ পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করল।

তারপর ভগবান কল্কি, নির্মল প্রভাশালী খড়্গ ও ধনুর্বাণ গ্রহণ করে কবচ ধারণপূর্বক জয়শীল অশ্বে আরূঢ় হয়ে নগর থেকে বহির্গত হলেন। সাধুলোকের প্রিয় রাজা বিশাখযূপ, শম্ভল গ্রামে হরির অংশ কল্কি আবির্ভূত হয়েছেন জেনে দর্শনার্থ আগমন করলেন। তিনি দেখলেন, দেবরাজ যেমন দেবগণ পরিবৃত হয়ে উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্বে আরূঢ় হন, তাঁর ন্যায় এবং চন্দ্র যেমন তারাগণ কর্তৃক পরিবৃত থাকেন, তার ন্যায়, কবি, প্রাজ্ঞ, সুমন্ত্র প্রভৃতি প্রভাবশালী জনগণ কর্তৃক পরিবৃত কল্কি অশ্বে আরোহণপূর্বক দণ্ডায়মান আছেন।

রাজা বিশাখযূপকে যজ্ঞ সম্পাদনের নির্দেশ

রাজা বিশাখযূপ কল্কি দর্শনে আহ্লাদে পুলকিত তনু হয়ে প্রণাম করলেন এবং কল্কির অনুগ্রহে তৎক্ষণাৎ পুণ্যাত্মা বৈষ্ণব হলেন। কল্কি রাজার সাথে কিছুদিন বাস করলেন এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের আশ্রমধর্ম এইরূপে বললেন যে, ধার্মিকগণ কলিকালে ভ্রষ্ট হয়েছিল, এখন আমার আবির্ভাব হওয়াতে সকলে মিলিত হয়েছে। এখন তুমি সমাহিত হয়ে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা আমার আরাধনা কর। আমিই পরম লোক, আমিই সনাতন ধর্ম। ধর্ম অধর্মরূপ অদৃষ্ট, কাল ও ভাব অনুসারে আমারই অনুগত হয়ে রয়েছে। আমি চন্দ্রবংশীয় এবং সূর্যবংশীয় দেবাপি ও মরু নামক রাজদ্বয়কে রাজ্য শাসনে স্থাপনপূর্বক পুনর্বার সত্য যুগ প্রতিষ্ঠিত করে বৈকুণ্ঠধামে গমণ করব।

রাজা বিশাখযূপ, প্রভু কল্কির এই বাক্য শ্রবণপূর্বক তাঁকে নমস্কার করে স্বীয় অভিলষিত বৈষ্ণব ধর্ম বিষয়ক প্রশ্ন করলেন। কলিকুল ধ্বংস বাসনায় অবতীর্ণ–কল্কি, রাজার এই বাক্য শ্রবণ করে নিজ অনুচরবর্গের মনোরঞ্জনার্থ মধুর বাক্য দ্বারা সাধুধর্ম বলতে আরম্ভ করলেন।

কল্কি হতে জগতের সৃষ্টি

সূত বললেন। হে দ্বিজোত্তম। তারপর ধর্মময় কল্কি, সভামধ্যে সূর্যের ন্যায় বিরাজমান হয়ে সেই রাজার নিকট ব্রাহ্মণজাতির প্রিয় ধর্ম বলতে আরম্ভ করলেন।

কল্কি বললেন– যে সময় মহাপ্রলয় উপস্থিত হবে, যখন ব্রহ্মাও বিলয় প্রাপ্ত হবেন, তখন সবকিছু আমাতেই লীন থাকবে। পূর্বে কেবল আমিই ছিলাম, আর কিছুই ছিল না, ব্রহ্মা প্রভৃতি সমস্ত জীব ও সমস্ত পদার্থ আমা হতেই সৃষ্ট হয়েছে। যে সময় সমস্ত জগৎ প্রসুপ্ত ছিল, যে সময় এক পরমাত্মা ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্তু ছিল না, সেই মহানিশার অবসানে সৃষ্টিকরণরূপ ক্রীড়া করার নিমিত্ত আমার বিরাট মূর্তি আবির্ভূত হলো। সেই বিরাট মূর্তি পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তারপর ব্রহ্মা ঐ বিরাট পুরুষের শরীর থেকে উৎপন্ন হলেন। উক্ত ব্রহ্মা নামে পুরুষ আমার বাক্যরূপ বেদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে জীবাত্মা বা পুরুষ নামক আমার অংশ থেকে প্রকৃতি অর্থাৎ মায়া দ্বারা কালরূপ আমার অংশ সহকারে জীবগণের সৃষ্টি করতে আরম্ভ করলেন। প্রথমত, প্রজাপতিগণ মনু প্রভৃতি মানবগণ ও দেবগণ সৃষ্ট হলেন। এঁরা যদিও সকলেই আমার অংশ, তথাপি সত্ত্ব, রজো ও তম– এই গুণত্রয়যুক্ত মায়াবলে নানা উপাধি ধারণ করলেন। এতেই সকল দেবতা, সকল লোক ও স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সকলেই নাম রূপ প্রাপ্ত হয়েছেন। যাঁরা মায়া বলে সৃষ্ট হয়েছেন, তাঁরা আমারই অংশ এবং আমাতেই লয়প্রাপ্ত হবেন।

বিশাখযূপকে ব্রাহ্মণ সম্পর্কিত জ্ঞান দান

যে সকল ব্রাহ্মণ যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও সৎকার্যের অনুষ্ঠান করে আমার আরাধনা করেন, যাঁরা তপস্যা দান প্রভৃতি সকল কার্যে আমার নাম কীর্তন করেন ও আমার সেবায় রত থাকেন, সেই সকল ব্রাহ্মণ আমার অত্যন্ত প্রিয়। বেদই আমার প্রধান মূর্তি। ঐ বেদ, ব্রাহ্মণ দ্বারাই প্রকাশ হয়ে থাকে। ঐ বেদ থেকে সমস্ত লোক রক্ষিত হচ্ছে। অখিলাশ্রয় ব্রাহ্মণেরা আমাকে পূর্ণ জগন্ময় জেনে সেবা করে থাকেন।

বিশাখযূপ বললেন– ব্রাহ্মণের লক্ষণ কী? অনুগ্রহ করে বলুন এবং ব্রাহ্মণেরা আপনার প্রতি কীরূপ ভক্তি করে থাকেন যে, আপনার অনুগ্রহে তাঁদের বাক্যই বাণস্বরূপ হয়েছে।

কল্কি বললেন– বেদে আমাকে চরাচর ব্যক্ত সমস্ত পদার্থ থেকে শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর বলে থাকে। সেই বেদ ব্রাহ্মণ মুখে থেকে নানা ভাগে প্রকাশিত হয়। আমার প্রতি নির্মল ভক্তিই ব্রাহ্মণদের ধর্ম। আমি সেই ধর্মরূপ ভক্তির দ্বারা তোষিত হয়ে প্রিয়তমা লক্ষ্মীর সাথে যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে থাকি।

বেদানুসারী ব্রাহ্মণ গ্রন্থিযুক্ত যজ্ঞোপবীত ত্রিগুণ করে ধারণ করবে এবং তা পৃষ্ঠদেশকে দ্বিভাগ করে গলদেশ থেকে নাভিমধ্য পর্যন্ত লম্বমান থাকবে। যজুর্বেদীরা এইরূপ যজ্ঞোপবীত ধারণ করবেন। সামবেদীদের যজ্ঞোপবীত নাভিস্থল অতিক্রম করবে। এটাই তাঁদের পক্ষে বিধি হচ্ছে। যজ্ঞোপবীত বাম স্কন্ধে ধৃত হলে বলদায়ক হয়।

ব্রাহ্মণেরা মৃত্তিকা, ভস্ম, চন্দন প্রভৃতি দ্বারা তিলক ধারণ করবেন। তাঁরা ললাটদেশ থেকে কেশ পর্যন্ত ধর্মকর্মের অঙ্গস্বরূপ উজ্জ্বল তিলক ধারণ করবেন। এই পুণ্ড্র তিলক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের আবাসস্বরূপ। এটা দর্শন করলে পাপ ধ্বংস হয়। স্বর্গ ব্রাহ্মণদের হাতেই আছে, কারণ তাঁদের বাক্যে বেদ, হস্তে হব্য, গাত্রে সমস্ত তীর্থ ও ধর্মানুরাগ এবং নাভিতে ত্রিগুণা প্রকৃতি বিদ্যমান রয়েছে। তাঁদের সম্বন্ধে সাবিত্রী কণ্ঠহারস্বরূপ ও অন্তঃকরণ ব্রহ্মস্বরূপ। তাঁদের সম্মাননা করা সকলেরই কর্তব্য, বিশেষত ব্রাহ্মণগণ গ্রার্হস্থ্য প্রভৃতি আশ্রম চতুষ্টয়ে অবস্থিতি করে আমার ধর্ম করেন। দ্বিজগণের মধ্যে যাঁরা বালক, তাঁরাও জ্ঞান বিষয়ে বৃদ্ধ, তপস্যা বিষয়ে বৃদ্ধ এবং আমার প্রিয়। আমি তাঁদের বাক্য প্রতিপালন করবার জন্যই ভূতলে অবতীর্ণ হয়ে থাকি। যিনি ব্রাহ্মণদের এই মহাভাগ্যের বিষয় শ্রবণ করেন, তাঁর সকল পাপ ধ্বংস হয় এবং তিনি কলিদোষ থেকে মুক্ত হন। কোনো ভয় আর তাঁর হৃদয়ে থাকে না। পরম বৈষ্ণব রাজা বিশাখযূপ, কল্কির মুখে কলি-দোষ নাশক এই বাক্য শ্রবণ করে বিশুদ্ধ চিত্তে নমস্কারপূর্বক গমন করলেন।

প্রথমাংশ
অধ্যায়
৪
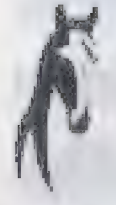
শুকের কাছে কল্কির সিংহল বার্তা ও পদ্মার রূপ-গুণ শ্রবণ

তারপর রাজা বিশাখযূপ গমন করলে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হলো। তখন পরম পণ্ডিত শিবদত্ত শুক সমস্ত দিন বিচরণ করে কল্কির নিকট উপস্থিত হলো এবং তাঁর স্তব করে সম্মুখে দাঁড়ালো। কল্কি শুককে স্তুতি পাঠ করতে দেখে ঈষৎ হাস্যপূর্বক বললেন, তুমি কুশল তো? তুমি কোন স্থানে কী আহার করে এলে?

শুক বলল– নাথ, আমি একটি কৌতূহলের কথা বলছি, শ্রবণ করুন। আমি সাগর-বেষ্টিত সিংহলদ্বীপে গমন করেছিলাম। দ্বীপের সমুদয় বৃত্তান্ত অতীব চমৎকার। বিশেষত তদ্দ্বীপস্থ বৃহদ্রথ নামক ভূপতির একটি কন্যা আছেন। ঐ কন্যাটির চরিতামৃত অতীব শ্রবণ-মধুর। এই কন্যা কৌমুদীনাম্নী রাজমহিষীর গর্ভে জন্মপরিগ্রহ করেছেন। এই কন্যার চরিত্র শ্রবণ করলে জগতের পাপ দূর হয়।

সিংহলদ্বীপ অতীব চমৎকার স্থান। এখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণ চতুষ্টয়ের বাস আছে। এখানে রমণীয় প্রাসাদ, রমণীয় হর্ম্য (সৌধ), রমণীয় গৃহ, রমণীয় নগর শোভা পাচ্ছে। কোথাও রত্নময়, কোথাও স্ফটিকময় কুড্য (দেয়াল) অপূর্ব শোভা সম্পাদন করছে। প্রত্যেক স্থান রাশি রাশি সুবর্ণসমূহে বিভূষিত আছে। চতুর্দিকেই উজ্জ্বলবেশা পদ্মিনী কামিনীরা অবস্থান করছে। স্থানে স্থানে সরোবর আছে। সারস ও হংসগণ তীরস্থ জলে ক্রীড়া করছে। পদ্ম, কহলার (শ্বেতপদ্ম) ও কুন্দপুষ্পে ভৃঙ্গগণ ক্রীড়া করছে। চতুর্দিকে পদ্ম, মনোহর লতাসমূহ, বন ও উপবন শোভা পাচ্ছে।

এরূপ রমণীয় দেশে উক্ত মহাবল পরাক্রান্ত রাজা বৃহদ্রথ বাস করেন। তাঁর পদ্মা নামে ধন্যা যশস্বিনী যে কন্যা আছেন, এমন কন্যারত্ন ত্রিভুবনের মধ্যে দুর্লভ। তাঁর সদৃশ পরম রমণীয় রূপমাধুরী আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। তাঁর চরিত্র অতীব

রমণীয়। বিধাতা তাঁকে অতি আশ্চর্যরূপে নির্মাণ করেছেন। বাল্যাবস্থায় সখীগণের সহিত শিব-সেবাপরায়ণা গৌরী যেমন সকলের পূজ্যা ও সকলের সম্মাননীয় হয়েছিলেন, তাঁর ন্যায় এই কন্যাও সখীগণের সাথে এবং অন্যান্য কন্যাগণের সাথে জপ ও ধ্যানে তৎপর আছেন।

পদ্মার শিব-পার্বতীর দর্শন ও বর লাভ

ইতোমধ্যে যখন মহাদেব জানতে পারলেন যে, নারী জাতির শ্রেষ্ঠা বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী পদ্মা নামে অবতীর্ণ হয়েছেন, তখন তিনি প্রহৃষ্ট হৃদয়ে পার্বতীর সাথে তথায় আবির্ভূত হলেন। পদ্মাবতী, গৌরীর সাথে চন্দ্রশেখরকে বরদানার্থ আবির্ভূত হতে দেখে লজ্জায় অধোমুখে সম্মুখে দণ্ডায়মান হলেন। কিছুই বলতে পারলেন না। তখন ভূতনাথ তাঁকে বললেন, "সুভগে, নারায়ণ তোমার পতি হবেন, তিনি প্রহৃষ্ট চিত্তে তোমার পাণি গ্রহণ করবেন, অন্য রাজকুমার তোমার যোগ্য পাত্র নহে। এই ভুবনের মধ্যে যেসকল মনুষ্য তোমাকে সকাম হৃদয়ে দর্শন করবে, তারা সেই বয়সেই তৎক্ষণাৎ স্ত্রীলোক হবে। দেবগণ, অসুর, নাগগণ, গন্ধর্বগণ, চারণগণ ও অন্য যে ব্যক্তি তোমার সাথে সংসর্গ করতে অভিলাষ করবে, সে যথাসময়ে নারীভাব প্রাপ্ত হবে, কিন্তু তোমার পাণি-গ্রহণার্থী নারায়ণের প্রতি এ শাপ ফলবে না; তিনি ব্যতীত সকল ব্যক্তির প্রতিই এই শাপ সফল হবে।

অতএব, তুমি এক্ষণে তপস্যা পরিত্যাগ করে গৃহে গমন কর। অশেষ সুখসম্ভোগের আয়তন এই সুকোমল শরীর ক্ষুব্ধ, ক্লিষ্ট ও ক্ষীণ করো না। হরিপ্রিয়ে, কমলে, এই শরীর যাতে নির্মল থাকে, তা করো।"

মহাদেব এরূপ বর প্রদান করে সেই স্থলেই অন্তর্হিত হলেন। তারপর পদ্মা মহেশ্বরের নিকট নিজের মনোরথানুযায়ী সমুচিত বর প্রাপ্ত হয়ে প্রহৃষ্টা ও বিকশিতমুখী হলেন। তখন তিনি সেই শঙ্করকে নমস্কার করে স্বীয় জনকের আলয়ে প্রবেশ করলেন।

পদ্মার স্বয়ংবরসভা ও রাজাদের স্ত্রীদেহ প্রাপ্তি

শুক বলল, এরপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। পদ্মাবতীর বিয়ে দেবার বয়স হয়েছে। রাজা বৃহদ্রথ বেশ চিন্তায় পড়লেন। রাজপুত্রের অভাব নেই। কিন্তু এমন মেয়েকে প্রাণভরে কার হাতে সমর্পণ করা যায়? রাণীকে একদিন মনের কথা বললেন। রাণী এবার রাজাকে শোনালেন, শিবের কাছ থেকে তাঁদের মেয়ে কী বর পেয়েছে। তার কথা শুনে রাজা যতটা বিস্মিত, ততখানি অবাক। বিষ্ণুতো সাক্ষাৎ ভগবান, তিনি হবেন তাঁদের জামাতা! এ কি ভাবা যায়? কিন্তু শিবের কথা তো মিথ্যে হবার নয়। তাহলে, নিশ্চয়ই তিনি কোথাও জন্মপরিগ্রহ করেছেন।

এরপর, অনেক ভেবে-চিন্তে রাজা বৃহদ্রথ মেয়ের বিয়ের জন্য স্বয়ংবর সভার আয়োজন করবেন বলে ঠিক করলেন। শিবের বরে ভগবান বিষ্ণুই যদি এর স্বামী হন, তাহলে এই সভায় নিশ্চয় তিনি আসবেন।

চতুর্দিকে ঘোষিত হলো, রাজা বৃহদ্রথের মেয়ে পদ্মাবতীর স্বয়ংবর সভা। সারা সিংহল যেন উৎসবে মেতে উঠল। নির্দিষ্ট দিনে একের পর এক রাজপুত্ররা আসতে শুরু করলেন। সকলেই সুদর্শন, সম্ভ্রান্ত রাজপুত্র। কেউ হাতির পিঠে, কেউ ঘোড়ার পিঠে, কেউবা রথে চড়ে। এসকল রাজকুমার মহাবল পরাক্রান্ত শ্বেত-ছত্রবিশিষ্ট শ্বেত চামরে উপবীজিত। তাদের বিচিত্র মাল্য, বিচিত্র বসনে স্বয়ংবরসভা অপূর্ব শোভা ধারণ করল এবং স্ব-স্ব আসনে উপবিষ্ট রাজকুমারগণ দেবগণে পরিবৃত দেবরাজের ন্যায় শোভা পেতে লাগল। চতুর্দিক নৃত্যগীতে মুখরিত হলো।

তখন রাজা বৃহদ্রথের নির্দেশে অল্পক্ষণের মধ্যে অরুণবর্ণ পট্টবস্ত্র পরিহিতা, মণিমুক্তা ও প্রবাল দ্বারা সর্বাঙ্গ বিভূষিতা পদ্মাবতী সখীগণ পরিবৃত হয়ে সভায় উপস্থিত হলেন- যেন সাক্ষাৎ ভগবতী। রত্নমালা হাতে অপরূপা পদ্মাবতীকে দেখামাত্রই রাজপুত্ররা মদনবশবর্তী হয়ে বস্ত্র ও অস্ত্র বিস্মরণপূর্বক ভূমিতে পতিত হতে লাগলেন। ঘটে গেল বিপর্যয়। রাজা বৃহদ্রথ কন্যাকে নিয়ে পতি নির্বাচনের জন্য একের পর এক রাজপুত্রের পরিচয় দিতে যাবেন কি, অবাক হয়ে গেলেন, আসনে যারা বসেছিল তাদের মধ্যে একজনও আর পুরুষ নেই। পদ্মাবতীর প্রতি সকাম দৃষ্টিপাতের ফলে সকলেই ইতোমধ্যে স্ত্রীদেহ প্রাপ্ত হয়েছেন। রাজকুমারগণ নিজেদের স্ত্রীলোক হতে দেখে আসন ছেড়ে পদ্মার সহচরী হলেন।

হতাশ হলেন রাজা বৃহদ্রথ। হতাশ হলেন পদ্মাবতীও। অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে তিনি তখন শ্রীহরির চিন্তায় নিবিষ্ট হলেন এবং বিলাপ করতে করতে বিমলা নাম্নী সখীর নিকট তার দুঃখের কথা ব্যক্ত করলেন। একটি বটবৃক্ষে বসে শুক সবকিছু দর্শন ও শ্রবণ করল।

শুক কর্তৃক পদ্মাকে আশ্বস্তকরণ

কল্কি তখন শম্ভল নগরে রাজা বিশাখযূপ আর নগরবাসীর সঙ্গে সবেমাত্র ধর্মালোচনা শেষ করেছেন। বিদায় নিয়েছেন সবাই। এমন সময় শুকপাখি কল্কিসমীপে উপনীত হয়ে তাঁর নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল।

কল্কি শুকের বাক্য শ্রবণ করে বিস্মিত হয়ে বললেন- শোন শুক, পদ্মাবতীকে সান্ত্বনা দিতে তুমি পুনরায় সিংহলে যাও। পদ্মাবতীকে আমার আগমন বার্তা জানিয়ে তাকে আশ্বস্ত করে ফিরে এসো।

শুক তৎক্ষণাৎ সিংহল অভিমুখে যাত্রা করল। শুক সমুদ্রপারে গমনপূর্বক স্নান ও অমৃতময় জলপান করে বীজপুর (লেবু বিশেষ/কমলালেবু) আহার করল। তারপর রাজবাড়িতে প্রবেশ করল।

শুক সেখানে একটা নাগকেশর বৃক্ষের ডালে উপবেশন করে মনুষ্যবাক্যে পদ্মগন্ধা, পদ্মহস্ত, পদ্মমালা বিভূষিতা পদ্মাকে সম্বোধন করে তার প্রশংসা করল। তারপর শুক পদ্মার নিকট থেকে তাঁর দুঃখের কারণ ও শিব কথিত বিষ্ণু অর্চন পদ্ধতি এবং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, আজানুলম্বিত, পীত বসন পরিহিত, নীলকান্ত ও কৌস্তুভ মণি শোভিত, শ্রীবৎসচিহ্নিত, হরিচন্দনজাত কুসুমমালা বিভূষিত ভগবান শ্রীবিষ্ণুর রূপমাধুরী শ্রবণ করল।

শুক বলল, রূপে-গুণে তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী; আর তুমি অসীম তেজসম্পন্ন বিষ্ণুর যে মূর্তি ধ্যান কর, আমি হয়ত সেই মূর্তিই সাক্ষাৎ দর্শন করেছি।

শুকের বাক্য শুনে পদ্মা কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। শুককে বীজপুর (লেবু বিশেষ/কমলালেবু) ও জল দ্বারা আপ্যায়ন করলেন। শুক কল্কি সম্পর্কে সমস্ত বৃত্তান্ত তাকে শোনাল। শুক বলল, মহাকারুণিক শ্রীপতি ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে ধর্ম সংস্থাপনের অভিলাষে শম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মপরিগ্রহ করে অবস্থান করছেন। কল্কির তিন ভ্রাতা ও গোত্রজাত জ্ঞাতিগণ তাঁর সহচর হয়ে আছেন। প্রথমত তাঁর উপনয়ন হলে তিনি পরশুরামের নিকট বেদ অধ্যয়ন করেছেন এবং তিনি ধনুর্বেদ ও গান্ধর্ববেদ শিক্ষা করে শিবের নিকট থেকে অশ্ব, খড়গ, শুক, কবচ এবং বর লাভ করে শম্ভল গ্রামে প্রত্যাগমন করেন। তারপর কল্কি বিশাখযূপ নামক ভূপতিকে প্রাপ্ত হয়ে শিক্ষাবিশেষ দ্বারা ধর্ম প্রকাশপূর্বক অধর্ম নিরাকরণ করেছেন। পদ্মাও হৃষ্টচিত্ত হয়ে তাঁর কথা প্রভু কল্কির নিকট ব্যক্ত করতে অনুরোধ করলেন। এরপর শুক শম্ভলে ফিরে গেল এবং কল্কিকে সব খুলে বলল।

দ্বিতীয়াংশ
অধ্যায়
১

কল্কির সিংহলে গমন

শুকমুখে পদ্মার ব্যাকুলতার কথা শ্রবণ করে কল্কিদেব শিবদত্ত অশ্বে আরোহণপূর্বক ত্বরান্বিত হয়ে শুকসহ সিংহলে যাত্রা করলেন। এই সিংহল দ্বীপ সমুদ্রপাড়ে অবস্থিত। নির্মল জল মধ্যস্থিত, অসংখ্য জনগণে সমাবৃত, নানাবিধ আকাশযান যুক্ত, মণিকাঞ্চণসমূহে দেদীপ্যমান রয়েছে। এই দ্বীপ অট্টালিকা ও গৃহসমূহের সম্মুখে পতাকা ও তোরণ থাকাতে অতীব শোভা সম্পাদন করছে। শ্রেণি অনুসারে সংস্থাপিত সভাসমূহ, আপণসমূহ (হাট), সৌধসমূহ, পুরসমূহ (নগরী), গোপুরসমূহ (পুরদ্বার) এই সমুদয় দ্বারা এই নগর সুশোভিত রয়েছে।

কল্কি সিংহল দ্বীপে উপস্থিত হয়ে সম্মুখে কারুমতী নামে পুরী দর্শন করলেন। এই পুরীতে পুরস্ত্রীরূপ পদ্মিনীদের পদ্ম গন্ধে ভ্রমরগণ আমোদিত হচ্ছে। এই পুরীর মধ্যে যে সমস্ত জলাশয় আছে, তার জল মরালকুলের (হংসের) সঞ্চালন দ্বারা চঞ্চল। প্রফুল্ল কমলসমূহস্থিত অলিকুল দ্বারা আকুলিকৃত। তার চতুর্দিক হংস, সারস, জলকুক্কুট (গাংচিল) ও দাত্যুহসমূহ (ডাকপাখি) শব্দ করছে। স্বচ্ছসলিলের চঞ্চল তরঙ্গ শীতল বায়ু দ্বারা সমীপস্থ বন উপজীবিত হচ্ছে। ঐসমস্ত বন কদম্ব, কুদ্দাল (আবলুশ- ভারত, শ্রীলংকা, পশ্চিম অফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এক জাতীয় বৃক্ষ), শাল, তাল, আম, বকুল, কপিত্থ, খর্জুর (খেজুর), বীজপুর (লেবু বিশেষ/কমলালেবু), করঞ্জক (করমচা), পুন্নাগ (নাগকেশর বৃক্ষ), পনস (কাঁঠাল), নাগরঙ্গ, অর্জুন, শিংশপ, ক্রমুক (ব্রহ্মদারু বা সুপারি), নারিকেল প্রভৃতি নানা বৃক্ষে সুশোভিত। সিংহলে কল্কি ফল, পুষ্প ও পত্রসমূহে বিভূষিত এই বন দর্শন করলেন। সরোবর স্থিত পদ্মসমূহের সৌরভে ভ্রমরগণ গুনগুন করে চতুর্দিকে ভ্রমণ করছে। কদম্ব বৃক্ষসমূহের নবপল্লবনিকর দ্বারা সেই স্থানের আতপ নিবারিত হচ্ছে। কল্কি জলাশয়ে স্নান করে সরোবরের সমীপবর্তী জল-আনয়ন-পথে স্বচ্ছ স্ফটিকময় সোপানযুক্ত প্রবাল অলংকৃত বেদীর উপর বিচিত্র আসনে উপবেশন করলেন। ততক্ষণে কল্কির নির্দেশে শুক পদ্মার নিকট সিংহলে তাঁর আগমন বার্তা প্রেরণ করলেন।

কল্কি ও পদ্মার মিলন

পদ্মা অট্টালিকার উপর সখী পরিবৃত হয়ে পদ্মপত্রের শয্যায় শয়ন করে আছেন। হঠাৎ সেই নাগকেশর বৃক্ষ হতে শুকমুখে কল্কির আগমন বার্তা শুনে পদ্মা পুলকিত হলেন। বিমলা, মালিনী, লোলা, কমলা, কামকন্দলা, বিলাসিনী, চারুমতী, কুমুদা- এই অষ্ট সখীদের ডেকে বললেন- চল, সরোবরে স্নান করে আসি।

অতঃপর পদ্মা পাল্কিতে আরোহণপূর্বক সখী পরিবৃত হয়ে অন্তপুর হতে বহির্গত হলেন। নারী হয়ে যাওয়ার ভয়ে পুরুষেরা রাজপথ হতে পলায়ন করলেন। আর বলবতী রমণীরা পালকি বহন করে পদ্মাকে নিয়ে সরোবরে পৌছলেন। ললনারা সারস ও হংসসমূহের সুমধুর ধ্বনিযুক্ত, ভ্রমরের গুঞ্জনে মুখরিত প্রফুল্ল পদ্মসম্ভূত রেণু দ্বারা সুবাসিত সরোবরসলিলে অবগাহন করলেন। পদ্মা রসযুক্ত হাস্যপরিহাস, বাদ্য, নৃত্য যোগে জলবিহার করলেন। তারপর জল-উত্থিতা হয়ে মহামূল্য ভূষণ পরিধানপূর্বক শুক কথিত কদম্বতলে গমন করলেন।

পদ্মা শুকের সহিত কদম্বমূলে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, সম্মুখবর্তী মণিবেদিকাতে কল্কি শয়ন করে নিদ্রিত আছেন। তাঁর তেজপুঞ্জ আদিত্য তেজকেও পরাভূত করছে। তাঁর সর্বাঙ্গ মহা মণিসমূহে বিভূষিত রয়েছে। সেই প্রভু তমাল সদৃশ নীলবর্ণ, পীতবসন, রমণীয় পদ্মপলাশলোচন, আজানুলম্বিত বাহু, উন্নত প্রশস্ত বক্ষবিশিষ্ট, শ্রীবৎস চিহ্নযুক্ত ও কৌস্তুভমণির কান্তি দ্বারা বিরাজিত।

শুক কল্কিকে জাগরিত করতে উদ্যত হলে পদ্মা তাকে নিষেধ করলেন। বললেন, এই মহাবীর কমনীয়াকৃতি পুরুষ যদি আমাকে দেখে স্ত্রীলোক অবয়ব প্রাপ্ত হয়, তবে মহাদেবের বরে আমার কী লাভ হলো; তাঁর বর আমার শাপস্বরূপ হলো। ততক্ষণে চরাচর জগতের অন্তরাত্মা জগদীশ্বর কল্কি পদ্মার আন্তরিক অভিপ্রায় বুঝতে পেরে জাগরিত হলেন এবং দেখলেন লক্ষ্মীস্বরূপা পরমরূপবতী সুলোচনা পদ্মা তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান। পদ্মার সৌন্দর্যে মুগ্ধ কল্কি তার রূপের প্রশংসা করতে লাগলেন।

তখন পদ্মা কলিকুল ধ্বংসকারী কল্কির অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করে, তাঁর পুরুষত্ব অক্ষত দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। সখীপরিবৃতা পদ্মা লজ্জাভারে ও বিনম্র চিত্তে অবনত মস্তকে নমস্কার করে কৃতাঞ্জলিপুটে ধীরজন-সমাদৃত নিজপতি কল্কিকে সমাদরপূর্বক বিষ্ণুজ্ঞানে তাঁর স্তব করলেন। তারপর পিতার নিকট গমনপূর্বক দূত দ্বারা কল্কির আগমনবার্তা জানালেন।

কল্কি ও পদ্মার বিবাহ

রাজা বৃহদ্রথ পদ্মার সখীর নিকট থেকে কল্কির আগমনবার্তা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি পুরোহিত ব্রাহ্মণ ও পাত্র-মিত্রসমেৎ পূজার আয়োজনসহ মাঙ্গলিক নৃত্য-গীত-বাদ্য করতে করতে কল্কিকে আনয়নের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তাঁর আত্মীয়-বন্ধুগণ সকলেই তাঁর অনুগামী হলো। পতাকা ও সুবর্ণময় তোরণসমূহ দ্বারা কারুমতী নগরী বিভূষিতা হলো। জলাশয়ের নিকটবর্তী হয়ে বৃহদ্রথ দেখলেন বিষ্ণুযশার পুত্র জগৎপতি বিষ্ণু মণিবেদিকাতে উপবেশন করে আছেন। পুলকিত বৃহদ্রথ যথানিয়মে কল্কির পূজা ও স্তুতি করে তাঁকে হর্ম্য ও প্রাসাদমালায় শোভিত নিজ সদনে আনয়নপূর্বক শিবের বর অনুসারে পদ্মাকে কল্কির হস্তে সমর্পণ করলেন।

নারীগণের পুনরায় পুরুষদেহ প্রাপ্তি ও রাজাগণ কর্তৃক কল্কিস্তব

কল্কি প্রিয়তমা পদ্মাকে পত্নীরূপে লাভ করে সাধুগণ কর্তৃক উত্তমরূপে সংস্কৃত হয়ে সিংহলদ্বীপ অতি উত্তম স্থান বিবেচনা করে কিছুদিন সিংহলে অবস্থান করলেন। তখন কল্কিপ্রিয়া পদ্মাকে সকাম দৃষ্টিতে দর্শন করে যেসকল রাজা পূর্বে স্ত্রীদেহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তারা কল্কির দর্শনে এলেন। কল্কিকে দর্শন করে তাঁর চরণ স্পর্শ করলেন এবং তাঁর নির্দেশে রেবা নদীতে স্নান করলেন; তৎক্ষণাৎ তারা পুনরায় পুরুষদেহ প্রাপ্ত হলেন। রাজাগণ কল্কির অদ্ভুত প্রভাব দেখে তাঁর শরণাপন্ন হলেন এবং ভক্তিসহকারে প্রণতিপূর্বক ভগবান শ্রীবিষ্ণুজ্ঞানে তাঁর স্তব করলেন– "হে কল্কে, আপনার জয় হোক। আপনি সেই জগদীশ্বর বিষ্ণু, যিনি মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, পরশুরাম, রাম, বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ আদি রূপে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীর ভার হরণ করেছিলেন। এখন আপনি কলিকুল-ধ্বংসের নিমিত্ত এবং বৌদ্ধ (নাস্তিক), পাষণ্ড, ম্লেচ্ছ প্রভৃতির শাসনের নিমিত্ত কল্কিরূপে অবতীর্ণ হয়ে বৈদিক ধর্মরূপ সেতু রক্ষা করছেন। অদ্য আমাদের নরক হইতে উদ্ধার করলেন। আমরা আপনার অনুগ্রহের কথা কী বলব!"

কল্কি ভক্ত ভূপতিগণের বাক্য শ্রবণ করে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র – এই বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম, বেদবিহিত কর্মের কথা বললেন। রাজাগণ কল্কির মধুর বাক্য শ্রবণ করে পবিত্র হলেন। তারপর তারা কল্কিকে পুনর্বার নমস্কার করে তাদের অতীত অবস্থার বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। তাদের প্রশ্নের উত্তর পরোক্ষভাবে দিতে কল্কি তখন অনন্ত মুনির কথা স্মরণ করলেন। দীর্ঘকালব্যাপী তীর্থবাসী ব্রতধারী অনন্ত মুনিও তৎক্ষণাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। কল্কি ও মুনির মধ্যে কিছু কথোপকথন হলো, কিন্তু রাজাগণ তার অর্থ কিছুই বুঝতে পারল না। তারা কল্কির নিকট সে বিষয়ে জানতে চাইলে কল্কি অনন্ত মুনির কাছ থেকে শ্রবণ করার নির্দেশ দিলেন এবং সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

অনন্ত মুনির প্রতি কৃপা

কল্কির নির্দেশে রাজাগণ অনন্ত মুনিকে প্রণাম করে তাঁর সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। মুনিবর বলতে লাগলেন:

আজ আমি অনন্ত মুনি বটে, কিন্তু এক সময় আমি অতি সাধারণ ঘরে এক ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলাম। বাড়ি ছিল পুরিকায় (উড়িষ্যার এক নগর)। আমার পিতা বিদ্রুম খুবই নিষ্ঠাবান ছিলেন এবং মাতা সোমাও ছিলেন খুবই নিষ্ঠাবতী। আমি তাঁদের ঘরে জন্মেছিলাম ঠিকই, কিন্তু আমাকে দেখে পিতা-মাতার খুব দুঃখ হয়েছিল। কারণ, আমি নপুংশক হয়ে জন্মেছিলাম।

মনের দুঃখে আমার মা-বাবা শিববনে (হরিদ্বারে) গিয়ে একমনে শিবের তপস্যা করেছিলেন। তাঁদের তপস্যায় সন্তুষ্ট আশুতোষের কৃপায় আমি পুরুষদেহ প্রাপ্ত হই। আমার বারো বছর বয়সে বৃদ্ধ পিতা-মাতা যজ্ঞরাত নামে এক ব্রাহ্মণের কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। এরপর বেশ কিছুকাল কেটে গেল। মানিনীকে নিয়ে আমার সংসারও সুখের হয়ে উঠল। কিন্তু এর মধ্যে একদিন পিতামাতা দেহত্যাগ করলেন।

স্ত্রী মানিনীকে খুব ভালোবাসতাম ঠিকই, কিন্তু পিতা-মাতাকে অনেক শ্রদ্ধা করতাম। তাই তাঁদের মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত হলাম। যথা সময়ে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করলাম। তখন থেকেই আমার মন বিষ্ণুপরায়ণ হয়ে উঠল। বিষ্ণুপূজা, বিষ্ণুনাম জপ প্রভৃতি সেবায় পরিতুষ্ট হয়ে ভগবান শ্রীবিষ্ণু আমার স্বপ্নে আবির্ভূত হলেন। তিনি আমাকে বললেন– "আমার মাতা, আমার পিতা, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র–

এ সবই আমার মায়া? এ মায়াতে যে জড়াবে, তাকেই শোক, দুঃখ, ভয়, জরা, মৃত্যু প্রভৃতির ক্লেশ অনুভব করতে হয়।" কিন্তু আমি শ্রীহরির সে কথার প্রতিবাদ জানাতে চাইলাম। কিন্তু ততক্ষণে তিনি অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। মনে আমার সংশয় রয়ে গেল।

তারপর সেখান থেকে আমি পুরুষোত্তম ধামে শ্রী জগন্নাথ মন্দিরের দক্ষিণ পাশে গৃহ নির্মাণ করে আশ্রয় নিলাম। জগন্নাথদেবের আরাধনা করে, তাঁর নাম-গান আর জপ করতে করতে বারো বছর কেটে গেল।

এরপর এক দ্বাদশীর পারণের দিন বন্ধুগণের সঙ্গে সমুদ্রে স্নান করতে গেলাম।

সমুদ্রের তরঙ্গমালায় নিমগ্ন হয়ে স্নান করছিলাম। হঠাৎ কী যে হলো, আমি আর কোনোমতেই সেখান থেকে উঠতে পারছিলাম না। ঢেউ যেন আমাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে চলে গেল। শত চেষ্টা সত্ত্বেও নোনা জলে হাবুডুবু খাই। একসময় দেখি, হাঙর, বড় বড় মাছ আমাকে ঠোকরাতে শুরু করল। তারপর জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। বায়ুবেগে চালিত হয়ে সমুদ্রের দক্ষিণ কূলে এসে ভিড়লাম।

যখন জ্ঞান ফিরল, দেখলাম আমি বালির উপর মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে আছি। মাথার কাছে বসে আমার মাথায় হাত বুলাচ্ছেন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তখন সন্ধ্যা।

বৃদ্ধের নাম বৃদ্ধশর্মা। সমুদ্রের কাছেই তাঁর বাড়ি। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে থাকেন। তিনি আমাকে সেখান থেকে নিজের বাড়িতে তুলে নিয়ে গেলেন। খুব সেবা-যত্ন করে আমায় সুস্থ করে তুললেন। ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী দুজনেই আমাকে পুত্রের মতো স্নেহ করতে লাগলেন। আমিও তাদের পিতা-মাতারূপে গ্রহণ করলাম এবং সেখানেই থেকে গেলাম।

তখনও আমি যুবক। বৃদ্ধশর্মা আমাকে ব্রাহ্মণ আর আমার সব কিছু জানা আছে দেখে আরো খুশি হয়ে আমাকে তাঁর আরেক সন্তানরূপে গ্রহণ করলেন। তাঁর এক মেয়ে ছিল, নাম চারুমতী। তার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে নিজের বাড়িতেই রেখে দিলেন।

আমি সেখানে চারুমতির সঙ্গে সুখে বাস করতে লাগলাম। কালক্রমে আমার জয়, বিজয়, কমল, বিমল, আর বুধ নামে পাঁচ পুত্রের জন্ম হলো। চারুমতীর সেবার ত্রুটি নেই। ইতোমধ্যে আমার পিতৃ-মাতৃতুল্য শ্বশুর-শাশুড়িও দেহ রেখেছেন। আমারও যথেষ্ট বয়স হয়ে গেছে।

আমার বড় ছেলের নাম ছিল বুধ। চারুমতীর সঙ্গে পরামর্শ করে ধর্মসার নামে এক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণের মেয়ের সঙ্গে তার বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করলাম।

শুভ কাজ করার আগে পিতৃপুরুষ, দেবতা ও ঋষিদের তর্পণার্থে বিবাহের দিন

সকালে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হলাম। তর্পণ ও স্নান সম্পন্ন করে তীরে উঠতে গিয়ে দেখলাম– এ কি! এ যে সেই পুরী ধাম, সেই পরিচিত জন। তারা স্নান ও সন্ধ্যা-আহ্নিক করছে। আমি ভীষণ উদ্বিগ্ন হলাম। ভূপালগণ, পুরুষোত্তমবাসী ব্রাহ্মণেরা বিষ্ণুসেবা ও দ্বাদশীর পারণের আয়োজন করছেন। আমি নিজের বয়স ও রূপ পূর্বের মতোই দেখছি, সামান্যও পরিবর্তন হয়নি। লোকজন আমাকে আমার বিস্ময়ের কারণ জিজ্ঞেস করতে লাগল–অনন্ত তোমার কী হয়েছে? অমন করে কী দেখছ? আমি বললাম, আমি কিছু দেখিনি, শ্রবণও করিনি। কিন্তু আমি কামমোহিত ও আমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত দুর্বল। আমি কি অনন্ত নাকি অন্য কেউ, বুঝতে পারছিলাম না। আমি যে হরির মায়াজালে আবদ্ধ হয়েছি, তা কেউ অনুভব করতে পারল না। তাদের প্রশ্নের কোনো উত্তর আমি দিতে পারিনি। সংবাদ পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে মানিনী এসে হাজির হলো। কিন্তু তাকেও কিছু বলতে পারলাম না। সকলেই ধরে নিল, নিশ্চয়ই আমি হঠাৎ পাগল হয়ে গেছি।

ঠিক সে সময়ই একজন গেরুয়া বসন পরিহিত সন্ন্যাসী এলেন। সকলে মিলে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেল। তাঁকে অনুরোধ করতে লাগল– তিনি যেন আমাকে সুস্থ করে দেন।

সেই সন্ন্যাসী আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে সকলকে অবাক করে দিয়ে বললেন– তোমার নাম অনন্ত না? আজই তো তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহের দিন? বাড়িতে তোমার আত্মীয়-স্বজন-কুটুম্বে ভর্তি, আর তুমি এখানে? তুমি এখানে কীভাবে এলে? তাছাড়া তোমার বয়সই বা এত কমে গেল কী করে? ওখানে তোমাকে দেখেছিলাম সত্তর বছরের বৃদ্ধ। আর এখানে তুমি ত্রিশ বছরের যুবক হলে কী করে?

সন্ন্যাসীর কথা শুনে সকলের আর বিস্ময়ের অন্ত নেই। মানিনী তো কেঁদে আকুল– সন্ন্যাসী ঠাকুর এসব কী বলছেন! দেখে তো তাঁকে পাগল বলে মনে হয় না। একজন সিদ্ধপুরুষ।

একটু থেমে সন্ন্যাসী আবার বললেন– তোমার পুত্রের বিবাহে আমারও নিমন্ত্রণ ছিল। আমিই বা আজ এই পুরীর ঘাটে কীভাবে এলাম?

তারপর চোখ বুজে স্থির হয়ে একটু বসে বললেন– বুঝেছি, এ সবই সেই বিষ্ণুর মায়া। তাছাড়া আর কিছু নয়।

সন্ন্যাসী এ সব কথা বলার পর আমি বললাম–আপনি ঠিকই বলেছেন। বিষ্ণুর মায়া। এই মায়ার ওপর আমার একটু সংশয় ছিল। শুনে নন্ন্যাসী বললেন–বিষ্ণু মায়া দিয়েই তো জগৎকে বেঁধে রেখেছেন। ঐ খেলনা দিয়ে আমাদের ভুলিয়ে রেখেছেন। ব্রহ্মা-শিবেরও এর হাত থেকে নিস্তার নেই, তুমি-আমি কোন ছার।

অনন্ত মুনির জীবনের এই অদ্ভুদ ঘটনা শুনতে শুনতে রাজা-রাজপুত্ররা হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। মুনিবর একটু থামতেই সমস্বরে জিজ্ঞেস করে উঠল–তারপর?

– তারপর সন্ন্যাসীর পরামর্শে এখানে এসে নির্জন স্থান দেখে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে তপস্যায় বসলাম। অনন্ত মুনি আবার বলতে আরম্ভ করলেন–সন্ন্যাসী আরও বলেছিলেন, তপস্যার শেষে কল্কিরূপী স্বয়ং বিষ্ণুকে যখন তুমি দেখবে, জানবে, তোমার সিদ্ধিলাভ হয়েছে।

কত বছর যে আমার তপস্যায় কেটে গেল, জানি না। আজ মুক্তি পেলাম। একথা বলে অনন্ত মনি কল্কিকে পুনরায় প্রণতিজ্ঞাপন করে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। রাজাগণও তাঁর অনুবর্তী হয়ে ব্রত-নিয়মাদি করতে লাগলেন এবং কল্কি ও পদ্মার পূজা করে মুক্তিপথের পথিক হলেন।

বিশ্বকর্মা নির্মিত শম্ভল নগর ও পদ্মাসহিত কল্কির শম্ভল যাত্রা

সিংহলে কিছুদিন অবস্থানের পর কল্কি পদ্মাসহ সেনাগণের সাথে সিংহলদ্বীপ হতে শম্ভল গ্রামে গমন করতে অভিলাষী হলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র কল্কির অভিপ্রায় অবগত হয়ে তৎক্ষণাৎ বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করে বললেন– হে বিশ্বকর্মা, তুমি শম্ভল গ্রামে গমন করে সুবর্ণসমূহ দ্বারা প্রাসাদ, হর্ম্য, অট্টালিকা, গৃহ, উদ্যান প্রভৃতি নির্মাণ কর। রত্ন-স্ফটিক, বৈদুর্য্য প্রভৃতি নানা মণি দ্বারা নানা প্রকার শিল্পকার্য করবে, এমনকি শিল্পবিদ্যাতে তোমার যত নৈপুণ্য আছে তা প্রকাশ করতে সামান্য ত্রুটি করবে না।

তখন দেবরাজ ইন্দ্রের নির্দেশে বিশ্বকর্মা সুবর্ণ, রত্নস্ফটিক, বৈদুর্যাদি মণি দ্বারা দ্বিতল, ত্রিতলবিশিষ্ট প্রাসাদ, হর্ম্য, অট্টালিকা, গৃহাদি নির্মাণ করেন। কোনো গৃহ হংসমুখ, কোনোটি সিংহমুখ, কোনোটি গরুড়মুখ ইত্যাদি। নানা প্রকার বনলতা, উদ্যান, সরোবর প্রভৃতি দ্বারা কল্কির শম্ভল গ্রাম ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় শোভা ধারণ করে।

এদিকে সিংহল দ্বীপে কল্কি সৈন্যসমূহে পরিবৃত হয়ে কারুমতী নগরী হতে বহির্গত হলেন। পরে তিনি সমুদ্রের কূলে সেনা সন্নিবেশ করে সেদিন অবস্থান করলেন।

রাজা বৃহদ্রথ, কন্যাস্নেহে কাতর হয়েমহিষী কৌমুদীর সাথে সেই সমুদ্রকূল পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। তিনি সন্তুষ্ট হৃদয়ে পদ্মাকে ও পদ্মানাথ বিষ্ণুকে বহু গজ, অশ্ব, রথ ও দাসীসহ নানা উপঢৌকন প্রদান করলেন। তিনি বিবিধ বস্ত্র ও বিবিধ রত্ন দান করে ভক্তি ও স্নেহপূর্ণ লোচনে জামাতা ও কন্যার বদনকমলে দৃষ্টিপাত করে রয়েছেন, কোনো কথা বলতে পারলেন না। তিনি কন্যা ও জামাতাকে বিদায় দিয়ে তাঁদের

কর্তৃক পূজিত হয়ে স্বীয় কারুমতী নগরীতে প্রত্যাগমন করলেন।

তারপর, কল্কি সৈন্যগণসহ সাগরজলে অবগাহন করে দেখলেন যে, একটি শৃগাল জলের উপর দিয়ে তীরে যাচ্ছে। তখন তিনি দণ্ডায়মান হলেন। পরে সেই লক্ষ্মীপতি কল্কি, জলস্তম্ভ হয়েছে, নিরীক্ষণ করে সৈন্য ও বাহনগণের সাথে সাগরের উপর দিয়ে চললেন। তিনি সমুদ্র পার হয়ে শুককে বললেন– শুক, তুমি শম্ভল গ্রামে আমার আলয়ে গমন কর। সেখানে বিশ্বকর্মা দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞানুসারে আমার প্রিয় কার্য সাধনের নিমিত্ত বহুসংখ্যক সুশোভন নির্মল গৃহ প্রস্তুত করেছেন। তুমি সেখানে গিয়ে আমার মাতার নিকট ও জ্ঞাতিগণের নিকট যথারীতি আমার কুশল সংবাদ দিবে। পরে আমার বিবাহ প্রভৃতি সমুদায় বৃত্তান্ত বলবে। আমি সেনাসমূহে পরিবৃত হয়ে পশ্চাৎ যাচ্ছি, শম্ভলগ্রামে তুমি অগ্রে গমন কর।

পরম ধীর সর্বজ্ঞ শুক, কল্কির বাক্য শ্রবণ করে আকাশপথে উড্ডীন হয়ে কিয়ৎক্ষণ পরেই দেবগণের আদরণীয় শম্ভল গ্রামে উপস্থিত হলো। এই শম্ভল গ্রাম সপ্তযোজন বিস্তীর্ণ। এখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার বর্ণের বাস। সূর্য্যরশ্মিসদৃশ ধবল ও তেজসম্পন্ন শত শত সৌধসমূহ, চতুর্দিকে শোভা বিস্তার করছে। এই নগর এরূপভাবে নির্মিত ও সন্নিবেশিত হয়েছে যে, কোনো ঋতুতেই কষ্ট হয় না। শুক এই নগরের শোভা সন্দর্শন করতে করতে বিহ্বল হয়ে প্রবেশ করতে লাগলেন। শুক, এক গৃহ হতে অন্য গৃহে, এক প্রাসাদ হতে অন্য প্রাসাদে, কখনোবা প্রাসাদের অগ্রভাগ হতে আকাশে, কখনোবা আকাশ হতে উদ্যানে, উদ্যান হতে অন্য উদ্যানে, বৃক্ষ হতে বৃক্ষে গমন করতে লাগলেন। শুক এরূপ প্রমোদিত চিত্তে বিষ্ণুযশার গৃহে উপস্থিত হলো। পরে বিষ্ণুযশার সমীপে গমন করে মিষ্ট আলাপকরণপূর্বক নানাবিধ প্রিয়কথা বলে সিংহল দ্বীপ হতে পদ্মার সাথে কল্কির আগমন বৃত্তান্ত বর্ণন করল। তখন বিষ্ণুযশা ত্বরান্বিত হয়ে প্রহৃষ্টহৃদয়ে বিশাখযূপ-নামক ভূপতির নিকট এবং মান্য ও প্রধান প্রধান প্রজাগণের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করলেন।

পদ্মাসহিত কল্কির শম্ভলে আগমন

রাজা বিশাখযূপ চন্দন মিশ্রিত জলপূর্ণ স্বর্ণকলস দ্বারা নগর-গ্রাম বিভূষিত করলেন। দেবতাদিগেরও মনোহরণকারী শম্ভল গ্রাম অগুরু আদি সুগন্ধ দ্বারা, আলোকমালা ও সুদৃশ্য সুগন্ধী পুষ্পমালা দ্বারা, রম্ভা (কলা), পূগ (সুপারি) প্রভৃতি ফল দ্বারা, লাজ (খৈ), অক্ষত (আতপ চাল), নবপল্লব (অগ্রপল্লব) প্রভৃতি দ্বারা অপূর্ব শোভা ধারণ করল। কামিনীগণের নয়নের আনন্দমন্দির-স্বরূপ পরম সুন্দর কৃপানিধি কল্কি, ভয়জনক সেনাগণ পরিবৃত হয়ে সেই নগরে প্রবেশ করতে লাগলেন। তিনি পদ্মার সাথে একত্র হয়ে মাতা-পিতার চরণে প্রণাম করলেন। দেবলোকে দিতি যেমন ইন্দ্র ও শচীকে দেখে পূর্ণকামা ও আনন্দিতা হয়েছিলেন, তার ন্যায় সতী সুমতি পুত্র কল্কিকে এবং পুত্রবধূ পদ্মাকে দেখে আনন্দিতা ও পূর্ণমনোরথা হলেন। পতাকাধ্বজশালিনী শম্ভল নগরীরূপ রমণীও ঈশ্বর কল্কিকে পতিস্বরূপ পেয়ে শোভা ধারণ করল। অন্তঃপুর তার জঘন স্বরূপ, প্রাসাদ তার পীনস্তন স্বরূপ, ময়ূর তার চুচক স্বরূপ, হংসমালা তার মনোহর মুক্তাহার স্বরূপ, বিবিধ গন্ধ দ্রব্যের ধূমপটল তার বসন স্বরূপ, কোকিলস্বর তার বাক্য স্বরূপ, গোপুর তার সহাস্য বদন স্বরূপ; সুতরাং, সেই শম্ভল নগরী বামনয়না গুণবতী অঙ্গনা স্বরূপ শোভা পেতে লাগল। অজ, সর্বাশ্রয়, পাপবিনাশন কল্কি সেই শম্ভল নগরে পদ্মার সাথে আমোদ-প্রমোদে বহু বর্ষ অতিবাহিত করলেন।

কল্কি ও পদ্মার পুত্রদ্বয় লাভ

কল্কি ও পদ্মার শুভ পরিণয়ের কিছুকাল পর কবির কামকলা-নাম্নী পত্নীতে বৃহৎকীর্তি ও বৃহদ্বাহু নামে মহাবল পরাক্রান্ত পরম ধার্মিক দুটি পুত্র উৎপন্ন হলো। প্রাজ্ঞের পত্নী সম্মতিও দুটি পুত্র প্রসব করলেন। এই দুই পুত্রের নাম যজ্ঞ ও বিজ্ঞ। তারা জিতেন্দ্রিয় ও সকল লোকের পূজিত। সুমন্ত্রের পত্নী মালিনীর গর্ভে, শাসন ও বেগবান নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হলো। এ দুই পুত্র সাধুদিগের উপকারী। কল্কি হতে পদ্মার গর্ভে জয় ও বিজয় নামক দুই পুত্র জন্মপরিগ্রহ করল। এ দুই পুত্র লোকবিখ্যাত ও মহাবল পরাক্রান্ত।

কল্কির কীকট জয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা

শম্ভল নগরে যখন কল্কিদেবের আবির্ভাব ঘটেছে, তার আগে থেকেই কীকট দেশ বৌদ্ধ আর ম্লেচ্ছদের অধিকারে। তারপর থেকে তাদের প্রতাপ এমন বাড়তে শুরু করল যে, আশেপাশের দেশও ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতে লাগল।

কীকটপুর অতীব বিস্তীর্ণ নগর। এটা বৌদ্ধদিগের প্রধান আলয়। এই দেশে বৈদিক ধর্মের অনুষ্ঠান নেই। এখানকার লোকেরা পিতৃ অর্চনা বা দেব অর্চনা করে না এবং পরলোকের ভয়ও রাখে না। তাদের অধিকাংশই দেহকেই প্রকৃত স্বরূপ (আত্মা) বলে মনে করে। তারা দৃশ্যমান শরীর ভিন্ন অন্য আত্মা স্বীকার করে না। ধন বিষয়ে, স্ত্রীপরিগ্রহ বিষয়ে বা ভোজন বিষয়ে তাদের কোনো বিচারবোধ নেই। এ দেশে নানা প্রকার মনুষ্য আছে। তারা সকলেই পান-ভোজনাদি রূপ জড়জাগতিক সুখ-সাধনেই কালাতিপাত করে।

ইতোমধ্যে সংবাদ এলো, বৌদ্ধ আর ম্লেচ্ছতে কীকট দেশ নাকি দুর্ভেদ্য হয়ে গেছে। আর বৌদ্ধসেনারা এমন বিক্রমশালী হয়ে উঠেছে, যেকোনো মুহূর্তে তারা মারাত্মক কাণ্ড ঘটাতে পারে।

এরই মধ্যে প্রভু কল্কি তাঁর সমস্ত পরিবারে পরিবৃত ও সর্ব-সম্পৎ সমন্বিত হলেন। তিনি পিতাকে অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে উদ্যত দেখে বললেন, আমি দিক্‌পালগণকে পরাজয় করে ধন সংগ্রহপূর্বক আপনাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করাব, এক্ষণে দিগ্বিজয়ার্থ যাত্রা করি।

পরপুরঞ্জয় কল্কি একথা বলে প্রীতিপূর্বক পিতাকে নমস্কার করে তিনি সেনাসমূহে পরিবৃত হয়ে কীকটপুর জয় করার নিমিত্ত বহির্গত হলেন।

এরপর, কীকটপুরে জিন যখন জানতে পারল যে, কল্কি অনুচরবর্গে পরিবৃত হয়ে যুদ্ধার্থ আগমন করেছেন, তখন তিনি কল্কির দুই অক্ষৌহিণী সেনার সাথে

সংগ্রাম করবার জন্য নগর হতে বহির্গত হলেন। শত শত তুরগ, রথ, হস্তি দ্বারা সুবর্ণ-বিভূষণ-বিভূষিত শত শত সুবর্ণ রথিদ্বারা, অস্ত্র শস্ত্রধারী পদাতিকসমূহ দ্বারা ভূতল সমাচ্ছাদিত হলো। সেনাগণের পতাকাসমূহে আতপ নিবারিত হতে লাগল। যুদ্ধার্থীরা অভূতপূর্ব শোভা ধারণ করল।

কল্কিদেবের কীকট জয়

এরপর, সিংহ যেমন হস্তিনীকে আক্রমণ করে, তদ্রুপ সর্ববিজয়ী বিষ্ণু কল্কি সেই বৌদ্ধসেনাকে আক্রমণ করলেন। নায়করূপ সেনানায়ক কল্কি বললেন– রে বৌদ্ধগণ, তোমরা রণাঙ্গন হতে পলায়ন করো না, নিবৃত্ত হও, যুদ্ধ করো, তোমাদের যতদূর ক্ষমতা আছে, তা দেখাতে ত্রুটি করো না। জিন প্রথমত হীনবল হয়েছিল, সে কল্কির এ বাক্য শ্রবণ করে ক্রোধভরে খড়্গচর্ম গ্রহণপূর্বক বৃষারূঢ় হয়ে যুদ্ধ করবার জন্য কল্কির প্রতি ধাবমান হলো। সেই বৌদ্ধসেনা বিবিধ অস্ত্র গ্রহণপূর্বক কল্কির সাথে যুদ্ধ করতে লাগল। সেই সংগ্রাম নিপুণ জিন, এরূপ যুদ্ধ করতে আরম্ভ করল যে, তা দর্শনে দেবগণও বিস্মিত হলেন। সে শূল দ্বারা অশ্বকে বিদ্ধ করে পরে কল্কিকে মোহিত ও অচেতন করে ফেলল। তারপর সে ত্বরান্বিত হয়ে তাঁকে হরণ করে নিয়ে যাবার মানসে ক্রোড়ে করে তোলার চেষ্টা করল, কিন্তু কোনো মতেই তুলতে পারল না। তখন জিন, কল্কিকে বিশ্বম্ভরমূর্তি জানতে পেরে ক্রোধে আকূলীকৃত-লোচন হলো। পরে সে কল্কিকে বন্দীর ন্যায় বিবেচনা করে তাঁর তনুত্রাণ ও অস্ত্রশস্ত্র ছেদন করে দিলো।

রাজা বিশাখযূপ এ সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করে জিনকে গদাঘাতে আহত করলেন এবং অবলীলাক্রমে মূর্ছিত কল্কিকে গ্রহণ করে স্বীয় রথে আরূঢ় হলেন। কল্কিও সংজ্ঞা লাভ করে অনুচরবর্গকে উৎসাহ প্রদান করতে লাগলেন। পরে তিনি রাজা বিশাখযূপের রথ হতে লম্ফ-প্রদান করে জিনের প্রতি ধাবমান হলেন। মহাসত্ত্ব কল্কি-অশ্বও শূলব্যথা পরিহারপূর্বক সংগ্রামভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে লম্ফ, ভ্রমণ, পদাঘাত, দন্তাঘাত ও কেশর-বিক্ষেপ দ্বারা বৌদ্ধসেনাগণের মধ্যস্থিত শত শত সহস্র সহস্র বিপক্ষকে ক্রোধভরে বিনাশ করল। কোনো কোনো যোদ্ধা, উক্ত ভীষণ অশ্বের নিঃশ্বাসবায়ু দ্বারা উড্ডীন হয়ে দ্বীপান্তরে পতিত হলো, কেউবা ঐ নিঃশ্বাসবায়ুতে প্রক্ষিপ্ত হওয়ামাত্র হস্তী, অশ্ব ও রথাদিতে প্রতিহত হয়ে রণভূমিতেই পতিত হতে লাগল। গর্গ ও তদীয় অনুচরবর্গ, অল্প সময়ের মধ্যে ছয় সহস্র বৌদ্ধসেনা বিনাশ

করলেন। সসৈন্য ভর্গ্যও এক কোটি এক নিযুত সৈন্য সংহার করেন। বিশাল ও তার সেনারা পঁচিশ সহস্র বৌদ্ধসেনা পরাভব করলেন। কবি, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়ে পুত্রদ্বয়ের সাহায্যে দুই অযুত বিপক্ষসেনা সংহার করেন। এরূপ প্রাজ্ঞ দশ লক্ষ ও সুমন্ত্র পাঁচ লক্ষ সৈন্যকে পরাভব করে রণশায়ী করলেন।

তখন কল্কি হাস্য করে জিনকে বললেন, রে দুর্মতে, পলায়ন করো না, সম্মুখে এসো। সর্বত্র শুভাশুভ ফলদাতা অদৃষ্টস্বরূপ আমাকে বিবেচনা করবে। তুমি এখনই আমার শরনিকর দ্বারা বিদীর্ণদেহ হয়ে পরলোকে গমন করবে, তখন কেউ তোমার সহগামী হবে না। অতএব, ইতোমধ্যে তুমি বন্ধুবান্ধবগণের ললিত মুখ দেখে নাও।

বলবান জিন কল্কির এই বাক্য শ্রবণ করে হাস্যপূর্বক বলল, অদৃষ্ট কখনোই প্রত্যক্ষ হয় না। আমরা প্রত্যক্ষবাদী বৌদ্ধ (নাস্তিক)। আমরা প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কিছুই স্বীকার করি না। শাস্ত্রে কথিত আছে, অদৃষ্ট ও অপ্রত্যক্ষ বিষয় মাত্রই আমাদের দ্বারা হত হবে। অতএব, তোমরা বৃথা পরিশ্রম করছ। যদিও তুমি দৈবস্বরূপ হও, তথাপি আমরা এই সম্মুখে দণ্ডায়মান হলাম। যদি তুমি আমাকে বাণদ্বারা বিদ্ধ করতে পারো, তাহলে বৌদ্ধেরা কি তোমাকে ক্ষমা করবে? তুমি যে আমার প্রতি তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করলে তা তোমার প্রতিই সংক্রান্ত হোক, স্থির হও। জিন একথা বলে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা কল্কিকে সমাচ্ছাদিত করলেন। সূর্য-দর্শনে যেমন হিমবর্ষণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তার ন্যায় কল্কি হতে সেই বাণবর্ষণ ক্ষয় প্রাপ্ত হতে লাগল। ব্রহ্মাস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য সমুদয় অস্ত্র, কল্কির দর্শনমাত্রই ক্ষণকালমধ্যে নিস্ফল হলো। মরুভূমিতে উপ্ত বীজের ন্যায়, অপাত্রে দত্ত বস্তুর ন্যায়, সাধু লোকের দ্বেষপূর্বক বিষ্ণুতে অর্পিত ভক্তির ন্যায় জিনের সমুদায় অস্ত্র বিফল হতে লাগল।

এরপর কল্কি লম্ফ প্রদানপূর্বক বৃষারূঢ় জিনের কেশ গ্রহণ করলেন। তখন তাম্রচূড় পক্ষীর ন্যায় উভয়েই ভূমিতে পতিত হয়ে ক্রোধপূর্বক মল্লযুদ্ধ করতে লাগলেন। জিন ভূমিতে পতিত হয়ে এক হস্তে কল্কির কেশ ও এক হস্তে তাঁর হস্ত ধারণ করলেন। পরে চানুর ও কেশবের ন্যায় উভয়ে তৎক্ষণাৎ ভূমি হতে উত্থিত হলেন। উভয়ে উভয়ের কেশ ও হস্ত ধারণ করলেন। এ দুই মহাবীর নিরায়ুধ হয়ে মহাবল ভল্লুকদ্বয়ের ন্যায় মল্লযুদ্ধ করতে লাগলেন।

তারপর মত্ত হস্তী যেমন তালবৃক্ষ ভঙ্গ করে, তার ন্যায় মহাযোদ্ধা কল্কি,পদাঘাত দ্বারা জিনের কটিদেশ ভঙ্গ করে ভূতলে পতিত করলেন। বৌদ্ধ সেনারা জিনকে রণভূমিতে পতিত দেখে হা হা শব্দে চীৎকার করতে লাগল। ব্রাহ্মণগণ শত্রু নিপাত হওয়াতে কল্কি সেনাগণের আর আহ্লাদের পরিসীমা থাকল না।

এই রূপে জিন রণশায়ী হলে তার ভ্রাতা মহাবল শুদ্ধোদন, গদা গ্রহণপূর্বক পাদচারী হয়ে কল্কিকে বিনাশ করবার উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ ধাবমান হলো। তখন গজপৃষ্ঠে সমারূঢ় বিপক্ষ-বীর-সংহারক কবি, বাণবর্ষণ-দ্বারা শুদ্ধোদনকে সমাচ্ছাদিত করে সিংহের ন্যায় গর্জন করতে লাগলেন। ধর্মজ্ঞ কবি, শুদ্ধোদনকে গদাপাণি ও পাদচারী অবলোকন করে নিজেও হস্তী হতে অবতরণপূর্বক পাদচারী হয়ে গদা গ্রহণপূর্বক শুদ্ধোদনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হলেন। ভীমবিক্রম শুদ্ধোদনও তাঁর সাথে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন। হস্তী যেমন বিপক্ষ হস্তীর সাথে দন্তদ্বারা যুদ্ধ করে, তদ্রুপ গদাযুদ্ধবিশারদ মহাবীর কবি ও শুদ্ধোদন, উভয়ে গদাদ্বারা যুদ্ধ করতে লাগলেন। উভয়ে রণমত্ততা প্রযুক্ত ভীষণ শব্দ করতে আরম্ভ করলেন এবং গদাদ্বারা গদাঘাত নিবারণ করতে লাগলেন। তখন কবি সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্বক গুরুতর গদাঘাতে শুদ্ধোদনের হস্ত হতে গদা অপনয়ন করে তৎক্ষণাৎ স্বীয় গদা দ্বারা তাঁর বক্ষঃস্থলে আঘাত করলেন। বীর শুদ্ধোদন, গদাঘাতে আহত হয়ে তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হলো। পরে সে তৎক্ষণাৎ উত্থিত হয়ে স্বীয় গদা গ্রহণপূর্বক তা দ্বারা কবির মস্তকে প্রহার করল। কবি সেই গদাদ্বারা তাড়িত হয়ে ভূমিতে পতিত হলেন না বটে, কিন্তু বিকলেন্দ্রিয় ও অচৈতন্য প্রায় হয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকলেন। পরে শুদ্ধোদন তাঁকে মহাবল পরাক্রান্ত ও সহস্র সহস্র রথি কর্তৃক পরিবৃত দেখে তৎক্ষণাৎ মায়াদেবীকে আনয়ন করবার জন্য গমন করলেন। এই মায়াদেবীকে দর্শন করামাত্র দেব অসুর মনুষ্য প্রভৃতি ত্রিলোকস্থ সমুদায় প্রাণীই নিস্তেজ ও প্রতিমার ন্যায় নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকে।

শুদ্ধোদন প্রভৃতি বৌদ্ধগণ, সেই মায়াদেবীকে সম্মুখে রেখে লক্ষ লক্ষ ম্লেচ্ছ সেনাগণে পরিবৃত হয়ে পুনর্বার যুদ্ধ করার জন্য উপস্থিত হলো। মায়াদেবী, সিংহধ্বজ-সুশোভিত রথে আরূঢ় হয়ে বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র প্রকাশ করতে লাগলেন। বহু কাক ও শৃগাল তাঁর চতুর্দিকে বেষ্টন করে ঘোরতর শব্দ করতে আরম্ভ করল। কল্কি সেনাগণ, নানারূপ-ধারিণী বলবতী ত্রিগুণস্বরূপা মায়াদেবীকে সম্মুখে অবলোকন করে একে একে প্রায় সকলেই পতিত হলো। শস্ত্রপাণি যোদ্ধারা নিস্তেজ ও প্রতিমাসদৃশ স্তব্ধ হয়ে থাকল।

তখন বিভু কল্কি, স্বীয় ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও সুহৃদ্বর্গকে মায়া কর্তৃক অভিভূত ও জর্জরিত হতে দেখে তার সমীপবর্তী হলেন। ঈশ্বর হরি, শ্রীরূপা বরারোহা মায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করামাত্র সেই মায়াও প্রিয়তমা ভার্যার ন্যায় তাঁর শরীরে প্রবিষ্টা ও লীন হলেন। প্রধান প্রধান বৌদ্ধগণ, তাদের জননী সেই মায়াদেবীকে দেখতে না পেয়ে বল ও পৌরুষহীন হওয়াতে শত শত ব্যক্তি একত্র হয়ে পুনঃ পুনঃ আর্তনাদ করতে লাগল।

এদিকে কল্কিও তাঁর দিব্য দৃষ্টিপাত দ্বারা নিজ সেনাগণকে উত্থাপিত করে সুতীক্ষ্ণ অসি গ্রহণপূর্বক ম্লেচ্ছগণকে বিনাশ করতে অভিলাষী হলেন। তিনি অশ্বারূঢ় হয়ে দৃঢ় হস্তে খড়গমুষ্টি ধারণ করলেন। শরসমূহ-সুশোভিত তূণীর ও শরাসন শোভা বিস্তার করল। তনুত্রাণের উপরিভাগে সুবর্ণ-বিন্দু থাকাতে মেঘোপরি বিন্যস্ত তারার ন্যায় শোভা ধারণ করল। কিরীটের (মুকুটের) অগ্রভাগে বিন্যস্ত নানা প্রকার মণি শোভা পেতে লাগল। তিনি বিপক্ষ-পক্ষকে বিক্ষিপ্ত করবার জন্য তাদের প্রতি রুক্ষ কটাক্ষ নিক্ষেপ করতে লাগল। তাঁর পাদপদ্ম সন্দর্শনে ভক্ত জনের মন উল্লসিত হলো। ধর্মনিন্দক বৌদ্ধরা কামিনীগণের নয়নানন্দ-ধারার রস-মন্দির-স্বরূপ সেই কল্কিকে অবলোকন করে ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ল।

ধর্মনিন্দুকগণ পরাস্ত হওয়াতে পুনর্বার যজ্ঞস্থলে হুতাশনে আহুতি প্রদত্ত হবে বলে দেবগণ পরম প্রীত হলেন।

তারপর কল্কি ম্লেচ্ছদের শরনিকর দ্বারা বিদ্ধ করে, করবাল দ্বারা ছেদন করে যমালয়ে প্রেরণ করলেন। এরূপ বিশাখযূপ, কবি, প্রাজ্ঞ, সুমন্ত্র, গার্গ্য, ভর্গ্য, বিশাল প্রভৃতি বীরগণও ঐ ম্লেচ্ছদিগকে যমালয়ে পাঠালেন। কপোতরোমা, কাকাক্ষ, কীককৃষ্ণ প্রভৃতি বৌদ্ধ ও শৌদ্ধদনগণ এসে কল্কিসেনার সাথে সংগ্রাম করতে লাগল। এরূপ ঘোরতর যুদ্ধ হলো যে, সর্ব প্রাণীর ভয় জন্মাল। তা দর্শনে সর্বসংহারক তমোময় ভুতনাথ আনন্দিত হলেন। শোণিতদ্বারা রক্তবর্ণ কর্দমে সংগ্রামভূমি আচ্ছন্ন হলো। যে সকল গজ, অশ্ব ও রথী পতিত হতে লাগলো, তাদের শোণিত-প্রবাহে যেন নদী প্রবাহিত হলো। ঐ নদীতে কেশরাশি শৈবালের ন্যায় শোভা পেতে লাগল। অশ্বরূপ গ্রাহগণ স্রোতের মধ্যে মগ্ন হলো। শরাসন সকল তরঙ্গের ন্যায় লক্ষিত হতে লাগল। হস্তিসকল এই দুস্পার নদীর পুলিনের ন্যায় শোভা ধারণ করল। এই শোণিত-নদীতে ছিন্ন মস্তক কূর্মের ন্যায়, রথ নৌকার ন্যায়, ছিন্ন বাহু মৎস্যের ন্যায়, দুন্দুভিধ্বনি জল-কল্লোল শব্দের ন্যায়, শোভা পেতে লাগল। এই শোণিত নদীতীরে শৃগাল ও শকুনের আনন্দধ্বনি হতে লাগল।

গজারূঢ় যোদ্ধা গজারূঢ় যোদ্ধার সাথে, অশ্বারূঢ় যোদ্ধা অশ্বারূঢ় যোদ্ধার সাথে, উষ্ট্রারূঢ় যোদ্ধা উষ্ট্রারূঢ় যোদ্ধার সাথে, রথী রথীর সাথে সংগ্রাম করে শরনিকর দ্বারা বিদ্ধ ও ছিন্নপদ ও ছিন্নমস্তক হয়ে পতিত হতে লাগল। কোনো কোনো যোদ্ধা পরাস্ত ও ভীত হওয়াতে রক্তবস্ত্র, ভস্মাচ্ছাদিতবদন ও আলুলায়িত কেশ হয়ে সন্ন্যাসীর ন্যায় নিবারিত হলেও দেশান্তরে গমন করল। কেউ কেউ ব্যস্ত হয়ে পলায়নে প্রবৃত্ত হলো, কেউবা পুনঃ পুনঃ জল প্রার্থনা করতে লাগল। এইরূপে কল্কি-সেনাগণের বাণদ্বারা বিদ্ধ ম্লেচ্ছসেনারা কেউ কুশলে থাকল না।

ম্লেচ্ছ সেনারা পরাস্ত হলে তাদের পত্নীরা কেউ রথারূঢ় হয়ে, কেউ গজারূঢ় হয়ে, কেউ অশ্বারূঢ় হয়ে, কেউ গর্দভারূঢ় হয়ে, কেউ উষ্ট্রারূঢ় হয়ে, কেউ বৃষারূঢ় হয়ে পতির সহযোগীরূপে যুদ্ধার্থে সমাগত হলো। এ সকল উজ্জ্বলকান্তি কামিনীরা নানাভরণে ভূষিত যুদ্ধসজ্জায় সুসজ্জিত হয়ে খড়গ, শক্তি শরাসন ও বাণ ধারণ করে এসেছিল। তারা পিতা বা পতির নিধনে কাতর হয়ে কল্কিসেনার সাথে সংগ্রাম করতে অগ্রসর হলো।

ম্লেচ্ছকামিনীরা স্ব স্ব পতিদের বাণদ্বারা বিদ্ধ ও বিহ্বল দেখে তাদের পশ্চাদ্ভাগে রেখে অস্ত্র গ্রহণপূর্বক কল্কিসেনার সাথে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলো। কল্কিসেনাগণ, সেই সকল অবলাকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখে বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে কল্কির নিকট উপস্থিত হয়ে যত্নপূর্বক সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করল। মহামতি কল্কি, যুদ্ধার্থিনী রমণীদিগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করে প্রহৃষ্ট হৃদয়ে রথারূঢ় সেনাগণের সাথে ও অনুচরবর্গের সাথে সেই স্থানে উপস্থিত হলেন। সেই পদ্মাপতি কল্কি, নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র-ধারিণী নানা বাহনে সমারূঢ় ব্যূহরচনাপূর্বক শ্রেণিবদ্ধ হয়ে অবস্থিতা সেসকল ম্লেচ্ছকামিনীকে অবলোকন করে বলতে আরম্ভ করলেন।

কল্কি বললেন, অবলাগণ, আমি তোমাদের হিত ও উত্তম বাক্য বলছি, শ্রবণ করো। স্ত্রীলোকের সাথে পুরুষের যুদ্ধ করা অনুচিত। তোমাদের এই চন্দ্র-সদৃশ বদনে অলক-রাজি শোভা বিস্তার করছে। তা দর্শনে সকলেরই মনে আনন্দ হয়। কোন পুরুষ এই মুখে প্রহার করবে?

ম্লেচ্ছকামিনীগণ কল্কির এই বাক্য শ্রবণ করে হাস্যপূর্বক বলল, মহাত্মন, আপনি যখন আমাদের পতিকে বিনাশ করেছেন, আমরা তখনই বিনষ্ট হয়েছি। স্ত্রীগণ এই কথা বলে কল্কিকে বিনাশ করতে উদ্যত হলো। তারা যে সকল অস্ত্র পরিত্যাগ করতে লাগল, তা তাদের হাতেই থাকল, কোনোক্রমেই তাদের হাত থেকে বিচ্যুত হলো না। তখন খড়গ, শক্তি, ধনু, বাণ, শূল, তোমর, যষ্টি প্রভৃতি সমুদায় অস্ত্র-শস্ত্র মূর্তিমান হয়ে সম্মুখে অবস্থান-পূর্বক সুবর্ণ বিভূষিত সেসকল ম্লেচ্ছকামিনীকে বলল– হে রমণীগণ, আমরা যাঁর থেকে তেজ প্রাপ্ত হয়েছি, তাঁকে সেই পরমাত্মা সর্বময় ঈশ্বর বলে জানবে। আমরা এই ঈশ্বরের অনুজ্ঞাক্রমে বিচরণ করে থাকি, তাঁর থেকে আমরা নাম-রূপ প্রাপ্ত ও বিখ্যাত হয়েছি। এই কল্কিই সেই পরমাত্মা। তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই কাল, স্বভাব, সংস্কার, নাম প্রভৃতির আদিভূত পরম প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারতত্ত্ব প্রভৃতি সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করছে। সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়রূপ জগৎপ্রপঞ্চ, তাঁর মায়া ভিন্ন আর কিছুই নাই। তিনি সকলের আদি, তিনিই সকলের অন্ত। তাঁর থেকে জগতের সমুদায় শুভ সংঘটিত হচ্ছে। সেই ঈশ্বরই তিনি।

দৈত্যপতি প্রহ্লাদের কথানুসারে, শ্রীহরি যখন নৃসিংহ মূর্তি ধারণ করেছিলেন, তখন তাঁকে যেমন আমরা আঘাত করতে পারিনি, সেরূপ কল্কি ও তাঁর সেবকগণকেও আঘাত করতে সমর্থ নই।

স্ত্রীগণ অস্ত্র সমুদায়ের এই বাক্য শ্রবণ করে বিস্ময়াক্রান্ত হৃদয় হলো। তখন তারা স্নেহ ও মোহ পরিত্যাগপূর্বক সেই কল্কির শরণাগত হলো। পদ্মাপতি কল্কি, সেই সমুদায় ম্লেচ্ছকামিনীকে জ্ঞান ও নিষ্ঠা দ্বারা প্রণত হতে দেখে ঈষৎ হাস্য করে পাপপুঞ্জ বিনাশক ভক্তি বলতে আরম্ভ করলেন। পরে তিনি আত্মনিষ্ঠ জ্ঞানযোগ ও ভেদজ্ঞানের কারণ কর্মযোগ এবং কীসে অদৃষ্টাধীন হতে না হয়, তা সেই সমুদায় স্ত্রীগণের নিকট বললেন। পরে স্ত্রীগণ কল্কির বাক্যে জ্ঞান লাভ করে জিতেন্দ্রিয়া হয়ে ভক্তি দ্বারা যোগীদিগের দুর্লভ পরমপদ মোক্ষ প্রাপ্ত হলো।

এইরূপে ভীমকর্মা কল্কি, ভীষণ যুদ্ধ করে বৌদ্ধ ও ম্লেচ্ছগণকে বিনাশ করলেন। পরে তিনি তাদের স্ত্রীগণকে মুক্তিপদ প্রদান করে মৃত ঐ ম্লেচ্ছ ও বৌদ্ধদিগকে জ্যোতির্ময় স্থানে প্রেরণ করে শোভা পেতে লাগলেন। এভাবে কীকট দেশের প্রতাপ নিশ্চিহ্ন করলেন কল্কিদেব।

রাক্ষসী কুথোদরী ও কল্কিদেব

কীকট দেশ জয় করে কল্কিদেব সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে চক্রতীর্থে এসে যথাবিধানে স্নান করলেন। হঠাৎ কয়েকজন মুনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে হে জগৎপতি, রক্ষা কর বলতে বলতে সেখানে উপস্থিত হলেন। কল্কিদেব তাঁদের সমাদর করে বললেন–দেখে মনে হচ্ছে আপনারা খুবই সন্ত্রস্ত। কি এমন হয়েছে যে, আপনারা এত ভীত হয়ে পড়েছেন? কে আপনাদের তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে?

মুনিরা বললেন–দেব, আমরা অনেকদিন ধরে ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছি শুধু আপনারই অপেক্ষায়।

কল্কিদেব বললেন–আপনারা নির্ভয়ে বলুন, কে সে আপনাদের সাধনায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। যদি সে দেবরাজ ইন্দ্র হয়, জেনে রাখুন, আমার হাত থেকে সে রেহাই পাবে না।

–না দেব। এ এক বিকটাকার রাক্ষসী। কালঞ্জক রাক্ষসের স্ত্রী কুথোদরী। কুম্ভকর্ণের নাতনি, নিকম্ভের কন্যা। এর একটা ছেলে আছে। পাঁচ বছর বয়স হবে–নাম বিকুঞ্জ। এই রাক্ষসীর নিঃশ্বাসে সব সময় যেন ঝড় বইছে। আমরা কোনোমতেই স্থির হয়ে বসতে পারছি না। হিমালয়ে আমাদের তপোবনে হাল যা হয়েছে তা আর বলার নয়। দেব, আপনি আমাদের ঐ রাক্ষসীর হাত থেকে বাঁচান। মুনিদের প্রার্থনায় কল্কিদেব তৎক্ষণাৎ সেনাসমেৎ প্রস্তুত হয়ে মুনিদের অনুসরণ করে চললেন।

রাত্রি নেমে এলো দেখে কল্কিদেব নৌবাহিনী নিয়ে হিমালয়ের একটা উপত্যকায় রাত কাটালেন। পরদিন সকাল হতেই আবার যাত্রা শুরু হলো। মুনিগণের পথ ধরে আর কিছুদূর এগোতেই দেখা গেল সেই রাক্ষসীকে। কালো মেঘের মতো গায়ের রং। পাহাড় জুড়ে যেন বসে আছে। পুত্র বিকুঞ্জ তার স্তন পান করছে।

দেখামাত্রই সেনারা রাক্ষসীকে লক্ষ্য করে তীর-ধনুক, শূল-ত্রিশূল ছুঁড়তে উদ্যত হলো। কল্কিদেব বাধা দিলেন। বললেন– না, না। ও কাজ কোরো না। আমি স্বয়ং

তার কাছে যাব। আমার সঙ্গে সামান্য গজারোহী আর অশ্বারোহী যাবে। বাকি তোমরা এই গুহার চারদিকে অগ্নি সংযোগ কর।

সামান্য কজন সৈন্য নিয়ে কল্কিদেব এগোলেন। খানিকটা দূর থেকে রাক্ষসীকে লক্ষ্য করে একটা বাণ ছুঁড়লেন। সজোরে তীরটা গিয়ে রাক্ষসীর বুকে আচমকা বিঁধতেই সে এমন ভীষণ গর্জন করে উঠল যে, গোটা পাহাড়টা যেন কেঁপে উঠল, আর সেনাপতিরা প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। দেবগণ, গন্ধর্বগণ হাহাকার করতে লাগলেন। মুনিরা রাক্ষসীকে শাপ দিতে শুরু করলেন। ঋষিরা যে যেখানে ছিলেন, সকলে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। সেনারা রোদন করতে লাগল।

তখন কল্কিদেব একটা বাণ দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলন করলেন। তারপর বৃহৎ খড়্গ উত্তোলন করে রাক্ষসীর উদর বিদীর্ণ করলেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বে আরেকবার বিকট আর্তনাদ করে উঠল কুথোদরী। তারপর সেনারা তার দেহ ছিন্নভিন্ন করে দিল।

মাতার এ অবস্থা দেখে পাঁচ বছরের পুত্র বিকঞ্জ মহাক্রোধে সেনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সুবিশাল দেহদ্বারা সে সেনাদের নানাভাবে পীড়া দিতে লাগল।

কল্কিদেব আর কালবিলম্ব না করে গুরুদেব পরশুরাম প্রদত্ত ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা তার মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ভূপতিত করলেন। দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি ও মুনিগণ স্তব করতে লাগলেন।

তারপর কল্কি সেখান থেকে হরিদ্বারস্থ গঙ্গাতীরে গমন করে সেনা সংস্থাপন করলেন। সেখানে রাত্রিযাপন করে প্রাতঃকালে দেখলেন, মুনিগণ গঙ্গাস্নানছলে তাঁকে দর্শনের নিমিত্ত ব্যাকুলিত হয়ে আসছেন।

হরিদ্বারে গঙ্গাতীরের অদূরে নিজগণের সহিত কল্কি বাস করছেন এবং গঙ্গাকে দর্শন করছেন, এমন সময় মুনিগণ এলেন এবং দর্শনপূর্বক পুনঃপুনঃ স্তব করলেন।

কল্কির সহিত দেবাপি ও মরুর সাক্ষাৎ

পরমধার্মিক কল্কি মুনিগণকে সুখাগত ও সুখাসীন দেখে যথাবিধানে অর্চনাপূর্বক বললেন– সাক্ষাৎ সূর্যের ন্যায় তেজস্বী, তীর্থভ্রমণে উৎসুক, ত্রিলোকের হিতসাধনে রত আপনারা কারা? আজ আমার ভাগ্যবশত আপনারা এ স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আজ আমরা লোকমধ্যে পুণ্যবান, ভাগ্যবান এবং যশস্বী হলাম, যেহেতু আপনারা আজ আমাদের কৃপা কটাক্ষ দ্বারা অবলোকন করলেন।

বামদেব, অত্রি, বশিষ্ঠ, গালব, ভৃগু, পরাশর, নারদ, অশ্বত্থামা, পরশুরাম, কৃপাচার্য, দুর্বাসা, দেবল, কণ্ব, দেবাপি, মরু প্রমুখ মহাত্মাগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মরু বললেন– আপনি হৃদয়স্থ পরমাত্মা, অন্তর্যামী। প্রভু, আপনি সকলই জানেন। আপনার আজ্ঞায় সমস্ত বলছি, শ্রবণ করুন। আপনার নাভি হতে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি হতে মনু, মনু হতে সত্যবিক্রম ইক্ষাকু জন্মগ্রহণ করেন। ইক্ষাকুর পুত্র যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা, মান্ধাতার পুত্র পুরুকুৎস, পুরুকুৎস হতে মহামতি অনরণ্য উৎপন্ন হন। অনরণ্যের পুত্র ত্রসদস্যু, তাঁহা হতে হর্যশ্ব, হর্যশ্বের পুত্র তরুণ। তরুণের পুত্র ধীসম্পন্ন ত্রিশঙ্কু হতে প্রতাপান্বিত হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রহিত, রহিতের পুত্র ভরুক, ভরুকের পুত্র বৃক, বৃকের পুত্র সগর, সগরের পুত্র অসমঞ্জা, অসমঞ্জা হতে অংশুমান উৎপন্ন হন। অংশুমানের পুত্র দিলীপ, তাঁর পুত্র ভগীরথ বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর আনীত বলে এই গঙ্গা ভাগীরথী নামে বিখ্যাত আছেন। আপনার চরণ সম্ভূত বলে লোকে তাঁর স্তব, প্রণাম ও পূজা করে থাকে। ভগীরথের পুত্রনাভ, নাভের পুত্র বলবান সিন্ধুদীপ, সিন্ধুদীপ হতে অযুতায়ু জন্মগ্রহণ করেন। অযুতায়ুর পুত্র ঋতুপর্ণ, ঋতুপর্ণের পুত্র সুদাস, সুদাসের পুত্র সৌদাস, সৌদাসের পুত্র বুদ্ধিসম্পন্ন অশ্মক, অশ্মকের পুত্র মূলক, মূলকের পুত্র দশরথ, দশরথ হতে এড়বিড় জন্মগ্রহণ করেন। এড়বিড়ের পুত্র বিশ্বসহ, বিশ্বসহের পুত্র খট্টাঙ্গ, খট্টাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহু। দীর্ঘবাহুর পুত্র রঘু, রঘু হতে অজ, অজের পুত্র দশরথ, দশরথ হতে সাক্ষাৎ জগৎপতি শ্রীরাম রূপে আবির্ভূত হন।

শ্রীরামের পুত্র কুশ, কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির পুত্র নিষধ, নিষধের পুত্র নভ, নভের পুত্র পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীকের পুত্র ক্ষেমধন্বা, তার পুত্র দেবানীক, দেবানীকের পুত্র হীন, হীনের পুত্র পারিপাত্র, পারিপাত্রের পুত্র বলাহক, বলাহকের পুত্র অর্ক, অর্কের পুত্র রজনাভ, রজনাভের পুত্র খগণ, খগণের পুত্র বিধৃত, বিধৃতের পুত্র হিরণ্যনাভ, হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্প, পুষ্পের পুত্র ধ্রুব, ধ্রুবের পুত্র স্যন্দন, স্যন্দনের পুত্র অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্র; এই অতুল বিক্রম শীঘ্র আমার পিতা।

আমি শীঘ্রের পুত্র। আমার নাম মরু। কেউ কেউ আমাকে বুধ, কেউ বা সুমিত্র বলে থাকে। এতদিন আমি কলাপ গ্রামে অবস্থানপূর্বক তপস্যা করছিলাম। আমি সত্যবতীনন্দন ব্যাসের প্রমুখাৎ আপনার অবতারের বৃত্তান্ত শ্রবণ করে কলির লক্ষ বছর সময় প্রতীক্ষা করে আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি। আপনি পরমাত্মা। আপনার সমীপে আগমন করলে কোটি জন্মের পাপপুঞ্জ ক্ষয় হয়, ধর্মের বৃদ্ধি হয়, যশ ও কীর্তি বৃদ্ধি হয় এবং সমুদায় কামনা পূর্ণ হয়।

কল্কি বললেন, এক্ষণে আমি তোমার বংশাবলী অবগত হলাম, তুমি সূর্যবংশ-সমুৎপন্ন ভূপতি। কিন্তু তোমার সহিত এই যে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখি, ইনি শ্রীমান ও মহাপুরুষ-লক্ষণযুক্ত। ইনি কে? দেবাপি কল্কির ইদৃশ মধুর বাক্য শ্রবণ করে বিনয় সম্পন্ন বচনে বলতে আরম্ভ করলেন।

দেবাপি বললেন, প্রলয়াবসানে আপনার নাভিকমল হতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েছিলেন। ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, অত্রির পুত্র চন্দ্র, চন্দ্রের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র পুরুরবা, পুরুরবার পুত্র নহুষ, নহুষের পুত্র যযাতি। যযাতি দেবযানিতে যদু ও তুর্বসু নামে দুই পুত্র উৎপাদন করেন। সাধুপালক, ঐ যযাতি শর্মিষ্ঠাতে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু এই তিন পুত্র উৎপাদন করেন। সৃষ্টির সময় ভূতাদি অর্থাৎ তামস অহঙ্কার যেমন পঞ্চভূত উৎপাদন করে, তার ন্যায় যযাতি উক্ত পঞ্চপুত্র উৎপাদন করেন। পুরুর পুত্র জনমেজয়, জনমেজয়ের পুত্র প্রচিন্বান, তার পুত্র প্রবীর, প্রবীরের পুত্র মনুস্যু, মনুস্যুর পুত্র অভয়দ, অভয়দের পুত্র উরুক্ষয়, উরুক্ষয়ের পুত্র ত্র্যরুণি, ত্র্যরুণির পুত্র পুষ্করারুণি, পুষ্করারুণির পুত্র বৃহৎক্ষেত্র, বৃহৎক্ষেত্রের পুত্র হস্তী। এই হস্তী রাজার নামেই হস্তিনাপুর নগর স্থাপিত হয়েছিল।

হস্তীর তিন পুত্র, অজমীঢ়, অহিমীঢ় ও পুরুমীঢ়। অজমীঢ়ের পুত্র ঋক্ষ, ঋক্ষের তনয় সংবরণ, সংবরণের তনয় কুরু, কুরুর তনয় পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের তনয় সুধনু, জুহু ও নিষেধ। সুধনুর পুত্র সুহোত্র, সুহোত্রের পুত্র চ্যবন, চ্যবনের পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র, কুশাগ্রের তনয় ঋষভ, ঋষভের তনয় সত্যজিৎ, সত্যজিতের তনয় পুষ্পবান, পুষ্পবানের তনয় নহুষ।

বৃহদ্রথের অন্য পত্নীতে শত্রুসন্তাপকারী জরাসন্ধের উৎপত্তি হয়। জরাসন্ধের তনয় সহদেব, সহদেবের তনয় সোমাপি, সোমাপির তনয় শ্রুতশ্রবা। শ্রুতশ্রবার তনয় সুরথ, সুরথের তনয় বিদুরথ, বিদুরথের তনয় সার্বভৌম, তার পুত্র তনয় জয়সেন, জয়সেনের তনয় রথানীক। রথানীক হতে কোপনস্বভাব যুতায়ুর জন্ম হয়। যুতায়ুর পুত্র দেবাতিথির পুত্র ঋক্ষ, ঋক্ষের পুত্র দীলিপ, দীলিপের তনয় প্রতীপক। হে ঈশ্বর, আমি প্রতীপকের পুত্র দেবাপি। আমি শান্তনুকে নিজরাজ্য প্রদান করে কলাপ গ্রামে অবস্থানপূর্বক একমনে বহুকাল তপস্যা করছিলাম। এখন আপনার দর্শনের নিমিত্ত এ স্থানে উপস্থিত হয়েছি। আমি এই মরুর সহিত এবং এই সমস্ত মুনিগণের সহিত আপনার চরণসরোজ লাভ করলাম। সুতরাং, আমাদের আর কালের করাল কবলে পতিত হতে হবে না। আমরা আত্মতত্ত্বজ্ঞদের পদ প্রাপ্ত হব।

মরু ও দেবাপিকে রাজ্যভার অর্পণ

কমললোচন কল্কি, মরু ও দেবাপির এরূপ বাক্য শ্রবণ করে হাস্যপূর্বক আশ্বাস প্রদান করে বলতে লাগলেন– আমি জ্ঞাত আছি, তোমরা উভয়ে পরম ধর্মজ্ঞ রাজা। এখন তোমরা আমার আদেশানুসারে রাজা হয়ে নিজ নিজ রাজ্য পালন কর। মরু, আমি এখন প্রজাপীড়ক, প্রাণিসিংহক, অধার্মিক, ম্লেচ্ছগণকে বিনাশ করে তোমাকে তোমার নিজ রাজধানী অযোধ্যাপুরীতে অভিষিক্ত করব। রাজর্ষি দেবাপি, আমি সংগ্রাম ভূমিতে পুক্কসগণকে সংহার করে তোমাকে তোমার নিজ রাজধানী হস্তিনাপুরে রাজ্যাভিষিক্ত করব। আমিও মথুরা নগরীতে অবস্থানপূর্বক তোমাদের ভয় দূর করব। আমি শয্যাকর্ণদিগকে, উষ্ট্রমুখদিগকে, এক জঙ্ঘদিগকে, বিনোদরদিগকে সংহারপূর্বক সত্যযুগ স্থাপন করে প্রজাগণকে পালন করব। তোমরাও তপস্বীবেশ ও ব্রত পরিত্যাগ করে মহারথে আরোহণ কর। কারণ, তোমরা শাস্ত্র ও অস্ত্র প্রয়োগে কুশল ও মহারথ। তোমরা আমার সাথে ম্লেচ্ছ প্রভৃতি ধর্মবিদ্বেষী পামরদিগের উন্মূলনার্থ বিচরণ করবে। মরু, বিশাখযূপ নামক ভূপতি, বিনয়সম্পন্না রুচিরাপাঙ্গী পরমসুন্দরী স্বীয় তনয়ার সাথে তোমার বিবাহ দিবে। মরু, তুমি ভূপতি হয়ে জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত আমার বাক্য প্রতিপালন কর। দেবাপি, তুমিও শান্তা নাম্নী রুচিরাশ্ব তনয়াকে বিবাহ কর।

মরু, দেবাপি ও মুনিগণ, কল্কির এই আশ্বাস বাক্য শ্রবণ করে বিস্ময়াবিষ্টহৃদয় হয়ে নিঃসংশয় রূপে স্থির করলেন যে, তিনিই হরি ও ঈশ্বর।

কল্কি এরূপ অভয়বাক্য বলছেন, এমন সময় আকাশ পথ হতে দুটি কামগামী রথ সম্মুখে অবতীর্ণ হলো। এই রথদ্বয় সূর্যসদৃশ তেজসম্পন্ন নানাবিধ মণিসমূহ দ্বারা নির্মিত ও সমুজ্জ্বল দিব্য অস্ত্র-শস্ত্রসমূহে পরিবারিত। মুনিগণ, ভূপালগণ ও সভাস্থিত সকলেই বিশ্বকর্মা কর্তৃক বিনির্মিত রথ সভামধ্যে উপস্থিত হয়েছে দেখে আহ্লাদিত হলেন এবং বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগলেন। কল্কি বললেন, সকলেই অবগত আছে যে, তোমরা উভয়ে রাজা এবং লোকরক্ষার নিমিত্ত, ভূমণ্ডল পালনের নিমিত্ত সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, যম ও কুবেরের অংশে আবির্ভূত হয়েছ। এত কাল তোমরা নিজ নিজ আকার গোপনপূর্বক অবস্থান করেছিলে। এখন আমার আবির্ভাবে আমার সাথে মিলিত হবার নিমিত্ত এখানে আগমন করেছ। অধুনা তোমরা আমার আদেশানুসারে ইন্দ্র প্রদত্ত এই রথে আরোহণ কর। পদ্মাপতি, বিশ্বপতি, সনাতন, কল্কি এই বাক্য বলছেন, এমন সময় দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন এবং মুনিগণ সম্মুখবর্তী

হয়ে স্তব করতে প্রবৃত্ত হলেন। জাহ্নবীসলিল সঙ্গ দ্বারা পরিক্লিন্ন মহেশ্বর শিরঃস্থিত বিভূতির পরাগ বিশিষ্ট ও পার্বতীর অঙ্গস্পর্শে মঙ্গলময় মন্দ মন্দ বায়ু বইতে লাগল।

তখন সেখানে এক ভিক্ষু এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর শরীরে আহ্লাদের চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর কান্তি তপ্তকাঞ্চন সদৃশ উজ্জ্বল। তিনি ধর্মের একমাত্র আধার। তিনি অতি মনোরম চীবর (গেরুয়া বস্ত্রখণ্ড) ধারণ করেছেন। তাঁর হস্তে দণ্ড রয়েছে। তিনি লোকাতীত। তাঁর শরীরের বায়ু দ্বারা পাপপুঞ্জ তিরোহিত হয়। তিনি সনকসদৃশ তেজঃপুঞ্জসম্পন্ন। তাঁর লোচনদ্বয় সরোজসদৃশ।

কল্কির সহিত সত্যযুগের সাক্ষাৎ

কল্কি ভিক্ষুককে দেখামাত্র সভ্যগণের সাথে গাত্রোত্থান করে পাদ্য অর্ঘ্য ও আচমনীয় প্রভৃতি দ্বারা তাঁর পূজা করলেন। পরে তিনি সমুদায় আশ্রমের পূজ্য ভিক্ষুককে উপবেশন করিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমার সৌভাগ্যক্রমে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আপনি কে? যেসকল মনুষ্য নিষ্পাপ এবং যাঁরা পূর্ণ ও সকলের সুহৃদ, তাঁরা প্রায়ই লোকের উদ্ধারের নিমিত্ত পৃথিবীতে পর্যটন করেন।

ভিক্ষুকটি বললেন, শ্রীনাথ, আমি একান্ত আপনকারি বশম্বদ সত্যযুগ। আমি আপনার আবির্ভাব ও বিভব দর্শনের নিমিত্ত এস্থলে আগমন করেছি। আপনি নিরুপাধি কালস্বরূপ। আমি কালের অংশ কৃতযুগ। আমার অধিকারে উত্তম ধর্ম্ম প্রতিপালিত হয়। আমার থেকে প্রজাগণ উত্তম ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা কৃতকৃত্য হয় বলে আমি কৃতযুগ নামে বিখ্যাত হয়েছি। কল্কি, অনুচরবর্গের সাথে সত্যযুগের এই বাক্য শ্রবণ করে যারপরনাই আনন্দিত হলেন।

কলি সংহারে সমর্থ কল্কি, সত্যযুগের আগমন দেখে কলির অধিকারে বিশসন নামক পুরীতে সংগ্রাম করতে অভিলাষী হয়ে অনুগত জনগণকে বললেন– যে সকল বীর গজে আরোহণ করে যুদ্ধ করে, যারা রথে আরোহণ করে যুদ্ধ করতে সমর্থ, যারা পদাতিক সৈন্য, যাদের শরীর সুবর্ণময় বিবিধ বিচিত্র বিভূষণে বিভূষিত, যারা নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করতে সমর্থ, যারা সংগ্রামে নিপুণ, তাদৃশ সৈন্যসমূহ আনয়ন কর ও গণনা কর।

তখন কৃতবিবাহ মহাবাহু মরু ও দেবাপি, কল্কির এই বাক্য শ্রবণ করে রথারোহণপূর্বক সম্মুখে উপস্থিত হলেন। তাঁরা উভয়ে অসংখ্য সৈন্যসমূহে পরিবৃত ও নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রধারী। তাঁরা স্বয়ং মহাবীর বলে অভিমান করে থাকেন।

তাঁদের হস্ত ও সমুদায় শরীর বর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত। তাঁদের অঙ্গুলিসমূহে অঙ্গুলিত্রাণ রয়েছে। তাঁদের মস্তক কৃষ্ণবর্ণ শিরস্ত্রাণে সুশোভিত রয়েছে। তাঁরা সর্বাপেক্ষা উত্তম ধনুর্ধারী। তাঁরা ছয় অক্ষৌহিণী সেনা দ্বারা ভূমণ্ডল পরিকম্পিত করছেন। বিশাখযূপ নামক ভূপতি এক লক্ষ হস্তি দ্বারা, শত লক্ষ অশ্ব দ্বারা, সপ্ত সহস্র রথ দ্বারা পরিবৃত ছিলেন। তাঁর সাথে দুই লক্ষ পদাতিক সৈন্য সুসজ্জিত হয়ে ধনুর্ধারণপূর্বক উপস্থিত হয়েছিলেন। বায়ু দ্বারা তাদের উষ্ণীয় ও উত্তরীয় বস্ত্র কম্পমান হচ্ছিল। এছাড়া, তাঁর সাথে পঞ্চাশ সহস্র রক্তবর্ণ অশ্ব এবং দশ সহস্র মত্ত হস্তী, বহুসংখ্যক মহারথ এবং নয় লক্ষ পদাতিক সৈন্য ছিল। পরপুরঞ্জয় কল্কি, এরূপ দেবলোকস্থিত দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় দশ অক্ষৌহিণী সেনাগণে পরিবৃত হয়ে শোভা পেতে লাগলেন। জগতের ঈশ্বর প্রভু কল্কি এইরূপে ভ্রাতৃপুত্রগণে, সুহৃদগণে ও সৈন্যসমূহে পরিবৃত হয়ে দিগ্বিজয় করবার অভিলাষে যাত্রা করলেন।
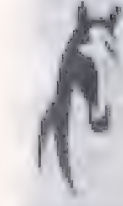
কল্কির সহিত ধর্মের সাক্ষাৎ

এ সময় বলবান কল্কি কর্তৃক নিরাকৃত ধর্ম, ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করে সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁর অনুচরবর্গ এবং স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ধর্ম সেই স্থানে ত্বরাপূর্বক আগমন করেন। শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা, হ্রী, ধর্মাপালক– এই অষ্টমূর্তি নিজ বন্ধুগণে পরিবৃত হয়ে কল্কিকে দর্শন করবার নিমিত্ত এবং নিজ কার্য করবার নিমিত্ত ধর্মের সাথে সেই স্থলে আগমন করলেন। কল্কি ব্রাহ্মণকে দর্শন করে বিনয়পূর্বক যথাবিধানে তাঁর পূজা করলেন এবং বললেন, আপনি কে? কোথা হতে আগমন করেছেন? আপনি ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তির ন্যায় স্ত্রী ও পুত্রগণের সাথে কোন রাজার অধিকার হতে আগমন করলেন, তা আমাকে বলুন। পাষণ্ড কর্তৃক পরাভূত বিষ্ণুপরায়ণ সাধুগণের ন্যায় আপনার পুত্রগণ ও স্ত্রীগণ বলহীন পৌরুষহীন ও একান্ত কাতর হয়েছেন। অনাথ ও অতি কাতর ধর্ম, কমলানাথ কল্কির এই বাক্য শ্রবণ করে নিজ মঙ্গলের নিমিত্ত উত্তর করলেন। প্রথমত তিনি পুত্রগণ, স্ত্রীগণ ও অনুচরবর্গের সাথে কৃতাঞ্জলিপুটে আনন্দময় দয়াময় হরির পূজাপূর্বক নমস্কার করে স্তব করতে লাগলেন।

তারপর ধর্ম বললেন, আমি পিতামহরূপী আপনার বক্ষঃস্থল হতে উৎপন্ন হয়েছি। আমার নাম ধর্ম। আমি সকল প্রাণীর অভিপ্রেত সিদ্ধ করে থাকি। আমি দেবগণের অগ্রগণ্য। আমি যজ্ঞে হব্যকাব্যের অংশভাগী। আমি যজ্ঞের ফল প্রদান

করে সাধুদিগের কামনা পূর্ণ করে থাকি। আমি আপনার আজ্ঞানুসারে নিয়ত সাধুদিগের কার্যে বিচরণ করি। এখন শক, কাম্বোজ, শবর প্রভৃতি ম্লেচ্ছজাতিগণ কলির অধিকারে বাস করছে। সেই বলবান কলি কর্তৃক আমি কালক্রমে পরাভূত হয়েছি। হে জগদাধার, এখন সাধুগণ সংসাররূপ কালাগ্নি দ্বারা সন্তপ্ত হয়ে প্রপীড়িত হয়েছেন। এজন্য আমি আপনার চরণোপান্তে উপস্থিত হলাম।

পাপনাশক শ্রীমান কল্কি ধর্মের এ অপূর্ব বাক্য শ্রবণে পরিতুষ্ট হয়ে সকলের হর্ষোৎপাদনপূর্বক ধীরে ধীরে বললেন– ধর্ম, এই দেখ সত্যযুগ উপস্থিত হয়েছেন। ইনি সূর্যবংশীয় রাজা। তাঁর নাম মরু। আমি ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে যেরূপে অবতীর্ণ হয়েছি, তা তুমি জ্ঞাত আছ। কীটক দেশে বৌদ্ধগণের দমন করেছি, তুমি তা জ্ঞাত হলে সুখী হবে। যারা বৈষ্ণব নয়, যারা তোমার প্রতি উপদ্রব করে থাকে, আমি তাদের সংহারের নিমিত্ত সেনাগণের সাথে যাত্রা করছি। এখন তুমি নির্ভয় চিত্তে ভূতলে বিচরণ করো। যখন আমি উপস্থিত হয়েছি, যখন সত্যযুগ উপস্থিত হয়েছে, তখন তোমার ভয় কী। তুমি কীজন্য মোহাভিভূত হচ্ছো। এখন তুমি যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও ব্রতের সাথে বিচরণ করো। ধর্ম, তুমি জগতের প্রিয়। তুমি পুত্র ও বন্ধুগণের সাথে দিগ্বিজয়ের নিমিত্ত এবং শত্রু দমনের নিমিত্ত যাত্রা করো, আমি তোমার সাথে গমন করছি।

অধ্যায় ৫

কল্কির কলি অভিযান

ধর্ম, কল্কির এই বাক্য শ্রবণপূর্বক যারপনাই আনন্দিত হয়ে নিজ আধিপত্য স্মরণপূর্বক কল্কির সাথে গমন করতে অভিলাষী হলেন। ধর্ম যাত্রাকালে স্ত্রী ও অনুচরগণকে সিদ্ধাশ্রমে রেখে গেলেন। ধর্ম যখন যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন সাধুদিগের সৎকার তাঁর সংগ্রাম বেশ হলো। বেদ এবং ব্রহ্ম মহারথস্বরূপ উপস্থিত হলো। নানাবিধ শাস্ত্রান্বেষণ বিষয়ে যে সঙ্কল্প, তা তাঁর শরাসন স্বরূপ হলো। বেদের সপ্তস্বর তাঁর রথের সপ্ত অশ্ব হলো। ব্রাহ্মণ তাঁর সারথি হলেন। বহ্নি তাঁর আশ্রয় অর্থাৎ তাঁর বসার আসন হলেন। এরূপ ধর্মরূপ সেনানী বিবিধ ক্রিয়ানুষ্ঠানরূপ ভূরিবলে পরিবৃত হয়ে যাত্রা করলেন।

এইরূপে কল্কি যজ্ঞ, দান, তপস্যা, যম, নিয়ম প্রভৃতি পাত্রগণে পরিবৃত হয়ে খশ, কাম্বোজ, শবর, বর্বর প্রভৃতি ম্লেচ্ছগণকে পরাজিত করার নিমিত্ত, কলির অভীষ্ট আবাসে গমন করলেন। কলির আবাস ভূতের আবাসস্বরূপ হওয়াতে দৃঢ়ীভূত হয়েছিল। এর চতুর্দিক কুকুরসমূহের সমাকুল। এই স্থানে গোমাংসের দুর্গন্ধ সঞ্চারিত হচ্ছে। এটি নারীদিগের কলহ বিবাদ, নানাবিধ ব্যসন ও দ্যূতক্রীড়ার আশ্রয়। এই পুরী ঘোররূপ ও জগতের ভয়জনক। এই পুরীতে সকলেই নারীগণের আজ্ঞাবহ। কলি কল্কির যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ শ্রবণ করে ক্রোধভরে পুত্র পৌত্রগণে পরিবৃত হয়ে পেঁচকধ্বজ রথে আরোহণপূর্বক বিশসন নামক নগর হতে বহির্গত হলো। ধর্ম কল্কিকে অবলোকন করে ঋষিগণে পরিবৃত হয়ে কল্কির আজ্ঞানুসারে তার সাথে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন। ঋতের সাথে দম্ভের যুদ্ধ হতে লাগল। প্রসাদ লোভকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করলেন। অভয়ের সাথে ক্রোধের এবং সুখের সাথে ভয়ের সংগ্রাম হতে লাগল। নিরয় প্রীতির নিকট উপস্থিত হয়ে বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করতে লাগল। আধি যোগের সাথে এবং ব্যাধি বলবান ক্ষেমের সাথে সংগ্রাম করতে প্রবৃত্ত হলো। গ্লানি প্রশ্রয়ের সাথে, জরা স্মৃতির সাথে যুদ্ধ আরম্ভ হলো। ব্রহ্মা

প্রভৃতি দেবগণ সেই যুদ্ধ দর্শন করবার নিমিত্ত স্ব স্ব বিভূতির সাথে আকাশপথে আগমন করলেন।

মরু ভীমপরাক্রম খশ ও কম্বোজদিগের সাথে সংগ্রাম করতে লাগলেন। দেবাপি, চীন (চোল), বর্বর ও তাদের অনুচরবর্গের সাথে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলেন। বিশাখযূপনামক ভূপতি, পুলিন্দ ও শ্বপচগণের সাথে মহাপ্রভাবশালী বিবিধ দিব্য অস্ত্রশস্ত্রসমূহ দ্বারা সংগ্রাম করতে লাগলেন।

অশ্বগণের হ্রেষারব, হস্তীগণের বৃংহিত, দন্ত শব্দ, শরাসনের টঙ্কার, শূরগণের বাহুবেগ, মুষ্ট্যাঘাত ও চপেটাঘাত দ্বারা মহাশব্দ উৎপন্ন হতে লাগল। এই শব্দে দশদিক পূরিত হলো। দেবগণ ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে আকাশে বিপর্যস্ত পথে গমন করতে লাগলেন।

এই সংগ্রামে পাশাস্ত্র, দণ্ড, খড়গ, শক্তি, ঋষ্টি, শূল, গদা ও ঘোর শরনিকর দ্বারা কোটি কোটি বীরগণের বাহু, চরণ ও মধ্যদেশ ছিন্নভিন্ন হয়ে রণভূমি ব্যাপ্ত হতে লাগল।

এরূপ মহাসংগ্রাম আরম্ভ হলে ধর্ম যারপর নাই ক্রোধপূর্বক সত্যযুগের সঙ্গে একত্র হয়ে কলির সাথে ঘোর যুদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন। পরে ধর্ম ও সত্যযুগের ভীষণ বাণসমূহ দ্বারা কলি, পরাভূত হয়ে গর্দভবাহন পরিত্যাগ পূর্বক নিজ পুরীতে প্রবেশ করল। তার পেঁচকাঙ্ক রথ ছিন্নভিন্ন হলো, সমুদায় শরীরে রক্তস্রাব হতে লাগল। তার গাত্রে ছুঁচার গন্ধ বইতে লাগল। তার মুখ অতীব ভীষণ আকার ধারণ করল। কলি এরূপ অবস্থাপন্ন হয়ে গৃহে প্রবিষ্ট হলো।

নিজ কুলের অঙ্গারস্বরূপ নিঃসার দম্ভ, সম্ভোগরহিত কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে আহত হয়ে ব্যাকুলিত হৃদয়ে নিজগৃহে প্রবেশ করল। লোভ প্রসাদ কর্তৃক অভিহত হলো। পদাঘাতে তার মস্তক চূর্ণ হয়ে গেল। তার সারমেয়যুক্ত রথ চূর্ণ হওয়াতে সে তা পরিত্যাগ করে রুধির বমন করতে করতে পলায়ন করল। অভয়ের সাথে সংগ্রামে ক্রোধ পরাজিত হলো। তার নয়নদ্বয় কলুষিত হয়ে উঠল। তার দুর্গন্ধ মুষিকযুক্ত রথ ছিন্নভিন্ন হওয়াতে সে তা পরিত্যাগ করে বিশসন নগরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হলো। ভয়, সুখের করতলাঘাতে গতাসু হয়ে ভূতলে নিপতিত হলো। নিরয়, প্রীতির মুষ্ট্যাঘাতে প্রপীড়িত হয়ে যমসদনে গমন করলো। আধিব্যাধি প্রভৃতি সকলেই সত্যযুগের শরনিকর দ্বারা নিপীড়িত হয়ে নিজ নিজ বাহন পরিত্যাগপূর্বক ভয়াকুলিত চিত্তে নানা দেশে পলায়ন করল।

তারপর ধর্ম, কৃতযুগের সাথে মিলিত হয়ে কলির প্রধান রাজধানী বিশসন নামক নগরে প্রবেশ করলেন এবং শরাগ্নি দ্বারা কলির সাথে ঐ নগর দগ্ধ করে

ফেললেন। কলির সর্বাঙ্গ দগ্ধ হয়ে গেল। তার স্ত্রী-পুত্র সমুদায়ই যমসদনের অতিথি হলো। সে একাকী দীন অন্তঃকরণে রোদন করতে করতে অলক্ষিতরূপে অন্যবর্ষে পলায়ন করল।

এদিকে মরু, দিব্যাস্ত্রসমূহের তেজ দ্বারা শক ও কাম্বোজদিগকে নিপাতিত করলেন। দেবাপিও শবর, চোল ও বর্বরদিগকে ঐরূপ উন্মূলিত করলেন। পরম তেজস্বী বিশাখযূপ ভূপতি, দিব্য অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ দ্বারা পুলিন্দ ও পুক্কুসদিগকে পরাজিত করলেন। নির্মলবুদ্ধিসম্পন্ন বিশাখযূপ, নিরন্তর খড়গপ্রহার দ্বারা এবং বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ দ্বারা বিপক্ষগণকে সংহার করতে লাগলেন। এরূপ বিপক্ষপক্ষীয় যোধগণের মধ্যে অনেকেই নিহত হলো।

কোক-বিকোক বধ

কোক আর বিকোক দুই ভাই কলির দুই বিশ্বস্ত রাক্ষস অনুচর। কলির রাজধানী বিষসন নগরেই তারা থাকত, আর যথেচ্ছা অত্যাচার করে বেড়াত।

এরা ছিল শকুনির পৌত্র (নাতি), বৃকাসুরের পুত্র। তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে এমন কেউ ছিল না, যে ওদের বধ করতে পারে। দুই ভাইয়ের গায়ে যেমন অদ্ভুত ক্ষমতা, অস্ত্রশাস্ত্রেও তেমনি পারদর্শী।

ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হয়ে ভ্রাতৃদ্বয় এমন দাপটে চলত যে, কার সাধ্য তাদের সামনে দাঁড়ায়? শুধু সাধারণ মানুষ, পর্বতগুহাবাসী আর মুনি-ঋষিরা নয়, দেব-গন্ধর্বরাও তাদের ভয়ে ভীত। ফলে কলির বিরোধিতা করে, এমন সাহস কারোরই ছিল না। সকলেই তাই দিন গুণত, কবে এ দু'ভাইয়ের হাত থেকে তারা মুক্তি পাবে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেউই অমর নয়। যার জন্ম হয়েছে, তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কোক-বিকোকেরও বোধ হয় সেই সময় ঘনিয়ে এসেছিল। কল্কিদেবের সঙ্গে যখন কলির বিরোধ শুরু হলো, তাঁর অন্যান্য সেনাপতিরা যখন কলির অনুগামীদের সঙ্গে লড়াই করছিল, তখন কল্কিদেব স্বয়ং গদা হাতে রুখে দাঁড়ালেন কোক আর বিকোকের বিরুদ্ধে।

কল্কিদেবকে গদা হাতে তাদের দিকে অগ্রসর হতে দেখে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দু'ভাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপর।

একদিকে গদা হাতে একই সঙ্গে দুই মহা-অসুর, আরেকদিকে একা কল্কিদেব।

সংঘটিত হতে লাগল তুমুল গদাযুদ্ধ। একপর্যায়ে কোক-বিকোকের আঘাতে কল্কিদেবের হাত থেকে গদা পড়ে গেল।

উল্লাসে দুই অসুর প্রহার করতে এগিয়ে আসছে দেখে কল্কিদেব ধনুর্বাণ তুলে নিলেন। বিকোককে লক্ষ্য করে নিক্ষেপিত এক বাণে তার মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কোক সঙ্গে সঙ্গে মুণ্ডটা তুলে নিয়ে ঘাড়ের ওপর বসিয়ে তাকাতেই বিকোক জীবিত হয়ে আবারও তর্জন-গর্জন করতে লাগল। কল্কিদেব অবাক হলেন।

কল্কিদেব এবার কোকের মস্তক ছিন্ন করলেন। একইভাবে বিকোক তাকে বাঁচিয়ে তুলে পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হলো। এভাবে চলতে লাগল। তখন কল্কিদেব একই বাণে একই সঙ্গে দু'ভাইয়ের মস্তক বিচ্ছিন্ন করলেন। অন্তরীক্ষ থেকে দেবতাগণ তা দর্শন করে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই দেখলেন, মস্তক যেখানে থাকার সেখানেই আছে। মরেও ওরা মরল না। দেবতারাও যেমন হতাশ হলেন, কল্কিদেবও তেমনি বেশ চিন্তায় পড়লেন। কীভাবে এ দানবদুটোকে মারা যায়?

একটু অন্যমনস্ক হয়েছে কল্কিদেব, কোক-বিকোক লাল চোখে অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে এলো। কল্কিবাহন শিবের দেয়া সেই ঘোড়া দুজনকে এত জোরে আঘাত করল যে দু'জন দু'দিকে ছিটকে পড়ল।

সামান্য একটা ঘোড়ার এত তেজ! রেগে আগুন দুই ভাই। উঠে তাঁর দিকে তীর ছুঁড়তে যাবে কি, ঘোড়াও তেড়ে এসে দুজনের বাহু সজোরে কামড়ে ধরল। প্রচণ্ড সে কামড়ে দুই ভাইয়ের বাহুর হাড় যেন ভেঙ্গেই গেল, ধনুক-তীর গুঁড়িয়ে গেল। হাতে অসহ্য যন্ত্রণা। কিন্তু যুদ্ধের উন্মাদনায় সেসব ভুলে গিয়ে মহাবলেরা ঠিক করল, লেজ ধরে ঘোড়াকে শূন্যে ছুঁড়ে দেবে। এই ভেবে যেই তারা তার লেজ ধরতে গেল, অমনি ঘোড়া জোড় পায়ে দু'ভাইয়ের বুকে এত জোরে আঘাত করল যে, বেশ কিছু দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ে তারা জ্ঞান হারাল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার উঠে দাঁড়াল।

সামনে কল্কিদেবকে দেখে দাঁত কড়মড় করে আবার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা তর্জন-গর্জন শুরু করে দিল।

যখন কল্কিদেব বুঝতে পারলেন যে, ব্রহ্মার বরে কোনো অস্ত্রে ওদের মৃত্যু হবে না, একজনের মৃত্যু হলে অপরজন তার দিকে তাকালেই বেঁচে উঠবে। ওদের মৃত্যুর একটাই মাত্র পথ– একই সঙ্গে দুজনের মাথায় আঘাত করতে হবে, তখন কল্কিদেব অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করে খালি হাতেই পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন কোক-বিকোকের দিকে। কল্কিদেবকে দেখে কোক-বিকোক হেসে আটখান। তাদের সঙ্গে বাহুযুদ্ধ করবে এমন সামান্য একটা মানুষ! নিজেরাও অস্ত্রশস্ত্র ফেলে

আস্ফালন করতে করতে এগিয়ে এলো। শুরু হলো মল্লযুদ্ধ। কল্কিদেব সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন, কোনো রকমে দু'ভাইকে নিজের দু'পাশে আনতে পারলে হয়।

বেশ কিছুকাল কসরৎ করার পর একসময় সে সুযোগ এলো; কল্কিদেব মুহূর্ত অপেক্ষা না করে একইসঙ্গে দু'হাতে দু'ভাইয়ের মস্তকে এমন সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করলেন, যেন দুটো পাহাড় একইসঙ্গে তাদের মাথায় পড়ে মাথা গুঁড়িয়ে দিল। প্রাণশূন্য হয়ে তাদের বিশাল দেহ লুটিয়ে পড়ল। কোক-বিকোকের নিধন দেখে দেবসমাজ যেন উৎসবে মেতে উঠল।

তারপর কবি কোক ও বিকোকের বধদর্শনে আনন্দিত ও উৎসাহিত হয়ে দিব্য অস্ত্রসমূহ দ্বারা অশ্ব ও রথের সাথে দশ সহস্র মহারথ বীরকে স্বয়ং বিনাশ করলেন। সেই রণভূমিতে প্রাজ্ঞ এক লক্ষ যোদ্ধাকে নিপাতিত করলেন। সুমন্ত্রের হস্তেও পঞ্চবিংশতি (২৫) রথী নিহত হলো। এরূপ গর্গ্য, ভর্গ্য, বিশাল প্রভৃতি বীরগণ ক্রুদ্ধ হয়ে সেসময়ে ম্লেচ্ছ, বর্বর ও নিষাদগণকে বিনাশ করলেন।

এইরূপে কল্কি রাজগণের সাথে একত্র হয়ে উক্ত সমুদায় বিপক্ষগণকে পরাজয়পূর্বক শয্যাকর্ণদিগের অধিকৃত ভল্লাট নগর জয়ের নিমিত্ত যাত্রা করলেন।

কল্কি মহতী সেনা সমভিব্যাহারে নিয়ে যুদ্ধের নিমিত্ত যাত্রা করলেন। তখন নানা প্রকার বাদ্যধ্বনি হতে লাগল। নানা প্রকার উত্তম উত্তম অস্ত্রসমূহ, নানা প্রকার বস্ত্রসমূহ ও নানা প্রকার ভূষণসমূহে ভূষিত শরীর নানা প্রকার লোকসমূহ, তাঁর সমভিব্যাহারে চললো। তাঁর সাথে নানা প্রকার বাহন নীত হতে লাগল। চতুর্দিকে চামরব্যজন হতে আরম্ভ হলো।

অধ্যায়

রাজা শশিধ্বজের সঙ্গে কল্কির যুদ্ধ

ম্লেচ্ছকুল নির্মূল করে কলিকে পর্যুদস্ত করে কল্কিদেব সসৈন্যে ভল্লাট নগরে প্রবেশ করলেন। ভল্লাট অধিপতি শশিধ্বজ পরম বৈষ্ণব। সর্বদা কৃষ্ণচিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন। রাণী সুশান্তা, দুই বীরপুত্র সূর্যকেতু ও বৃহৎকেতু এবং সুকন্যা রমা–সকলেই ভগবদ্ভক্ত।

এই রাজ্য সম্বন্ধে কারো কোনো অভিযোগই ছিল না। তথাপি কল্কিদেব কেন সৈন্য নিয়ে এ রাজ্য আক্রমণ করতে এলেন, কেউ বুঝতে পারল না। ভগবানের কার্যাবলি সর্বসাধারণের বোধগম্য নয়। নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে। রাজা বিশাখযূপ, মরু, দেবাপি, ধর্ম, সত্যযুগ ও সৈন্যসামন্ত কল্কিদেবের ইচ্ছাতেই রণসাজে সঙ্গে এসেছে।

সসৈন্যে কল্কিদেবের আগমনের সংবাদ পেয়ে রাজা শশিধ্বজের মন পুলকিত হয়ে উঠল। ভাবলেন, স্বয়ং ভগবান তবে তাঁকে ভুলে যাননি। তাই নিজেই এসেছেন তাঁকে করুণা করতে। এ যে তাঁর কত বড় সৌভাগ্য।

শশিধ্বজ পুত্রদের ডেকে মহারণের উদ্দেশ্যে সৈন্য সজ্জিত করার নির্দেশ দিলেন। নগর সরগরম হয়ে উঠতে লাগল। দলে দলে সামন্ত রাজাগণ আসতে লাগলেন সৈন্য নিয়ে।

রাণী সুশান্তা রাজা শশিধ্বজকে বললেন– প্রভু, জগতের নাথ, জগতের প্রার্থনীয় সর্বান্তর্যামী প্রভু সাক্ষাৎ নারায়ণ, সেই কল্কিকে আপনি কীরূপে প্রহার করবেন? রাজা শশিধ্বজ রাণীকে বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করলেন। প্রভু যেহেতু যুদ্ধ করতে অভিলাষী হয়েছেন, তাই তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করাটাই তাঁর সেবা। রাজা আরো বললেন, রণক্ষেত্র ব্যতীত প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাতের উপায়ান্তর না দেখেই তিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রণভূমি থেকে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত রাণীকে মন্দিরে শ্রীহরির পুজার্চনা, গুণগান করার নির্দেশ দিয়ে শশিধ্বজ প্রভু কল্কির দর্শন-অভিলাষে সৈন্যসমেৎ রণভূমির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

সমরায়োজন সমাপ্ত। দুই বীর পুত্রও প্রস্তুত। সমুদ্রপ্রমাণ সেনাবাহিনী, নানা অস্ত্রে সজ্জিত। মনে মনে একবার মৃদু হেসে ভগবান বিষ্ণুর নাম নিয়ে রাজা শশিধ্বজ এলেন রণক্ষেত্রে।

রণক্ষেত্রে এসে দেখলেন, কল্কিদেবের বিপুল সেনাবাহিনী। মরু, দেবাপির মতো মহারথীরা সামনে। শশিধ্বজ কালবিলম্ব না করে নিজের সেনাবাহিনীকে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। সেনারাও মহা উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে কল্কিসেনার দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেঙ্গে তছনছ করে দিল। কল্কিসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

একপর্যায়ে রাজা বিশাখযূপ হস্তি বাহিনী নিয়ে রাজা শশিধ্বজের মুখোমুখি হলেন। একইভাবে কল্কিবন্ধু ধনুর্ধারী গার্গবী শান্তকের, রাজা মরু শশিধ্বজের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাবলী সূর্যকেতুর, দেবাপি শশিধ্বজের কনিষ্ঠ পুত্র বৃহৎকেতুর মুখোমুখি হলেন। হস্তীবাহিনীর সঙ্গে হস্তীবাহিনীর, অশ্বারোহীর সঙ্গে অশ্বরোহীর, পদাতিকের সঙ্গে পদাতিকের তুমুল সংগ্রাম শুরু হলো । তুরী, ভেরী, শাঁখের আওয়াজে রণভূমি কম্পিত হতে লাগল। শূল, পাশ, গদা, বাণ, ভল্ল, তোমর, ভুশুণ্ডি আদি অস্ত্রে যেন আকাশ ছেয়ে গেল। আহতদের আর্তনাদে বাতাস ভারি হয়ে উঠতে লাগল। কারোবা ছিন্ন দেহ থেকে রক্তের প্লাবন বইছিল। এভাবে সহস্র সহস্র কোটি কোটি বীরপুরুষ নিপতিত হলো।

মরু রাজার প্রখর বাণে সূর্যকেতু আহত হয়ে প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। তখন তিনি ভীম বিক্রমে গদা হাতে এগিয়ে এসে রাজা মরুর রথের ঘোড়াগুলোকে প্রহার করে, পদাঘাতে রথকে চূর্ণবিচূর্ণ করলেন। তারপর মরুর বক্ষে গদা দিয়ে এমন প্রহার করলেন যে, মরু তৎক্ষণাৎ মূর্ছিত হয়ে পড়েন। সারথি মরুকে অন্য এক রথে তুলে সেখান থেকে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

এদিকে শরের পর শরেও বৃহৎকেতু যখন দেবাপিকে পরাস্ত করতে পারছিলেন না, বরং নিজের শূলাস্ত্র, শরাসন ভেঙ্গে যাচ্ছিল, তখন মহাক্রোধে তিনি খড়গহস্তে দেবাপিকে বধ করতে উদ্যত হলেন। তার অশ্বরথ বিনষ্ট করে দিলেন। মহাক্রোধে দেবাপি বৃহৎকেতুকে প্রথমে একটা ভীষণ চপেটাঘাত করে নিজের দুই বাহুর মধ্যে এমনভাবে চেপে ধরলেন যে, তিনি জ্ঞান হারালেন। তা দেখে মহাবল সূর্যকেতু ছুটে এসে দেবাপির মস্তকে মুষ্টি দ্বারা এত সজোরে প্রহার করলেন যে, দেবাপিও সেখানেই মূর্ছিত হয়ে ভূলুণ্ঠিত হলেন। বহু সৈন্যসামন্ত আর সেনাপতিদের হারিয়ে রাজা বিশাখযূপ পশ্চাৎধাবিত হয়ে দাঁড়িয়েছেন কল্কিদেবের নিকট।

বহু প্রতীক্ষার পর রাজা শশিধ্বজ এবার প্রত্যক্ষরূপে সূর্যের ন্যায় তেজসম্পন্ন, শ্যাম অঙ্গে পীতবসন পরিহিত, রত্নভূষিত, কীরিটধারী কমললোচন ভগবান

কল্কিদেবের দর্শন পেলেন। ধন্যরাজা শশিধ্বজ তখন কল্কিরূপী বিষ্ণুকে উদ্দেশ্য করে বললেন– হে পুণ্ডরীকাক্ষ, আগমন করো। আমার হৃদয়ে প্রহার করো। অন্যথায় আমার বাণে ভীত হয়ে আমার হৃদয়ে পলায়ন করো।

অস্ত্রধারী শত্রুসন্তাকারী বিভু কল্কি অক্রোধী হয়েও ক্রোধিতের ন্যায় শরনিকর দ্বারা প্রহার করতে লাগলেন। কিন্তু শশিধ্বজ একে কোনো প্রহার বলেই মনে করেননি। উপরন্তু তিনি তখন মেঘ হতে বারি বর্ষণের ন্যায় বহুবিধ অস্ত্র বর্ষণ করতে লাগলেন। সেসকল অস্ত্র দ্বারা কল্কি পরাস্ত হলো। তারপর দিব্য অস্ত্র দ্বারা মহাযুদ্ধ শুরু হলো। ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্র, পার্বতাস্ত্র দ্বারা বায়ব্য অস্ত্র, পার্জন্য অস্ত্র দ্বারা আগ্নেয় অস্ত্র, গারুড়াস্ত্র দ্বারা পণ্ডগাস্ত্র খণ্ডিত হতে লাগল। যেন প্রলয় উপস্থিত হয়েছে।

শশিধ্বজের প্রাসাদে কল্কির আগমন

এরপর অস্ত্র পরিত্যাগ করে তাঁরা বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। মুষ্ট্যাঘাত, পদাঘাতে তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। একপর্যায়ে শশিধ্বজ মূর্ছিত হয়ে পড়েন এবং তৎক্ষণাৎ জ্ঞান ফিরে তিনি কল্কিকে বজ্রসদৃশ প্রহার করেন। সেই প্রহারে কল্কিও মূর্ছিত হয়ে ভূতলে পতিত হলেন। তখন ধর্ম ও সত্যযুগ কল্কিকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলে রাজা শশিধ্বজ তাদের বন্দী করলেন এবং কল্কিসহ উভয়কে নিয়ে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করলেন। তিনি বিবেচনা করলেন যে, এ তিনজন ব্যতীত কেউই তাঁর পুত্রদের পরাস্ত করতে পারবে না; অর্থাৎ তারা যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসবে।

রাজা শশিধ্বজ অত্যন্ত পুলকিত হৃদয়ে দেবগণেরও দুর্লভ ভগবান কল্কি, ধর্ম এবং সত্যযুগকে নিয়ে রাজভবনে ফিরে এলেন। রাণী সুশান্তা তখন হরিমন্দিরে অবস্থান করছিলেন। অন্যান্য বৈষ্ণবীগণ হরিগুণ কীর্তন করছিলেন।

রাজা সুশান্তার বদনকমল দর্শন করে বললেন, এই সেই শ্রীহরি যিনি ধর্ম রক্ষার্থে শম্ভল গ্রামে আবির্ভূত হয়েছেন। সুশান্তে, যে কল্কি হৃদয়ে অবস্থান করেন, তিনি এখন তোমার ভক্তিতে মায়া অবলম্বনপূর্বক মূর্ছাছলে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। কান্তে, এই দেখ ধর্ম ও সত্যযুগও এখানে অবস্থান করছে। যদি তিনি স্বেচ্ছায় ধরা না দেন, তবে কার সাধ্য যে, বিশ্বজয়ী ভুবনস্রষ্টা ভগবানকে কেউ ধরে আনতে পারে। শ্রীহরি কল্কিকে দর্শন করে রাণী শান্তা আনন্দে নৃত্যগীত করতে করতে ভগবান কল্কির সেবা প্রার্থী হয়ে স্তবস্তুতি করতে লাগলেন।

কল্কি সুশান্তার গীতে পরিতোষিত হয়ে সংগ্রামস্থিত বীরের ন্যায় উত্থিত হলেন। তিনি সম্মুখে সুশান্তাকে, বামে সত্যযুগকে, দক্ষিণে ধর্মকে এবং পশ্চাতে রাজা শশিধ্বজকে দেখে লজ্জাবনত মুখে বললেন। পদ্মপলাসাক্ষ, তুমি কে? কী নিমিত্ত আমার সেবার জন্য উদ্যত হয়েছ? মহাবীর শশিধ্বজ কীজন্য আমার পশ্চাতে উপস্থিত হয়েছেন? হে ধর্ম, হে কৃতযুগ, আমরা রণভূমি পরিত্যাগ করে কী নিমিত্ত কীরূপে এ শত্রুর অন্তঃপুরে প্রবেশ করলাম? আমি শত্রু, আমাকে শত্রুপত্নীরা কেন প্রীতহৃদয়ে সেবা করছে? আমি মুর্ছিত হয়েছিলাম, শশিধ্বজ কেন আমাকে বিনাশ করেনি?

সুশান্তা বললেন, ত্রিভুবনে কোন ব্যক্তি নারায়ণ কল্কির সেবা না করে। জগৎ যাঁর সেবক, জগৎ যাঁর মিত্রস্বরূপ, যাঁর দর্শনে শত্রুভাব তিরোহিত হয়, কীরূপে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁর শত্রু হতে পারে? আমার স্বামী যদি শত্রুভাবে তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতেন, তাহলে কি তোমাকে নিজালয়ে আনয়ন করতে পারতাম। আমার স্বামী তোমার নিত্য সেবক, আমি তোমার নিত্য সেবিকা। হে মহাভুজ, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়েই তুমি স্বয়ং এখানে আগমন করেছ।

ধর্ম বললেন– কলিনাশন, তাঁরা উভয়ে আপনার প্রতি যেরূপ ভক্তি করছেন, যেরূপ নামকীর্তন করছেন, যেরূপ স্তব করছেন, তা দর্শনে যারপরনাই কৃতার্থ হলাম। কৃতযুগও তাদের ভক্তি আর কল্কির ভগবত্তার স্তুতি করতে লাগলেন।

শশিধ্বজ বললেন– বিভো, আমি যুদ্ধ করে আপনার শরীরে অস্ত্রাঘাত করেছি। আপনি আমাদের আত্মা, আর আমি আপনার সাথে শত্রুতা করেছি। কল্কি তাঁদের বাক্য শুনে সহাস্য বদনে পুনঃপুনঃ বললেন, তুমিই আমাকে জয় করেছ।

শশিধ্বজ-কন্যা রমা ও কল্কির বিবাহ

এরই মধ্যে রাজা শশিধ্বজ সংগ্রামস্থল হতে পুত্রগণকে আহ্বান করে সুশান্তার অভিপ্রায় অবগত হয়ে কল্কিকে রমানাম্নী কন্যা প্রদান করলেন। তখন মরু, দেবাপি, বিশাখযুপ, ভূপতি ও রুধিরাশ্ব, তাঁরা শশিধ্বজ কর্তৃক আহূত হয়ে সংগ্রামস্থল হতে শয্যাকর্ণ নামক ভূপতির সাথে ভল্লাট নগরে গমন করলেন। অসংখ্য সেনাসমূহ দ্বারা সেই পুরী বিমর্দিত হতে লাগল। গজ, অশ্ব ও রথ, ধ্বজ, পতাকাসমূহ দ্বারা সজ্জিত ভল্লাট নগরে কল্কি ও রমার পরস্পর বিবাহোৎসব সম্পাদিত হলো। সকলে হর্ষহেতু বলবাহনের সাথে তা দর্শন করার জন্য আগমন করল। শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও অন্যান্য

বাদিত্রসমূহের ধ্বনি দ্বারা, নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠান দ্বারা এবং পুররমণীকৃত মঙ্গলাচরণ দ্বারা রমা ও কল্কির বিবাহ অতীব সুখের হলো। রাজাগণ বহুবিধ ভক্ষ্যভোজ্য দ্বারা সংস্কৃত হয়ে সভায় প্রবেশ করলেন। ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয়গণ, বৈশ্যগণ, শূদ্রগণ এবং অন্যান্য জাতীয় জনসাধারণ বিচিত্র ভূষণ ও বহুবিধ ভোগ্যবস্তু প্রাপ্ত হয়ে কল্কির দর্শনার্থ সভায় উপবেশন করলেন। নক্ষত্রগণের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র যেমন শোভা পায়, তেমনি রাজগণের অধীশ্বর কমললোচন কল্কি লোকসকলকে বিমোহিত করে সেই সভায় শোভা পেতে লাগলেন।

রাজা শশিধ্বজ তাঁর অপরূপা কন্যা রমাকে কল্কিদেবের নিকট সমর্পণ করে চিন্তা করলেন– আমার কাজ সম্পন্ন হলো। এতদিন এই ভল্লাট নগরে আমরা এরই অপেক্ষায় ছিলাম, এখন আমরা মুক্ত হলাম।

শশিধ্বজের পূর্বজীবন

কিন্তু অন্যান্য রাজারা বেশ অবাক হলেন। শশিধ্বজ এসব কী বলছেন? রাজা কল্কিদেবের সঙ্গে যুদ্ধইবা করতে গেলেন কেন? এত প্রাণইবা যুদ্ধক্ষেত্রে বিনষ্ট হতে দিলেন কেন? আবার তাঁকে জামাতা করে নিজেরা 'মুক্ত হলাম'– এ কথাইবা বলছেন কেন?

শশিধ্বজ রাজাদের নিঃসংশয় করার জন্য বললেন– সে এক বিচিত্র কাহিনী। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার জন্মান্তরের ইতিহাস। আপনাদের যখন জানার ইচ্ছে পোষণ করছেন, আমি অবশ্যই আপনাদের তা বলব।

বহুকাল আগের কথা। অরণ্যমধ্যে এক শকুন আর শকুনি থাকত। মৃত প্রাণীর দুর্গন্ধযুক্ত মাংস খেয়ে দিন কাটাত আর এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াত। সেই বনে এক ব্যাধ থাকত। তার একটা পোষা শকুন ছিল। সেটাকে নিয়ে সে-ও সেই বনে শিকার করে বেড়াত

শকুন আর শকুনি একদিন ব্যাধের হাবভাব দেখে বুঝল, সে তাদের ধরবার চেষ্টা করছে। তাই তাকে দেখলেই তারা পালিয়ে যেত। যেখানেই যেত, ব্যাধ কিন্তু তাদের পিছু ছাড়ত না।

এভাবে ঘুরতে ঘুরতে শকুন-শকুনি ক্ষুধায় খুব কাতর হয়ে পড়েছে। কদিন ধরে তাদের আর আহার জোটেনি। এমন সময় হঠাৎ একদিন তারা দেখল, এক শকুন এসে নামল। তাকে দেখে শকুন-শকুনি ভাবল, নিশ্চয়ই কোনো খাদ্য এসেছে,

নইলে ঐ শকুন আসবে কেন। এই ভেবে তারাও সেই শকুনের পিছু পিছু যেই নামল, অমনি ব্যাধের ফাঁদে পড়ল। তখন বুঝতে পারেনি যে, ওটা ব্যাধের সেই পোষা শকুন। ফাঁদে পড়ে আর পালাবার পথ নেই। ব্যাধ তাদের ধরে গণ্ডকী নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে, প্রথমে জলে চুবিয়ে তারপর একটা শিলার ওপর আছাড় দিয়ে হত্যা করল। তবে সেই শিলাটি ছিল চক্র অঙ্কিত শালগ্রাম শিলা। ব্যাধ শিকারের আনন্দে উল্লসিত। সে জানতেও পারল না যে, শকুন শকুনির কী মহাউপকার সে করল। পবিত্র জলে অবগাহন আর শালগ্রাম শিলার স্পর্শে তারা সেই জঘন্য পক্ষী জীবন থেকে মুক্ত হয়ে চলে গেল বৈকুণ্ঠধামে, যেখানে স্বয়ং নারায়ণ থাকেন।

মুক্ত জীবন নিয়ে মহাসুখে শকুন-শকুনি সেখানে একশত বছর অবস্থান করে এল ব্রহ্মলোকে। পাঁচশত বছর সেখানে মহানন্দে কাটিয়ে এল দেবলোকে। চারশত বছর দেবলোকে কাটাল। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য কী তা ইতোমধ্যে তারা অবগত হয়েছে। তারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, কৃষ্ণ আর কৃষ্ণভক্তিই সবকিছুর মূল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ। সেই পরমেশ্বর ভগবানই যে ধর্ম রক্ষা আর অধর্মের বিনাশার্থে ভূতলে অবতীর্ণ হন, তাও তারা অবগত হয়েছেন।

ত্রেতা যুগের ভগবান শ্রীরাম আর লক্ষ্মণ দ্বাপর যুগে এলেন শ্রীকৃষ্ণ আর বলরাম রূপে। তখন সেই শকুন আর শকুনিও মর্ত্যে এসে জন্ম নিল যাদব বংশে– রাজা সত্রাজিৎ আর তাঁর মহিষী হয়ে।

কৃষ্ণ-বলরামের হাতে বহু অসুর নিহত হয়েছিল, কিন্তু দ্বিবিদ নামে এক বানর আর জাম্ববানের মৃত্যুটা ছিল একটু ব্যতিক্রম।

ত্রেতাযুগে লঙ্কাযুদ্ধে ইন্দ্রজিতের যজ্ঞশালায় প্রবেশ করে ইন্দ্রজিৎকে বধ করার পর লক্ষ্মণ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কোনোভাবেই তিনি আর নিজেকে সামলাতে পারছিলেন না। দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারের বংশে দ্বিবিদের জন্ম হয়েছিল। কোনো কারণবশত বানর হয়ে জন্মালেও সে কিন্তু চিকিৎসা ভোলেনি। কাতর লক্ষ্মণকে দেখে সে রামচন্দ্রের সামনেই তাঁকে সুস্থ করে দিলে লক্ষ্মণ খুশি মনে বলেছিলেন– দ্বিবিদ, আমি তোমার কী উপকার করতে পারি বল। দ্বিবিদ তখন বলেছিল, "আমি এই বানর জন্ম থেকে মুক্ত হতে চাই।" লক্ষ্মণ বলেছিল, "অপেক্ষা কর, তোমার ইচ্ছা পূরণ করব।" দ্বাপর যুগে সেই লক্ষ্মণই বলরামরূপে তাঁর প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন।

আর জাম্ববান? সত্যযুগে বিষ্ণু যখন বামনরূপে বলির দর্প চূর্ণ করতে তিন পদক্ষেপে ত্রিলোক জয় করেছেন, জাম্ববান তখন ক্ষিপ্রবেগে তাঁর প্রথম চরণ এক পাক ঘুরে নিয়েছিল। তা দেখে বানরদের বলেছিলেন, "তোমার দ্রুততা দেখে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। বল, তুমি কী চাও? জাম্ববান প্রার্থনা জানিয়েছিল, 'আমি

এ পশুজন্ম থেকে মুক্তি চাই।" বামনদেব তাকে আশ্বাস দিয়ে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। দ্বাপরযুগে সেই জাম্ববান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাতে মুক্ত হয়েছিল একটা স্যমন্ত মণিকে কেন্দ্র করে। আর তার পেছনে ছিল সেই রাজা সত্রাজিৎ।

সূর্যদেব সত্রাজিৎকে দিয়েছিলেন সেই স্যমন্ত মণি। মণিটি সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে রেখেছিল তার ভাই প্রসেনের কাছে। শিকারে গিয়ে প্রসেন প্রাণ হারায়। মণিটাও হারিয়ে যায়। সত্রাজিতের বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছিল, সবই কৃষ্ণের কারসাজিতে সংঘটিত হয়েছে। তার শ্রীকৃষ্ণ তার ভুল ভাঙ্গিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববানকে বধ করে সেই মণি উদ্ধার করে এসে সত্রাজিৎকে ফেরত দিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে মিথ্যা সন্দেহ করার কারণে রাজা সত্রাজিৎ তখন খুব অনুতাপ করেছিলেন। আর ব্যাপারটা সহজ করে নেবার জন্য তিনি তার মেয়ে সত্যভামাকে কৃষ্ণের হাতে তুলে দিয়েছিলেন

ভগবানের নামে অপবাদ আর অবিশ্বাসের পাপ কিন্তু সত্রাজিৎকে ছাড়েনি। মুক্ত জীবন নিয়ে লোকান্তর ঘুরতে ঘুরতে সেই শকুন-শকুনি জানতে পারল যে, কলিযুগে ভগবান কল্কিদেবরূপে আবির্ভূত হবেন।

শশিধ্বজ বলেন– রাজাগণ, আমিই সেই শকুন বা সত্রাজিৎ, আর রানী সুশান্তাই হলেন সেই শকুনি সত্রাজিৎ-মহিষী। গত জন্মের সন্দেহ ভগবান কল্কিদেবের ওপর এ জন্মে আমাদের আর নেই। তখন কৃষ্ণের সঙ্গে মিটমাট করার জন্য সত্যভামাকে দিয়েছিল সত্রাজিৎ। সেই সত্যভামা এ জন্মে আমার কন্যা রমা। এ জন্মে তাঁকে আজ ভগবানের হাতে সমর্পণ করে মুক্ত হলাম। আর লোকক্ষয়! যারা নিহত হয়েছে, তারা সবাই ছিল অধার্মিক।

শশিধ্বজের পূর্বজীবনের বৃত্তান্ত শুনে বিস্ময়ে সকলে হতবাক হলেন। শশিধ্বজ বললেন, ভগবানের কৃপাতেই আমি জাতিস্মর হয়েছিলাম। তাই সব বলতে পারলাম। এবার আমরা বিদায় নিতে চাই। তখন কল্কিদেবের হাতে সবকিছু সমর্পণ করে রাজা শশিধ্বজ হরিদ্বারে গমন করলেন। সংসার তাপ মোচনের নিমিত্ত মায়া স্তব করেন। মার্কণ্ডেয়ের নিকট থেকে এই মায়া স্তুতি লাভ করে তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। রাজা শশিধ্বজ কাননমধ্যে কোকামুখ নামক স্থানে তপশ্চারণ করে হরিধ্যানপূর্বক সুদর্শনে নিহত হয়ে বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

কাঞ্চন নগরীতে প্রবেশ ও বিষকন্যার শাপমুক্তি

তারপর মহাতেজা কল্কি নানা প্রকার বিচিত্র বাক্যের দ্বারা তাঁর শ্বশুর শশিধ্বজের প্রীতিসাধন ও সম্ভাষণপূর্বক নৃপতিগণসহ প্রস্থান করলেন। নৃপতি শশিধ্বজও কল্কির নিকট মনোমত বর প্রাপ্ত হয়ে, মহেশ্বরী মহামায়ার স্তব দ্বারা মায়াপাশ ছিন্ন করে আপন প্রিয়া রাণীসহ বনবাসী হলেন।

এদিকে কল্কি সেনাগণ পরিবেষ্টিত হয়ে কাঞ্চন নগরীতে গমন করলেন। সেই নগরী গিরিদুর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত। বিষ উদ্‌গীরণকারী মহাভুজঙ্গগণ দ্বারা তা রক্ষিত। পুরপুরঞ্জয় কল্কি নিজ সেনাগণসহ সেই দুর্গ বিদারণ করে শরজাল দ্বারা বিষোদ্‌গিরণকারী ভুজঙ্গদের সংহার করে পুরীমধ্যে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে দেখলেন সেই পুরী বিভিন্ন মনিরত্ন ও স্বর্ণরাজি দ্বারা অলঙ্কৃত। স্থানে স্থানে নাগকন্যা অবস্থিত রয়েছে এবং স্থানে স্থানে কল্পতরু বিরাজিত। কিন্তু মনুষ্য দেখা যাচ্ছে না।

তা দেখে কল্কি সহাস্যে ভূপতিগণকে বললেন– কী আশ্চর্য ব্যাপার! দেখ, এটি ভুজঙ্গদের পুরী। অতি রমণীয় এই পুরী। মানবদের পক্ষে এই পুরী ভয়াবহ। এস্থানে শুধু নাগকন্যাগণকেই দৃষ্ট হচ্ছে। তোমরা বলো, এই পুরীমধ্যে কি প্রবেশ করব? রমানাথ কল্কি ও রাজাগণ কর্তব্য নির্ণয় করতে না পারায় চিন্তা করছেন। এই সময় দৈববাণী হলো– সৈন্যবৃন্দসহ এই পুরীমধ্যে প্রবেশ করা উচিত নয়। কারণ, এর অভ্যন্তরস্থিতা বিষকন্যার দৃষ্টির দ্বারা একমাত্র আপনি ব্যতিরেকে সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

দৈববাণী শ্রবণে কল্কি দ্রুত তরবারি হস্তে একাকী অশ্বারোহণে শুকসহ সেই পুরীমধ্যে গমন করতে লাগলেন। কিছুদূর গমন করবার পর এই অপূর্ব কন্যাকে দেখতে পেলেন। তার রূপ দর্শনে জ্ঞানীগণেরও ধৈর্যচ্যুতি হয়। সেই কন্যা অতিশয় সুন্দরী, রমাপতি কল্কিকে দেখে সহাস্য মুখে বলতে লাগলেন– এই জগতের কত শত মহাবীর্যবান রাজা এবং অন্যান্য ব্যক্তি আমার দৃষ্টিপাতে ভস্মীভূত হয়ে

শমন ভবনে গিয়েছে। অতএব, আমার সদৃশ দুঃখিনী আর কেউ নেই। দেবতা, অসুর, মানব– কারো সাথে আমার প্রেমের আশা নেই। এক্ষণে, আমি আপনার দৃষ্টিপাতরূপ অমৃতধারায় প্লাবিত হলাম। আপনাকে প্রণাম করি। বিষদৃষ্টির জন্য আজ এ জগতে অত্যন্ত দীনা ও মন্দাভাগিনী, আপনার দৃষ্টি সুধাময়ী। জানি না, কোন তপস্যার ফলে আপনার সাথে সাক্ষাৎ হলো।

কল্কি বললেন– হে সুশ্রোনি, তুমি কে? কার কন্যা? তোমার এরূপ দশার কারণ কী? কী কার্যের ফলে তোমার দৃষ্টি বিষময়ী হয়েছে?

বিষকন্যা বললেন– হে মহামতি। আমি চিত্রগ্রীব নামক গন্ধর্বের পত্নী, আমার নাম সুলোচনা। আমি সর্বদা পতির মনোরঞ্জন করতাম।

একদা আমি পতিসহ বিমান আরোহণে গন্ধমাদন পর্বতের কুঞ্জমধ্যে গিয়ে একটি পাথরের উপর বসে পতির একান্ত সঙ্গ উপভোগ করছিলাম। এমন সময় সেখানে যক্ষমুনিকে আমি দেখতে পাই। তাকে কুৎসিতকার ও আতুর দেখে রূপযৌবন গর্বে গর্বিত হয়ে আমি কটাক্ষপাত করে উপহাস করলাম। আমার মুখে বিদ্রূপ বাক্য শুনে মুনিবর ক্রোধে আমাকে শাপ দিলেন। তাঁর শাপেই আমার দৃষ্টি বিষময়ী হয়েছে। অতঃপর এই সর্পপুরী কাঞ্চন নগরীতে নাগিনীগণের মধ্যে নিক্ষিপ্তা ও ভাগ্যহীনা এবং পতিহীনা হয়ে বিচরণ করছি। আমার দৃষ্টিতে বিষ বর্ষিত হয়। জানি না কোন তপস্যার ফলে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হলো। আপনার দর্শনমাত্রই আমি শাপমুক্ত হয়েছি। এখন আমার দৃষ্টিতে সুধাবর্ষণ হচ্ছে। এক্ষণে আমি আমার পতির নিকট গমন করব। সাধুদিগের কৃপাপেক্ষা শাপই কল্যাণকর হয়। কারণ, ঋষির শাপমোচনের জন্যই মোক্ষদায়ক আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করছি। এই বলে বিষকন্যা সূর্যের ন্যায় জ্যোতিসম্পন্ন বিমানে আরোহণপূর্বক স্বর্গপুরীতে গমন করলেন।

কল্কি কর্তৃক রাজ্য বণ্টন

বিষকন্যার স্বর্গে গমনের পর কল্কি মহামতি নামে রাজাকে সেই কাঞ্চনপুরী রাজ্য প্রদান করলেন। মহামতির পুত্র অমর্ষ, অমর্ষের পুত্র সহস্র, সহস্রের পুত্র অসি। যে বংশে বৃহন্নলা নামে রাজগণ জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা মনুকে অযোধ্যা রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করে শ্রীহরি কল্কি ঋষিগণসহ মথুরায় গমন করলেন। অতঃপর সূর্যকেতুকে মথুরার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

অতঃপর তিনি বারণাবতে গিয়ে সেখানে দেবাপিকে সিংহাসনে বসিয়ে তাঁকে অরিস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দ, হস্তিনাপুর ও বারণাবত এই পঞ্চদেশের অধিপতি করলেন।

অতঃপর তিনি শম্ভলগ্রামে উপনীত হলেন। অতঃপর ভ্রাতৃবৎসল হরি– কবি, প্রাজ্ঞ এবং সুমন্ত্রকে শৌন্ড, পৌণ্ড্র, সুরাষ্ট্র, পুলিন্দ ও মগধ দেশ প্রদান করলেন। এবার তিনি জ্ঞাতিগণকে কীকট, মধ্যকর্ণটি, অন্ধ্র, ওড্র, অঙ্গ ও বঙ্গ রাজ্যসকল প্রদান করলেন। প্রতাপান্বিত কল্কি স্বয়ং শম্ভলে থেকে বিশাখযুপকে কঙ্কণদেশ এবং কলাপদেশ প্রদান করলেন। তিনি কৃতকর্মাদি পুত্রগণকে দ্বারকার অন্তর্গত চোল, বর্বর ও কর্বদেশ প্রদান করলেন।

অধ্যায়

২

কল্কি প্রতিষ্ঠিত সত্যযুগ

ভগবান কল্কি ভক্তিসহকারে পিতাকে অসংখ্য ধনরত্নাদি প্রদানপূর্বক শম্ভলবাসী প্রজাগণকে অভয় দিলেন। পরে গৃহস্থাশ্রমে থেকে রমা ও পদ্মাসহ পরমানন্দে দিন কাটাতে লাগলেন। ত্রিজগতে সত্যযুগ প্রতিষ্ঠিত হলো।

দেবতাগণ প্রসন্ন হয়ে জগতের সর্বত্র ভ্রমণ করতে লাগলেন। বসুমতী বিবিধ শস্যে পূর্ণ হয়ে বিরাজ করতে লাগল এবং হৃষ্টপুষ্ট জীব সকলের দ্বারা পরিবৃত হলো। শাঠ্য, চৌর্য্য, অনৃত, মিথ্যাচার, আধি, ব্যাধি জগৎ ত্যাগ করে পালিয়েছে। বিপ্রগণ বেদ অধ্যয়নে মন দিলেন, নারীগণ মঙ্গল কর্মরত সদাচাররতা, ব্রতপরায়ণা, পূজাহোম পরায়ণা, পতিব্রতা, ধর্মপরায়ণা হলো। ক্ষত্রিয়গণ যজ্ঞাদিতে প্রবৃত্ত হলো। বৈশ্যগণ হরিসেবা পরায়ণ হয়ে ন্যায়পরায়ণতাপূর্বক বস্তুসমূহ বিনিময় দ্বারা জীবনযাপন করতে লাগলেন। শুদ্রগণ দ্বিজগণের সেবায় ব্যাপৃত থেকে হরিগুণগানাদি সহকারে দিন কাটাতে লাগলেন।

তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে বেদ, ধর্ম, সত্যযুগ, দেবগণ, স্থাবর, জঙ্গমাদি বিশ্বের জীবসকল, হৃষ্টপুষ্ট ও প্রীত হলেন। পূর্বযুগে অর্থাৎ কলিযুগে নানাবিধ অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত দেবমূর্তিগণকে ইন্দ্রজালিকের ন্যায় ব্যবহার করে যেসকল পূজক জনসাধারণকে মোহিত করতেন, সেই ভণ্ড পূজকেরা দূর হলো এবং সাধু না হয়েও সর্বাঙ্গে তিলকচিহ্ন ধারণ করে মায়ামোহ অলঙ্কৃত হয়ে যে পাষণ্ডরা প্রকৃত সাধুদের বঞ্চনা করতেন, সেই পাষণ্ডদের আর দেখা গেল না। এভাবে কল্কি রমা ও পদ্মাসহ সম্ভলে বাস করতে লাগলেন।

কল্কি কৃত যজ্ঞানুষ্ঠান

সত্যযুগ প্রতিষ্ঠিত হলে একদিন কল্কির পিতা বিষ্ণুযশা কল্কিকে বললেন– "দেবতাগণ জগতের হিতকারী, তুমি তাঁদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান কর।"

পিতৃবাক্যে কল্কি আনন্দিত চিত্তে সবিনয়ে বললেন– আমি ধর্মকামার্থ সিদ্ধি হেতু কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত রাজসূয়, অশ্বমেধ ও অন্যান্য যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা যজ্ঞেশ্বর হরির পূজা করব।

কল্কিকৃত যজ্ঞানুষ্ঠানে কৃপাচার্য, পরশুরাম, ব্যাসদেব, বশিষ্ট, ধৌম্য, অকৃতব্রণ, অশ্বত্থামা, মধুচ্ছন্দ, মন্দপাল ইত্যাদি মুনিগণকে এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত ছিলেন। পূজাপূর্বক গঙ্গা-যমুনার মধ্যস্থলে যজ্ঞে দীক্ষিত ও স্নাত হয়ে দক্ষিণা দিলেন।

এরপর তিনি নানা প্রকার চর্ব, চুষ্য, লেহ্য, পেয়, পূপ, শষ্কুলি, যাবক, তিলচূর্ণ, ফলমূল ও অন্যান্য নানা প্রকার দ্রব্য দ্বারা দ্বিজগণকে যথাবিধি ভোজন করালেন। সেই যজ্ঞের সমস্ত কর্ম সুসম্পন্ন হলো। তাতে স্বয়ং অগ্নিদেব পাচক, বরুণ জলদানকারী ও পবনদেব পরিবেশন কর্তা হলেন। পদ্মলোচন কল্কি যথাভিলষিত উৎকৃষ্ট অন্ন ও নৃত্যগীত বাদ্য দ্বারা ও প্রতিযজ্ঞ মহোৎসব অনুষ্ঠান দ্বারা সকলের আনন্দ বর্ধন করলেন। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাঁর নিকট প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হলেন।

তাঁর যজ্ঞে রম্ভা নৃত্য, নন্দী তাল সহকারে বাদ্য এবং হু হু নামক গন্ধর্ব গান করলেন। জগৎপিতা কল্কি বিপ্রগণ ও সুপাত্র বিশেষে অর্থাদি দান করে পিতৃ আদেশে গঙ্গাতীরে অবস্থিতি করতে লাগলেন।

নারদের আগমন ও পিতৃ-মাতৃবিয়োগ

এদিকে বিষ্ণুযশার সভায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পূর্ব রাজাগণের শ্রুতিমধুর চরিত্র বর্ণনা করে সহাস্যে সকলকে প্রীত করছিলেন।

এই অবসরে তুম্বরুসহ দেবগণপূজ্য দেবর্ষি নারদ সেখানে এলেন। প্রফুল্ল মনে বিষ্ণুযশা সেই দুজন ঋষির অর্চন করলেন। উপযুক্তরূপে তাঁদের অর্চনা করে সবিনয়ে

বীণাধারী হরিভক্ত দেবর্ষি নারদকে প্রীতিপূর্বক বললেন– আমাদের কী সৌভাগ্য! আমাদের শতজন্মসঞ্চিত ভাগ্য কী পরম অদ্ভুত! আপনারা সর্বদা ভগবদ্ভক্তিতে পূর্ণ মহাত্মা। মুক্তির জন্যই আজ আপনাদের সাক্ষাৎ পেলাম।

আজ আপনাদের দর্শন ও অর্চনা দ্বারা আমার পিতৃগণ তৃপ্ত হলেন। আমি অগ্নিতে যে আহুতি দিয়েছি, তা সফল হলো। দেবতাগণ প্রীত হলেন। যার অর্চনায় হরির অর্চনা করা হয়, যাঁর দর্শনে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না, যাঁর স্পর্শে পাপ ধ্বংস হয়, সেরূপ সাধু সমাগম কী বিচিত্র!

সাধুদের হৃদয়ই ধর্ম, তাঁদের বাণীই দেব সনাতন, তাঁদের কার্যসকল কর্মক্ষয়ের জন্য। এজন্য সাধুই স্বয়ং হরির মূর্তিস্বরূপ। দুষ্ট বিনিগ্রহে আবির্ভূত কৃষ্ণের নিত্যদেহ যেমন ভৌতিক নহে, সেরূপ এ ত্রিজগতে আপনাদের ন্যায় বৈষ্ণবদের দেহও পঞ্চভূতে গঠিত নয়। এই মায়াচ্ছন্ন ভবসাগরে আপনি হরিভক্তিরূপ তরণীর দ্বারা জীবের পারকর্তা। তাই আপনার নিকট কিছু জিজ্ঞেস করতে উদ্যত হয়েছি।

হে বিশ্ব হিতকারক, আমি কোন কর্ম করলে এই ভবসাগররূপ যন্ত্রণা হতে মুক্তিলাভ করে পরম কল্যাণময় নির্বাণপদ প্রাপ্ত হব, তা কৃপাপূর্বক বলে কৃতার্থ করুন।

দেবর্ষি বললেন– অহো! মায়া কী শক্তিশালিনী। তা কী সর্বাশ্চর্যময়ী ও শুভদায়িনী, হরি পিতামাতাকেও এই মায়া হতে নিস্তার করছেন না। তা না হলে পূর্ণ নারায়ণ জগৎ ঈশ্বর কল্কি যাঁর পুত্র, সেই বিষ্ণুযশা পুত্রকে ত্যাগ করে আমার নিকট মুক্তি কামনা করছেন!

ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষি নারদ এরূপ বিবেচনা করে ব্রহ্মযশার পুত্র বিষ্ণুযশাকে একান্তে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করলেন। তারপর তাঁরা কল্কিকে প্রদক্ষিণকরত কপিলের আশ্রমে চলে গেলেন।

এরপর বিষ্ণুযশা নারদ মুনির নির্দেশে সংসার ত্যাগ করে বদরিকাশ্রমে গিয়ে কঠোর তপস্যা দ্বারা আত্মাকে পরমব্রহ্মে সংযোগ করলেন এবং সাধনার পূর্ণতা লাভ করে ভৌতিক দেহ ত্যাগ করলেন। কল্কির মাতা সাধ্বী সতী সুমতি মৃত পত্নীকে আলিঙ্গনপূর্বক অগ্নিতে প্রবেশ করলেন। স্বর্গে দেবগণ তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন। কল্কি মুনিগণ মুখে পিতামাতার স্বধামপ্রাপ্তি শ্রবণ করে স্নেহবশে অশ্রুসজল নয়নে তাদের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পাদন করেন।

পরশুরামের আগমন ও রমার সন্তান লাভ

যা দ্বারা তীর্থ পবিত্র হয়, সেই ভৃগুরাম তীর্থ ভ্রমণ উদ্দেশ্যে মহেন্দ্র পর্বত হতে অবতরণ করে কল্কিকে দর্শন মানসে শম্ভল গ্রামে এলেন। কল্কি ভৃগুরামকে দেখে আনন্দিত মনে রমা ও পদ্মাসহ সিংহাসন হতে উঠে যথানিয়মে তাঁর অর্চনা করলেন। তিনি ভৃগুরামকে বিবিধ প্রকার রস-গুণময় সামগ্রী ভোজন করিয়ে বহুমূল্য পরিচ্ছদে সজ্জিত করে বিচিত্র পালঙ্কে শয়ন করালেন।

আহার সমাপ্তির পর ভৃগুরাম বিশ্রাম করছেন, এমন সময় কল্কি পদসেবা দ্বারা তাঁর প্রীতিসাধন পূর্বক বিনয়ের সাথে মধুর বাক্যে বলতে লাগলেন– গুরুদেব, আপনার কৃপায় আমার ধর্ম, অর্থ ও কাম ত্রিবর্গ সুসিদ্ধ হয়েছে। পতির বাক্য শ্রবণ করে শশিধ্বজকন্যা পুলকিত হৃদয়ে পরশুরামকে জিজ্ঞেস করলেন– কী বিধান অনুযায়ী যম, নিয়ম ও ব্রতানুষ্ঠান করলে, মনোমত সন্তান লাভ করা যায়।

এরপর, জামদাগ্ন্য পরশুরাম রমাকে পুত্রাকাঙ্ক্ষিতা দেখে কল্কির অভিপ্রায় বুঝে রুক্মিণী ব্রত অনুষ্ঠান করালেন। সতী সাধ্বী রমা সেই ব্রতের ফলে পুত্রবতী, সৌভাগ্যশালিনী ও স্থির যৌবনা হলেন। অশোক কাননে দেবী জানকী সরমাসহ এই ব্রত করে রাক্ষসকুল ধ্বংসকারী রামকে পুনর্বার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। বৃহদশ্বের অনুরোধে দ্রৌপদী এই ব্রতাচরণ করে পতির অনুরতা, দুঃখরহিতা ও স্থির যৌবনা হয়েছিলেন। কল্কিপত্নী রমা বৈশাখ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে পরশুরাম দ্বারা পূর্ণ চার বছর এ ব্রত করেছিলেন।

তিনি হস্তে পট্টডোর বেঁধে বহু ব্রাহ্মণ ভোজন করালেন। পরে তিনি স্বামীসহ উত্তম ক্ষীরসহ হবিষ্যান্ন ভোজন করে আপনজন সহ সসাগরা পৃথিবী ভোগ করতে লাগলেন।

কালক্রমে সতী রমার গর্ভে মেঘমাল ও বলাহক নামে দুই পুত্র জন্মাল। পুত্রদুটি কল্কির প্রিয়, সৌভাগ্যবান ও মহা বীর্যবান এবং মহা উৎসাহী হলো এবং দুজনেই যজ্ঞাদির দ্বারা দেবগণের প্রীতি সাধন করল।

কল্কির পর্বতগুহায় প্রবেশ ও বিহার

অতঃপর কল্কি ভ্রাতা, পুত্র, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও আত্মীয়বর্গসহ সহস্রবর্ষ শম্ভলে অবস্থান করলেন। স্বর্গপুরীর মতো শম্ভলে সভা, আপণ শ্রেণি, চত্বর, ধ্বজ পতাকাদি দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে অতিশয় শোভা পেতে লাগল। এই শম্ভলগ্রামে ৬৮টি তীর্থের অধিষ্ঠান হলো।

এই স্থলে মৃত্যু হলে কল্কির চরণকমলের আশ্রয়হেতু সমস্ত পাপক্ষয় হয় এবং মোক্ষপদ লাভ হয়ে থাকে। নানা কুসুমসঙ্কুল বনোপবন শোভিত এই শম্ভল গ্রাম ভূমণ্ডল মধ্যে মোক্ষপদদায়ক হলো।

পুর স্ত্রীবর্গের লোচনানন্দদায়ক জগৎপতি কল্কি, এই শম্ভলগ্রামে পদ্মা ও রমার সাথে যথাভিলাষিত ক্রীড়া করতে লাগলেন। তিনি দেবরাজ প্রদত্ত কামগামী রথ দ্বারা পরম প্রীতিহৃদয়ে নদী পর্বত কুঞ্জ ও দ্বীপ সমুদায়ে প্রবিষ্ট হয়ে রমা পদ্মা প্রভৃতি কামিনীগণের সাথে বিহার করতে লাগলেন।

তারপর একদিন পদ্মার মুখামোদরূপ কমলমধূ গন্ধোপভোগী সুবিলাসী কল্কি, প্রভূত ইন্দ্রনীল মণিদ্বারা শোভমান পর্বতগুহা বিশেষে প্রবিষ্ট হলেন। কমলসদৃশী সুবর্ণবর্ণা পদ্মা ও অমৃত পাত্ররূপা রমা, পতিকে গিরিগহ্বরে প্রবিষ্ট দেখে নারী সহস্রে পরিবৃতা হয়ে সেই স্থানে গমন করলেন এবং তারাও গুহায় প্রবেশ করলেন।

তারপর পদ্মা দেখলেন যে, সেই ইন্দ্রলীন মণিময় গহ্বর মধ্যে নবীননীরদ সদৃশ কান্তি যুক্ত ঈশ্বর কল্কি, আপনার অনুরূপ রূপবতী রমণীগণের সাথে অবস্থান করছেন। তিনি তা দেখে মোহাভিভূত হয়ে প্রস্তর সদৃশ নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়লেন। রমাও সহচরী প্রমাদগণের সাথে কাতরা হয়ে ব্যাকুললোচনে চতুর্দিকে অবলোকন করতে লাগলেন। শোভাসম্পন্না পদ্মাও বিষণ্ণহৃদয়া ও কাতরা হয়ে এককালে নিষ্প্রভা হয়ে পড়লেন। পদ্মার নয়নজলে ভূমি অঙ্কিত হতে থাকলো। তিনি কুচকুঙ্কুম দ্বারা কল্কিকে ও শুককে এবং কস্তুরিকা দ্বারা সন্নিহিত ভূমি ধূষরিত করে তদুপরি পতিত হলেন।

মধুরভাষিণী মদনভরনিপীড়িতা রমা, কল্কিকে হৃদয়ে ধ্যান করে স্থাপন পূর্বক নিজ অন্তঃকরণ রূপ পুষ্প দ্বারা পূজা করে দুঃখভারাক্রান্তা ও বিষণ্ন হয়ে ভূপতিত হলেন। পরে তিনি ক্ষণকাল পরে উত্থিতা হয়ে ময়ূরের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে আরম্ভ করলেন। তিনি নিজ হৃদয়ে নাথ কল্কিকে আলিঙ্গন করতে না পেরে কামপরতন্ত্রা হয়ে বলতে লাগলেন, হরে, প্রসন্ন হও। পদ্মাও নিজ অঙ্গভূষণ পরিত্যাগ পূর্বক ধূলিপটলে বিলুণ্ঠিত হতে লাগলেন। তাঁর শরীর ধুলিধূষরিত ও

কণ্ঠদেশ কস্তুরিকার দ্বারা নীলবর্ণ হওয়াতে বোধ হতে লাগল, যেন তিনি কামকে বিনাশ করবার নিমিত্ত শিবরূপ ধারণ করেছেন।

আর্তের বন্ধু হরি কাতর নয়না প্রিয়তমা বিলাসিনীগণের ক্রীড়ার বাসনা বুঝে, তাঁদের ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য তাঁদের মাঝে উপস্থিত হলেন। হস্তিনীগণ যেমন যূথপতির সঙ্গে মিলিত হয়, সেইরূপ সেই মনোহারিণীগণ আনন্দিত চিত্তে পবিত্র মনোবৃত্তি দ্বারা কাননমধ্যে সাদরে আপন স্বামীর সঙ্গে মিলিত হলেন। তেজবান কল্কি রমণীগণসহ আকাশগামী তেজদীপ্ত রথে আরোহণ করে দিব্যপুষ্পাদি সজ্জিত বৈভ্রাদ অরণ্যে, কুবেরের উদ্যানে ও আনন্দপ্রদ মন্দর পর্বত গুহায় বিহারে প্রবৃত্ত হলেন।

অতঃপর নারীগণ বনান্তর বিহারী প্রিয়বল্লভ কল্কিসহ ত্বরায় সরোবরে উপস্থিত হলেন। হস্তীগণ যেমন যুথপতির দেহে জলসিঞ্চন করে, কল্কিসহ ত্বরায় সরোবরে উপস্থিত সৌন্দর্যবতী বরনারীগণ পদ্মসহ সরোবরে স্নান করে কল্কির দেহে জল সেচন করতে লাগল। ত্রিলোকপতি বাসুদেব, দেবাধিপতি আদিনাথ, প্রেমভক্তি লাভকারী কল্কির জয় হোক। তিনি শম্ভলগ্রামে আপন প্রণয়িণী নারীগণসহ আপন বিহারাদিপূর্বক মনোরঞ্জন করে সকলকে উপদেশ দিয়েছিলেন। যেসকল ভাবুক মানবগণ আগ্রহ ও ভক্তি সহকারে কল্কির চরিত্র শ্রবণ, কীর্তন বা চিন্তা করবে, তাদের পক্ষে সেই মুরারীর দাস্য কামনা ব্যতীত পরমানন্দ সদৃশ এই ভবসাগর থেকে মোক্ষলাভও আনন্দ অমৃত স্বরূপ বলে মনে হবে না।

অধ্যায়

৪

কল্কির বৈকুণ্ঠ গমনার্থে দেবতাদের প্রার্থনা

তারপর দেবগণ ও বিপ্রগণ একত্রিত হয়ে আপন আপন অনুচরগণসহ রথারূঢ় হয়ে কল্কিকে দর্শন করতে এলেন। মহর্ষিগণ, গন্ধর্বগণ, কিন্নরগণ, অপ্সরাগণ পুলকিত মনে দেবগণেরও দর্শনীয় শম্ভল গ্রামে এলেন।

তাঁরা সভায় প্রবেশ করে দেখলেন, তেজোরাশি সম্পন্ন পুণ্ডরীকাক্ষ কল্কি আশ্রিত লোকদের অভয় দিচ্ছেন।

তাঁর অভয় কান্তি নীল মেঘের মতো। তাঁর বাহুদ্বয় সুদীর্ঘ ও পীবর। শিরোদেশে স্থিরবিদ্যুৎ তুল্য সূর্যসম দীপ্ত কিরীট বিরাজিত। তাঁর মুখমণ্ডল সূর্যের মতো দীপ্তিমান কুণ্ডল দ্বারা শোভিত। সেই বদনকমল আনন্দালাপে বিকশিত হয়েছে ও মৃদু মৃদু হাসিতে বিরাজিত। তাঁর করুণ কটাক্ষপাতে বিপক্ষকুল অনুগ্রহ লাভ করছে। তাঁর বক্ষঃস্থল মনোরম হারযুক্ত চন্দ্রকান্তমণির দ্বারা শতদলের আনন্দ বর্ধন করছে। তাঁর বস্ত্র ইন্দ্রধনুর ন্যায় সৌন্দর্য বিস্তার করছে। তাঁর দেহ সর্বদা নানাবিধ মণির জ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত হচ্ছে, দেবগণ, গন্ধর্বগণ ও অন্যান্য জনগণ কল্কিকে এভাবে দেখলেন। তাঁরা সকলেই পরম ভক্তি সহকারে সাদরে পরমানন্দ পূর্ণদেহ পুণ্ডরীকাক্ষ কল্কিকে স্তব করতে লাগলেন।

দেবগণ বললেন– হে দেবদেব, হে জগদীশ্বর, হে ভূতপতি, হে অনন্ত, ভাব পদার্থ সকল তোমার অন্তরেই বিরাজিত রয়েছে। তোমার শ্রীচরণ দ্বারা অনন্ত শক্তি অধোগামী হয়েছে। হে জগৎপতি, তুমি ক্লেশরূপ তৃণসমূহকে দগ্ধ করবার উদ্দাম অগ্নিস্বরূপ। তোমার জয় হোক। এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। তোমার দেহকান্তি ঘনমেঘ স্বরূপ। তোমার বক্ষে কৌস্তুভমণি শোভা পাচ্ছে। এতে মনে হচ্ছে, যেন শ্যামলকান্তি মেঘের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র বিরাজ করছে। সস্ত্রীক আমরা অনুচরগণসহ তোমার শরণ নিলাম। হে হরি, তুমি আমাদের পরিত্রাণ কর। যদি আমাদের প্রতি তোমার করুণা থাকে, তাহলে সত্যধর্মের অবিরোধে শাসিত মর্ত্যভূমি ত্যাগ করে বৈকুণ্ঠধামে প্রস্থান কর। কল্কি দেবগণের বাক্যে আনন্দিত হলেন ও পাত্রমিত্র পরিবৃত হয়ে বৈকুণ্ঠ গমনে ইচ্ছা করলেন।

পুত্রগণের রাজ্যাভিষেক ও প্রজাগণের প্রার্থনা

এরপর তিনি প্রজাগণপ্রিয়, পরম ধার্মিক, মহাবলবীর্যবান, পরাক্রমী চার পুত্রকে (জয়, বিজয়, মেঘমাল ও বলাহক) তৎক্ষণাৎ রাজ্যে অভিষেক করলেন। প্রজাগণকে ডেকে নিজ বিবরণ শুনে বললেন– দেবতাদের অনুরোধে আমাকে বৈকুণ্ঠে যেতে হবে। প্রজাগণ তা শুনে বিস্মিত হলো ও অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল। পুত্রগণ যেমন পিতাকে বলেন, সেরূপ তারা ঈশ্বরকে প্রণাম করে বলতে লাগল– প্রভু, আপনি সকল ধর্ম জানেন। আমাদের ত্যাগ করা আপনার উচিত নয়। যারা আপনার প্রণত, আপনি তাদের প্রতি বাৎসল্য দেখান। আপনি যেখানে যাবেন, আমরাও সেখানে যাব। এ সংসারে ধন, পুত্র, পত্নী, গৃহাদি সবার প্রীতিপ্রদ হলেও, আপনি যজ্ঞপুরুষ। আপনার দ্বারা এই পরলোকের শোক-দুঃখ নাশ হয়। এটা জ্ঞাত হয়ে আমাদের প্রাণ আপনার অনুগমন করছে। প্রজাগণের কথা শুনে কল্কি সৎকথা দ্বারা তাদের সান্ত্বনা দিলেন।

চতুর্ভুজরূপে বৈকুণ্ঠগমন ও পত্নীগণের অন্তর্ধান

কল্কি প্রজাগণকে সান্ত্বনা দিয়ে বিষণ্ন মনে পত্নীদ্বয়সহ অরণ্যে গমন করলেন। তারপর তিনি মুনিগণ পরিবেষ্টিত অবস্থায় গঙ্গাজল দ্বারা দেবগণ কর্তৃক পূজিত হয়ে, পরে আনন্দ প্রদানকারী হিমালয়ে গমন করলেন। সেখানে গিয়ে দেববৃন্দে পরিবৃত হয়ে গঙ্গাতীরে উপবেশন করলেন এবং অপরূপ চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি ধারণপূর্বক নিজেকে স্মরণ করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর সহস্র সূর্যের ন্যায় তেজোরাশি প্রকাশ পেতে লাগলেন। সেই পূর্ণ জ্যোতির্ময় সাক্ষীরূপ সনাতন পরমাত্মা শোভা পেতে লাগল। তাঁর আকৃতি বিবিধ ভূষণের বিভুষণ স্বরূপ হলো। তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শার্ঙ্গ ইত্যাদি দ্বারা আরাধিত হতে লাগলেন।

তাঁর বক্ষে কৌস্তুভমণি বিরাজ করছে। দেবগণ তাঁর উপর সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। চারদিকে দেবতাগণের দুন্দুভিধ্বনি হতে লাগল।

কল্কি যখন বৈষ্ণবগণের পরমপদরূপ ভগবৎস্বরূপে প্রকটিত হন, তখন তাঁর অপরূপ রূপে স্থাবর জঙ্গম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকই মুগ্ধ হলো ও তাঁর স্তুতি

করতে লাগল। রমা ও পদ্মা উভয়ে তাঁদের পতি মহাত্মন কল্কির সেই মহা অদ্ভুত রূপ দর্শন করে অগ্নিতে প্রবেশ করে তাঁকে লাভ করলেন।

কল্কির অন্তর্ধান-পরবর্তী পৃথিবী

ধর্ম ও সত্যযুগ কল্কির আজ্ঞায় পৃথিবীতে শত্রুহীন হয়ে পরম সুখে চিরদিন ভ্রমণ করতে লাগলেন। দেবাপি ও মরু ভূপতিদ্বয় ভগবান কল্কির আজ্ঞায় প্রজাদের রক্ষা ও রাজ্য রক্ষা করতে লাগলেন। রাজা বিশাখযূপ কল্কির এরূপ নির্বাণ শ্রবণ করে পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে অরণ্যে গমন করলেন। অন্যান্য যে সকল রাজা কল্কির বিরহে কাতর হয়েছিলেন, তাঁরা রাজসিংহাসনে বিরত হয়ে দিবানিশি শুধুমাত্র কল্কির নাম জপ ও কল্কির মূর্তি চিন্তা করতে লাগলেন।

কল্কির শাসনক্রমে ভূমণ্ডল মধ্যে কোনো প্রজাই অধার্মিক, অল্পায়ু, দরিদ্র, পাষণ্ড ও কপটাচারী থাকল না, সকল জীবই আধিব্যাধিশূন্য, ক্লেশরহিত, মাৎসর্যশূন্য, দেবতা সদৃশ সদানন্দময় হয়েছিল।

যিনি সজল জলদ সদৃশ দেহকান্তি সম্পন্ন, যাঁর বাহন বায়ুর ন্যায় বেগশালী, যিনি কর দ্বারা তরবারি ধারণ পূর্বক সমুদায় লোককে রক্ষা করেন, যিনি কলির সৈন্যসমূহ সংহার করে, সত্য ধর্ম স্থাপন করেন, সেই কল্কিরূপ ভূপাল সকলের কুশল করুন।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ

১. শ্রীমদ্ভাগবত
শ্রীল এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ অনুদিত ও ভাষ্যকৃত, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

২. মহাভারত–
হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য প্রণীত, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ

৩. কল্কি পুরাণ
পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স

৪. ভবিষ্যপুরাণ
পণ্ডিত বাবুরাম উপাধ্যায় অনূদিত, হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন, প্রয়াগ

৫. স্কন্দপুরাণ
পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স

৬. অগ্নিপুরাণ
পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স

৭. ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ
পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স

৮. পদ্মপুরাণ
পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স

৯. শিবপুরাণ
পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স

১০. লিঙ্গপুরাণ
পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স

১১. ঋগ্‌বেদ সংহিতা
রমেশ চন্দ্র দত্ত অনূদিত, হরফ প্রকাশনী

১২. সামবেদ সংহিতা
দিলীপ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় লাইব্রেরি

১৩. যজুর্বেদ সংহিতা
দিলীপ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় লাইব্রেরি

১৪. অথর্ববেদ সংহিতা
দিলীপ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় লাইব্রেরি

১৫. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ
শ্রীল এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

১৬. ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
শ্রীল এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

১৭. মনুসংহিতা
মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী, সদেশ, শ্রীবলরাম প্রকাশনী

১৮. বায়ুপুরাণ
পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স

১৯. বৃহন্নারদীয় পুরাণ
পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স

২০. বিষ্ণুপুরাণ
পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স

২১. ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ
পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স

২২. 'সংস্কৃত-বাংলা অভিধান'
শ্রীঅশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত

২৩. 'অমরকোষ'
শ্রীমদ্‌গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্যকৃত

২৪. ব্যবহারিক ও আধুনিক বাংলা অভিধান
বাংলা একাডেমি, ঢাকা

২৫. ভ্রান্তি বিজয়
শ্রী হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত

২৬. শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত
শ্রীল এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট